বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল

আজহারউদ্দীন খান্
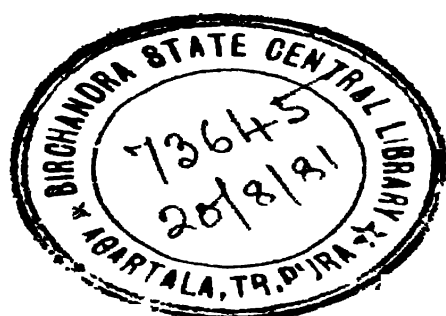
জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-৭০০০২৯ ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

Bangla Sahitye Mohitlal

by Azharuddin Khan

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ ১৩৬৮ : আগস্ট ১৯৬১

প্রকাশক

শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড

জি জ্ঞা সা

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৯

১এ, ও ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর

শ্রীধনঞ্জয় দে

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

মা-বাবার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

অনুসরণী

মোহিতলালের জীবন-কথা ১-৮১
কবি মোহিতলাল ৮২-১১৬
মোহিতলালের সনেট ১১৭-১২৭
সমালোচক মোহিতলাল ১২৮-১৪৫
মোহিতলালের প্রবন্ধ ১৪৬-১৫৯
বাঙালী মোহিতলাল ১৬০-১৭৬
বাংলা পত্র-সাহিত্যে মোহিতলাল ১৭৭-২১৯
বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ২২০-২ ০
পরিশিষ্ট
আমি ও শনিবারের চিঠি ২৩১-২৪৯
গ্রন্থপরিচয় ২৫০-২৭৫
নির্ঘণ্ট ২৭৭-২৮৩
সংশোধনী ২৮৪

লেখকের রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যে নজরুল (৫ম সংস্করণ)

বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ভূমিকা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

বাংলা সাহিত্য মুহম্মদ আবদুল হাই (বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত)

বিলুপ্ত হৃদয়

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ (ভূমিকা ড. ভবতোষ দত্ত)

বিদ্যাসাগর-স্মারকগ্রন্থ (ভূমিকা ড. নীহাররঞ্জন রায়)

বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ-পূর্তি স্মারকগ্রন্থ ইত্যাদি

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল

দেশে অতিশয় বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই, সেদিকে তাকাইলে হৃদয় অবসন্ন হয়। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সে যেন মানুষের হাতে আর নাই—আমরা এখন ভগবানের বা মহাকালের দরবারে বিচারাধীন হইয়াছি। কিন্তু তাহাতেই অভিভূত হইলে চলিবে না, বিনাশের মহাগহ্বরতীরে দাঁড়াইয়া চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। কারণ, মানুষের প্রাণ, কৃতকর্মের বিচার বা প্রায়শ্চিত্তের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জাগ্রত থাকে—আত্মার দুর্বলতা কোন কালেই মার্জনীয় নয়। মৃত্যু যদি অবধারিত হয়, তথাপি মানুষের অধিকার ত্যাগ করিব না, ন্যায় ও সত্যের নিকটে যেমন মস্তক অবনত করিব, তেমনই মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই প্রেমকে ক্ষুণ্ণ করিব না। আমার জাতি অপরাধ করিয়াছে—ইহাই যদি সত্য হয়, যদি পাপ করিয়াছে বলিয়া দণ্ডের যোগ্য হয়, তথাপি সেই পাপ ও অপরাধীকে স্বীকার করিয়াও, তাহার প্রতি প্রেমহীন হইব না।

মোহিতলাল মজুমদার

মোহিতলালের জীবন-কথা

মোহিতলাল মজুমদারের জীবন কেটেছে আর পাঁচজন ছা-পোষা মধ্যবিত্তের দিন যেমন করে কাটে; তাতে রোমাঞ্চ বা নাটকীয়তা নেই, রয়েছে একটানা আশা-ভঙ্গের বৈচিত্র্যহীন আখ্যায়িকা। তবু তাঁর জীবন-কাহিনী লেখার কারণ হল মধ্যবিত্ত জীবনের বিফলতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যেই তিনি অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন, বাস্তব-জীবনের দুঃখ-বেদনাকে অন্তর্জীবনের সম্পদ দিয়ে ভরেছেন বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণচ্ছটার মধ্যে বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক হিসেবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক অমৃত আহরণ করেছেন। তাই তাঁর জীবনী যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন।

তিনি নামজাদা লেখক কিন্তু সাহিত্য-রসিক সুধীসমাজের বাইরে তাঁর নাম সম্ভবতঃ আজও অপরিচিত। তাঁর কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদির পাঠক বড়ো একটা নেই। সুধীসমাজের মধ্যেও যেটুকু তিনি বেঁচে আছেন সেটুকুকে বাঁচা বলে না -সেখানে অতিপরিচয়ের অপরিচয় দিয়ে তাঁকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, যেন ভিতরে ভিতরে তাঁর বিরুদ্ধে একটা নিশ্চুপতার ষড়যন্ত্র (conspiracy of silence) চলছে। মুখে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণকে তৎপর করার জন্যে কোন বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে কি? তবে বহুপরিচিতিই সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড নয় আর জনপ্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রেই অপাংক্তেয়তারই নামান্তর। নিজের সাহিত্য-সত্তার নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, অনেকেই উপেক্ষা করেছে, অবজ্ঞা করেছে তাঁকে—পাল্টে তিনিও রূঢ় আঘাত কম দেন নি। কিন্তু তাঁর রূঢ় আক্রমণের মূলে ব্যক্তিগত অনাদরের আক্রোশ ছিল না, অতিশয় সুপবিত্র ও সমুন্নত সাহিত্যিক আদর্শই ওই রূঢ়তার কারণ। তবু তাঁর একগুঁয়েমির জন্যে তাঁকে অনেকেই পরিহার করে গেছেন। কিন্তু যেখানে অল্পশক্তিসম্পন্ন সাহিত্যিকদের নিয়ে নাচন-কোদন চলে সেখানে মোহিতলালের মত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠত্ব অবহিত হয়ে তাঁর জীবনী সম্পর্কে কিছু উৎসাহ প্রকাশ করা আমাদের রসিক-সমাজের উচিত ছিল। তা হয় নি। রাজনীতির মত সাহিত্যের মধ্যেও দলাদলি আজ আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে

তুলেছে। শেষ বয়সে মোহিতলাল কোন দলভুক্ত হয়ে মারা যান নি বলে তাঁর প্রতি আমাদের সাহিত্যিক-সমাজের তাচ্ছিল্য স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে।

তাঁর মত দেশকে এমন প্রাণ দিয়ে কেউ ভালবাসে নি, নিজের সর্বস্ব খুইয়ে বাঙালীত্বকে কেউ এমন করে পূজো করে নি। হতভাগ্য দেশের মাটি আঁকড়িয়ে যিনি আমৃত্যু তার মঙ্গল চিন্তা করে গেছেন, বাঙালীর দুর্দিনে তাঁকে তো আমরা জাতীয় আদর্শের ভাবোন্মত্ত প্রচারক হিসেবে ভুলেও স্মরণ করি নি। তাই মনে হয় তাঁর তুলনায় আমাদের দেশপ্রেম যেন একটা ফাঁকা বুলি মাত্র, উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাময়িক ছদ্মবেশ। এ-সবের জন্যে তাঁর প্রতিভার সাহিত্যিক মূল্যায়নে ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি বরং আমাদের পণ্ডিতসমাজের ওপর একটা কলঙ্কের ছাপ রেখে গেছে। তাছাড়া নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা, বা প্রচারের জন্য লেখায় মোহিতলালের বরাবর সঙ্কোচ ছিল। তিনি তাঁর 'কাব্য-মঞ্জুষা'য় অন্যান্য কবিদের পরিচয় প্রসঙ্গে অপরিহার্য-ভাবে নিজের জীবনী যেটুকু লেখা চলে সেটুকু লিখেছেন এইভাবে—

"মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—)—বাংলা ১২৯৫ সালে (১১ই কার্তিক শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিট) নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বৈদ্যবংশে জন্ম, পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার, মাতার নাম হেমমালা দেবী। পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট জ্ঞাতি-ভ্রাতা, দেবেন্দ্রনাথের পিতারও পূর্ব উপাধি ছিল 'মজুমদার'। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশও তাঁহার মাতুল-বংশেরই এক শাখা। মোহিতলালের কৈশোর ও স্কুল জীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয়, বাল্যে কিছুদিন কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী হালিশহরে মায়ের মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিতলালের যে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হয় তাহা এই: স্কুলের ও কলেজের (তিনি তখনকার 'মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন্' ও এখনকার 'বিদ্যাসাগর কলেজ' হইতে ১৯০৮ সালে বি.এ. পাশ করেন) শিক্ষা তিনি সম্যক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মানস-প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধন-পন্থার নির্দেশে তাঁহার পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ, এবং পিতারই কবি-স্বভাব ও কাব্য-প্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে—সে বিষয়ে পিতাই তাঁহার 'শিক্ষা- ও দীক্ষা- গুরু'। বাংলা-সাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের যদি কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য তিনি সর্বতোভাবে তাঁহার

পিতার নিকট ঋণী। মোহিতলালের কবি-খ্যাতি সাহিত্য-সমাজেই সীমাবদ্ধ —সেখানেও তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। তাঁহার কবিতার ভাব ও ভাষা এমনই গুরু ও গম্ভীর যে তরল-মতি তরুণ অথবা সৌখীন-হৃদয় বৃদ্ধ, কাহারও পক্ষেই তাহা সুখসেব্য নহে। তৎসত্ত্বেও, আধুনিক কবিগণের মধ্যে তাঁহাকে একটা স্থান দেওয়া চাই—নহিলে, নাকি অন্যায় করা হইবে। মোহিতলাল এ পর্যন্ত এই কয়খানি কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন—'স্বপন-পসারী' 'বিস্মরণী' 'স্মর-গরল' ও '.হমন্ত-গোধূলি'।"

—এইটুকুই তাঁর জীবনের সবটুকু নয়।

দুই

মোহিতলাল বলতে এমন একটি চরিত্র বুঝায় যা কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞান-সাধনায কঠোর, নিঃস্বার্থপরতা ও অবারিত আনন্দে চিরপ্রসন্ন, যার একদিকে রয়েছে ঋষিসন্তানসুলভ প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা, অপরদিকে বর্তমান মুহূর্তের ক্রন্দন-বিলাপের সজীব অনুভূতি। তিনি সাহিত্য-সাধনার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রেরণা লাভ করেছেন তাঁর পিতৃপুরুষের কাছ থেকে বংশানুক্রমে। কবির মাতামহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্তপার্ষদ শিবানন্দ সেনের সাক্ষাৎ বংশধর; চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর কাহিনী কীর্তন করেছেন। এদিক দিয়ে কবির আভিজাত্য লক্ষণীয়. এই শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেনই শ্রীচৈতন্যের কৃপায় বাল্যকালেই কবিত্বশক্তি লাভ করে 'কবিকর্ণপুর' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীকালে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক নাটক রচনা করেন; ঐ গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের পরম আদরের বস্তু। আবার কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং সাহিত্য-সাধনায় তাঁর জন্মগত অধিকার আছে, এটা তাঁর কাছে কৌল ধর্ম। তাঁর পিতার পেশা কবিরাজী হলেও কবি-স্বভাব ও কাব্যপ্রীতি ছিল। মোহিতলালের জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব অপরিসীম।

নন্দলালের দুই সংসার। প্রথম পক্ষে কোন সন্তানাদি হয় নি। কবির জননী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কবির পিতা তাঁর পিতামহের একমাত্র সন্তান ছিলেন—কবিও পিতার একমাত্র পুত্র। তবে কবির একটি অনুজা ভগিনী আছেন। কবির মাতুল ছিল না, মাতামহের দুটিমাত্র কন্যা, কবির জননী

কনিষ্ঠা। এই সূত্রে কাঁচড়াপাড়ায় মাতামহের সম্পত্তি কবি পেয়েছিলেন। ওই বাড়ীর বর্ণনা "স্মর-গরলে"র 'কবিধাত্রী' কবিতায় আছে—

পুরাতন বাস্তুভিটা, অতি-উচ্চ শিখরে তাহার
প্রভাতে সন্ধ্যায় বসি' রচি গান ; বিজন-বিধুর
চেয়ে থাকি মুগ্ধনেত্রে, নভ-তলে যেথায় সুদূর—
মিশে গেছে অরণ্যের অনন্ত পল্লব-পারাবার !
নতোন্নত তরুশির—নীলে ও শ্যামলে একাকার !—
তারি 'পরে ফেলে ছায়া নবমেঘ গম্ভীর মেদুর !
অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী, তাল, শিমুলের কচিৎ সিঁদুর,
বেণুশীর্ষ, আম্র আর পনসের ঘনপত্র-ভার
ঢেকে আছে ধরণীরে।

নন্দলাল ছিলেন সদানন্দ, উদাসীন প্রকৃতির পুরুষ। মাঝে মাঝে কাউকে না বলে উধাও হতেন, হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হতেন। কাজেই মোহিতলালের বাল্যকাল মাতুলালয়েই অতিবাহিত হয়। পিতার এই ঔদাসীন্য পুত্রের চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাহিত্য যখন 'তাঁর নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব' হয়ে উঠেছিল তখন সাংসারিক জীবনের প্রতি তাঁর বৈরাগীর মত ঔদাসীন্য তাঁর পিতৃদেবের কথাই স্মরণ করায়।

তাঁর পিতা উপার্জনে একেবারে উদাসীন ছিলেন বলে সংসারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বাড়াতে পিতামাতার শাসন ছিল বড় কড়া। বিধিবদ্ধ পাঠ-প্রণালীর প্রতি মোহিতলালের নিষ্ঠা ছিল না। কড়া শাসনের মধ্যে ছাত্র হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করতে না পারলেও স্মরণশক্তি তার তীক্ষ্ণ ছিল বলেই সে-যুগের অতি কঠিন পরীক্ষাতে কোনবার অকৃতকার্য হন নি। হালিশহর (মাতার মাতুলালয়ে) হাই স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করার পর স্বগ্রাম বলাগড় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পড়ে ১৯০৪ সালে এনট্রান্স পাশ করেন। কলকাতায় এসে মাসীর বাসায় থেকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসানে, বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০৮ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপাচার্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; তখন এফ এ. পরীক্ষায় সাতটি বিষয় পড়তে হত—ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও সংস্কৃত। বি এ পরীক্ষায় তাঁর পাঠ্য

ছিল—সংস্কৃত, দর্শন ও ইংরেজি। এ বিষয়ে তাঁর মনে একটা মৃদু গর্ববোধ ছিল, প্রায়ই বলতেন—"আমি 'Mukherjee's Graduate' নই।" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমশঃ সিলেবাস সোজা হতে থাকে। মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক এন. এন. ঘোষের গৌরব প্রায়ই করতেন। তাঁর ইংরেজি বিদ্যার খ্যাতি কলকাতার বিদ্বৎসমাজে তখন প্রসিদ্ধ ছিল। বি এ পাশের পর একই সঙ্গে আইন ও ইংরেজিতে এম. এ পড়া শুরু করেন কিন্তু সাংসারিক অসচ্ছলতার দরুন পড়া ছাড়তে বাধ্য হন। এই হল মোহিতলালের 'একাডেমিক্ কেরিয়ার'।

তিনি আশৈশব সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। এর মূলে পারিবারিক প্রভাব বড় কম ছিল না। তা বলে অন্যান্যদের মতো স্কুলে পাঠ্যাবস্থাতে কবিতা অথবা গল্প-রচনায় তাঁর আগ্রহ হয় নি, সাহিত্য-পাঠেই তাঁর আনন্দ ছিল। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে সাহিত্যের জগতে দেখা দিয়েছিলেন—অকালে, অ-প্রস্তুত অবস্থায় নামেন নি। আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর পিতা কাব্যানুরাগী ছিলেন। বই-পত্র তাঁর বহু ছিল। মোহিতলাল অতি-অল্প বয়সেই সে-সব বই পড়তেন—পড়ে আনন্দ পেতেন। তাঁর পাঠস্পৃহার গোড়াপত্তন এইভাবে হয়। নয়-দশ বছর বয়সে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস পড়ে তাঁর চিত্ত হত আত্মহারা। বারো তেরো বছর বয়সে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন, সতের-আঠারো বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর মনে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করত। এসব কবিদের রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, এগুলিই ছিল তার অবসর-বিনোদনের সঙ্গী। এই কালের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন- "তখন ১৯০৫-৬ সাল, রবীন্দ্রনাথ 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক, আমরা তখন কলেজ বিদ্যার্থী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রবীন্দ্রনাথের বাণী হৃদয়ঙ্গম করা তখনকার তরুণদের সাধনার বিষয় ছিল। সারা বাঙলা জুড়িয়া সমগ্র শিক্ষাভিমানী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রবীন্দ্রনাথের আসন তপোবন-বেদিকার অপেক্ষাও উঁচু ও পবিত্র ছিল।...সেদিন সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের পরমতম সাধনা বলিয়া মনে হইয়াছিল।" (আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫)। কম বয়সে তিনি লেখা আরম্ভ করেন নি, তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-

সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকার ১৩১৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'জীবন ও মৃত্যু' নামক দুটি চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতা। তখন তাঁর বয়স উনিশ, তিনি তখন বিদ্যাসাগর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। স্কুল-জীবনে তাঁর কোন লেখা প্রকাশিত না হলেও স্কুল-জীবনে চিত্রাঙ্কণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তখন ছবি-আঁকার মধ্য দিয়েই বালকের কল্পনা লেখার পথ খুঁজত। পুতুল তৈরি ও তাতে রং ফলিয়ে বাস্তবের নিখুঁত প্রতিকৃতি রচনা করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। এই অভ্যাসটি শেষ বয়সে ফিরে পেয়েছিলেন। ছোট ছেলেদের সঙ্গে অপূর্ব সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করে তাদের শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া বড়িশায় বাসকালে তার একটা আমোদের বিষয় হয়ে উঠেছিল। কলেজ-জীবনে তার সাহিত্যানুরাগ আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করে। ইংরেজি সাহিত্যের ভাবসমুদ্রে তিনি অবগাহন করেন। পরবর্তীকালে দেশবিদেশের নানা কাব্য এবং আধুনিকতম সমালোচনা-শাস্ত্র তিনি অতিশয় যত্নে অধিগত করেছিলেন, বিশেষ করে সমগ্র ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে মরিস্‌ পর্যন্ত—ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর এই পাঠস্পৃহার সূত্রপাত ঐ বাল্যকাল থেকেই—শেষ বয়সেও বই ছিল তাঁর সঙ্গী। কলেজের পড়া শেষ করার পরই তাঁর সংসারের নিদারুণ অর্থকষ্ট আরম্ভ হয় কিন্তু সাহিত্যরস তাঁকে পার্থিব দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে রাখত। শেষ বয়সে অশেষ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সাহিত্য-রসই তাঁকে সজীব করে রেখেছিল এবং এই সাহিত্য-নেশাই তাঁকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে আত্মভোলা মহেশ্বরে পরিণত করেছিল।

॥ ৩ ॥

একটা স্বপ্নের মত মোহিতলালের কলেজ-জীবন গেল কেটে। অভাবের দরুন পড়াশুনোয় ইতি দিয়ে সংসারের অনটন-দূর করার জন্য তাঁর চাকুরী জীবন আরম্ভ হল। সে জীবনও বিচিত্র—'বিফলতা আর বারবার কাঁধবদলের ইতিকথা।

দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে হাতের সামনে ঠিক করে নিতে হল একটা বেতনের চাকরী। জীবিকার্জনের সবকটা জানালা বন্ধ হলে মানুষ বাধ্য হয়ে নেয় যে চাকরী সেই শিক্ষকতা, যাতে সম্মান রয়েছে অর্থ নেই, কারণ বৈশ্যযুগে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যের কোন দাম নেই। পাঠ সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাওড়ার সালকিয়ার একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে একজনের বদলীতে কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতা

করেন। তারপরে স্থায়ী-ভাবে কলকাতার তালতলা হাইস্কুলে তিনি শিক্ষক হলেন (১৯১০)। আমরা জানি তুলনামূলকভাবে শিক্ষকতার চাকরীতে খাটুনি কম, ছেলেদের একবার বুঝিয়ে দিয়ে বাকি সময়টা পড়া লিখতে দিয়ে বসে কাটিয়ে দিলেই চলে যায়। কিন্তু মোহিতলাল ছিলেন এর ঠিক উল্টো। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়াতেন, পড়াতে পড়াতে পাঠ্য পুস্তকের বাইরের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা গল্পের মত করে বলতেন যাতে তারা বুঝতে পারে এবং বাইরের কিছু জ্ঞান বাড়তে পারে। পাঠ্যকীট না হয়ে জ্ঞান-সমুদ্র যে বিশাল, এই উপলব্ধি তারা যেন এখন থেকেই করতে পারে। তিনি কত আগ্রহ ও পরিশ্রম করে ছাত্রদের পড়াতেন তার একটি মনোরম চিত্র তাঁর প্রথম শিক্ষকতার ছাত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরী "The Autobiography of an unknown Indian (১৯৫১) গ্রন্থে অঙ্কিত করেছেন। আমরা এখানে সেই অংশটি উদ্ধৃত করছি

"Shortly afterwards a second personal influence entered my life. It was that of a teacher. Our Headmaster one day entered the class with an almost boyish young man by his side and introduced him as our new teacher of English. He was very dark, but possessed of decidedly handsome features, his eyes particularly being very fine. Though short and plump, he was not so much so as to repel me with a suggestion of corpulence He provoked notice and criticism by being dressed in a navy-blue striped suit instead of in dhoti and shirt. He drew on himself greater criticism by introducing an unwonted fervour into his teaching of poetry. It was reported that he moved in literary circles and even contributed to magazines. The general opinion of his pupils was that he was no good, for literary enthusiasm was considered bad form in teaching and useless, if not worse, for examinations . For my brother and me, however, this teacher completed what my father and uncle Anukul had begun. He not only communicated to us his love of literature but also taught us to be exacting in writing the two languages we used. I remember him as something more than one of my teachers, for as Mr. Mohitlal Mazumdar, the distinguished contemporary poet and critic, he exerted

a very strong and beneficial influence on my later life. He introduced me to the literary society of Calcutta and made a writer of me almost by main force. (p. 289)। নীরদচন্দ্র চৌধুরী মোহিতলালের কাছে তাঁর ঋণ ও প্রভাবের কথা মুক্তকণ্ঠে নানাজনের কাছে সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছেন—"আমি শিক্ষায় মোহিতবাবুর ছাত্র ও সাহিত্যসেবায় তাঁহার শিষ্য।... তিনি স্কুলে আমাকে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়াইতেন। এই দুই ভাষায় আমার হাতে খড়ি তাঁহার কাছে না হইলেও, ইহাদের সাহিত্যিক প্রয়োগ তিনিই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাই আমার ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিবেকবুদ্ধির মূলে। আর আমার সাহিত্যিক দীক্ষাও তাঁহার কাছেই সমাধা হইয়াছিল। আমার পিতা আমাকে নয় বৎসর বয়সে সেক্সপীয়র পড়াইযাছিলেন। মোহিতবাবুর কাছে সেই পড়া আরও অগ্রসর হয়। তিনি নবম শ্রেণীতে (তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে) আমাদের কীটসের 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল' পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি এখনও আমার কানে বাজে। স্কুল ছাড়িবার এগার বৎসব পরে ১৯২৫ সনে আবার আমার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন আমি মিলিটারী একাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে কেরানী।. এই সময় তিনি আমাকে কলিকাতার লেখক সমাজে টানিয়া লইয়া—প্রায় জোর করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত করেন। আমার প্রথম ইংরেজী রচনা—ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে—তিনিই শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লইয়া গিয়া আমাকে দিয়া পড়ান।. ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসের মর্ডান রিভিউ-এ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই আমার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ। ইহার কিছুদিন আগে হইতেই মোহিতবাবু আমাকে সজনীবাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং মোহিতবাবুর জন্যেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে ভিড়ি। তিনিই তখন 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণ ছিলেন। লেখক হিসাবে মোহিতবাবুর কাছে আমার ঋণ পরিশোধ করিবার মত নয়। তাঁহার শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত আমাকে পরজীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যে সাহিত্যপ্রীতি আমার জীবনে উচ্ছলিত সুখ আনিয়া দিয়াছে, তাহার মূলে আমার পিতামাত ভিন্ন আছেন মোহিতবাবু।" (সাপ্তাহিক বসুমতী ১২. ১. ১৯৬৭ সংখ্যা) 'The Illustrated Weely of India' সাপ্তাহিকের ৯ এপ্রিল ১৯৬১ সংখ্যায় তিনি তাঁর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। প্রবন্ধের নাম—'Mohitlal Mojumder'।

শিক্ষকতা করলেও তাঁর সাহিত্যরস শুষ্ক হয়ে যায় নি। ১৩১৯ ১লা কার্তিকে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন সম্পর্কে ষোলটি সনেট নিয়ে 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' নামে এক কাব্য-পুস্তিকা বেরোয়। কবি নিজ অর্থে পুস্তিকা বের করেন—দাম ছিল এক আনা। নাম-পত্রে কবির নাম ছিল—মোহিতমোহন মজুমদার। লেখাপড়ার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন পরীক্ষার ক্লাসে গার্ড দিতে দিতে একদা 'নাগার্জুন' কবিতাটি লিখেছিলেন। কিন্তু সংসারের চাপে আর যেন পারছেন না। ইতিমধ্যে (২৫শে বৈশাখ ১৩১৬) বারাকপুর-নিবাসী চিকিৎসক রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী তরুলতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। শিক্ষকতা করে যা পান তা দিয়ে সংসারে কুলিয়ে ওঠা শক্ত। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে মোটা মাহিনের কোন একটি চাকরী।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ (১৩২১) শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে সরকারী জরীপ বিভাগে কানুনগোর পদ গ্রহণ করলেন। চাকরী করতে এসে দেখেন যে শিক্ষকতা করেও সাহিত্য-জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ চলছিল, কিন্তু ঐ নীরস ফাইলের কাজ করে সাহিত্য-চর্চার কোন সময় পাওয়া যায় না। কোথাও স্থিতি হয়ে থাকার উপায় নেই—আজ জলপাইগুড়ি তো কাল লটবহর নিয়ে শিলাইদহ। এই মেঠো হাকিমের জীবনে তিনি বুঝতে পেরেছেন বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ঢিলে হয়ে আসছে। এখানে পাকাপাকি বাসা বাঁধলে স-সম্পর্কে ছেদ অনিবার্য। এর চেয়ে ভাল ছিল শিক্ষকতা—টাকা কম হোক, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা থাক বা না থাক কিন্তু যাতে অমৃত পাওয়া যাবে না তা নিয়ে কী করবেন। তিন বছরের বেশী এ চাকরী তাঁর ধাতে সইল না। আবার তিনি নেবুতলা লেনস্থ ক্যালকাটা হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন (১৯১৭ খ্রী)। মুজফফর আহমদ সাহেব 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থে বলছেন যে তিনি ঐ হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিংবা সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন না। ঐ স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির তখন সভাপতি ছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। কৃষ্ণপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও জ্যোতিপ্রসাদ সর্বাধিকারী ছিলেন সদস্য। দেবপ্রসাদের ভ্রাতা মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী মোহিতলালের মৃত্যুর পর দৈনিক বসুমতীর রবিবারের 'বসুমতী সাহিত্য-সভা' বিভাগে 'মোহতের মোহ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৮ই শ্রাবণ ১৩৫৯)। ঐ প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেছেন—"কবি সামান্য

বেতনে শিক্ষকতা করতে এলেন কলিকাতা নেবুতলা লেনস্থ কলিকাতা হাইস্কুলে…এই বিদ্যায়তনের সাথে আমার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্বর্গতঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন সেখানকার প্রধান শিক্ষক। স্বর্গতঃ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাসবাবু প্রভৃতি ছিলেন সহকারী। এই কয়জনে মিলে কাব্যালোচনা করতেন স্কুলের ছুটির পর। প্রধান থাকতেন মোহিতলাল।" কানুনগো-জীবনের ওই কয় বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় তাঁর সাহিত্য-জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতায় যে ভীষণ ও মধুরের দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি-পুরুষে মিলন, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত অনমনীয় দৃঢ়তা দেখতে পাই তার উৎস রয়েছে এইখানে। তিনি নিজে এই কালের পরিচয় দিয়েছেন—

"জীবনের সহিত রূঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির ভীষণ মধুর মূর্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এই কয় বৎসরেই লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্যজীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইতেছিল। বনে জঙ্গলে মাঠে নদীর চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁবুতেই বাস করিতাম, কোনও দিন বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ হইতে পাবনা-বাজিতপুর পর্যন্ত যে বিশাল চর—একবার সেখানেই সারাবৎসর কাটাইয়াছিলাম। জলপাইগুড়ি অবস্থানকালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, তেমনই বৃক্ষচ্ছায়াহীন বালুপ্রান্তরে অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। এক কথায় বিধিবদ্ধ সমাজ-জীবনের বাহিরে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যে-ভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল, এবং প্রকৃতির যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল—তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হয় নাই।" —শনিবারের চিঠি; ১৩১৬, মাঘ।

এই পদ্মার বালুচরে ভ্রমণ করে কাব্যের খোরাক সংগ্রহ করতেন। তাঁর বিখ্যাত 'বেদুঈন' 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নাদির শাহের শেষ' কবিতায় তাঁর উদ্দাম জীবনের পরিচয় আছে। তাঁর জবানবন্দীতেই বলা যাক -

"একদিন এই চরের সদ্য স্মৃতি হইতে আমি একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম —বৈশাখের অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে তাহার সেই দিগন্তবিসর্পী বালুভূমির উপরে আমি যে বেদুঈন-জীবন যাপন করিয়াছিলাম, তখনও তাহার উন্মাদনা আমার শিরায়

শোণিতে বিদ্যমান ছিল ; তাই কাব্যরসিক বন্ধুগণ সেই কবিতা পড়িয়া আমার কল্পনাশক্তির তারিফ করিয়াছিলেন , আমি যে কোথা হইতে সেই কবিতার (বেদুঈন) পটভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সে-সংবাদ তাঁহারা জানিতেন না। চরের সেই রূপ আমারই দেখা রূপ রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখিলেও তাহাতে আকৃষ্ট হন নাই , তিনি পদ্মার যে ভৈরবীমূর্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা শিখাময়ী নয়— তরঙ্গময়ী , সে তাহার সেই ভাঙ্গনের-প্লাবনের রূপ যাহার পরে পদ্মা যেন শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া এইরূপ বিশাল সিকতা-শয্যায় শীর্ণ তনু এলাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার যে আর-এক রূপ—সেই মন্ত্র স্তব্ধ নিশীথ-নির্জনতার রূপ, যে রূপ কারকে অর্ধরাত্রে ধ্যানাসনে বসাইয়াছে— আমি সে রূপও দেখিয়াছি , কিন্তু ধ্যানাসনে নয় এমন কি, পদচারণা করিয়াও নয় বরং বেদুঈনের মত ধাবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া।' -'শিলাইদহে রবীন্দ্র স্মৃতি' রবি-প্রদক্ষিণ

শিলাইদহে থাকতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। সাক্ষাতের বিবরণ তার 'রবি প্রদক্ষিণ' গ্রন্থের 'পদ্মা-বক্ষে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। কবিকে তিনি প্রথম দেখেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনের সাহিত্যিক বিরোধে কলকাতার আসর সরগরম।

চার

কলকাতার অবস্থান বরাবরই মোহিতলালের সাহিত্য চর্চার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। চাকরী-জীবনের পূর্বে ছাত্র থাকাকালীন অর্থাৎ বি. এ. পরীক্ষা দেবার কিছু আগে কলকাতায় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন। ইন্দুপ্রকাশ ১৩১৬ সালে 'মানসী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন , উক্ত পত্রিকায় লেখার জন্যে মোহিতলালকে তিনি আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য ১৩১৫ চৈত্র সংখ্যায় 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং সেটির প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এই প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার বড়াল-অনূদিত ওমরখৈয়াম রুবাইয়াতের প্রচুর উদ্ধৃতি রয়েছে। অক্ষয় বড়াল যে মোহিতলালের একজন প্রিয় কবি ছিলেন সেটি বোঝা যায় এবং ড সুশীলকুমার দে-ও 'বিস্মরণী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে অক্ষয়কুমার মোহিতলালের প্রিয় কবি ছিলেন। তার আগে কয়েকটি অখ্যাত

পত্রিকায় মোহিতলালের লেখা প্রকাশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয় এই 'মানসী'তেই। ১৩১৫ চৈত্র থেকে ১৩২১ পর্যন্ত তিনি 'মানসী'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়কার 'মানসী'তে প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার তালিকা হচ্ছে—

পৌষ ১৩১৬—মন্দির-পথে

বৈশাখ ১৩১৭—ধূমকেতু (কল্পান্তের সহচর, উপপ্লব হেতু, বিশ্বত্রাস, অমঙ্গল, আমি ধূমকেতু)।

ফাল্গুন ১৩১৭—নির্মাল্য (গোলাপ রাঙা ফুলের মত সরমখানি ছিঁড়ে)।

বৈশাখ ১৩.৮—তন্দ্রাতুর (প্রহবে প্রহরে জাগিয়াছি আমি, এখন ভোরের রাতে)।

শ্রাবণ ১৩১৮—সূর্যাস্ত (আবার মিনতি করি, চাহিল দিবস-রাণী)।

শ্রাবণ ১৩১৯-কবি-কাহিনী (এমনি বসন্তপ্রাতে হয়েছিল দেখা বহু বহু দিন)।

মাঘ ১৩২০—আলো-জ্বালা (হাতে আছে একটুখানি বাতি)।

চৈত্র ১৩২০ বাসন্তিকা (রবি-কনকিত লতার কুঞ্জে পতঙ্গ করে খেলা)।

এই পত্রিকায় কবিতা-প্রবন্ধাদি লিখে লেখার বিষয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস জন্মে। ১৩২১-এর পৌষ সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ 'আমি' প্রকাশিত হয়--'আমি' তাঁর সেই আত্মপ্রতীতির জবানবন্দী। ইতিপূর্বে ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'মানসী'তে প্রকাশিত 'তুমি' নিবন্ধে পরবর্তীকালের তাঁর ভোগতৃষ্ণার অঙ্কুর পাওয়া যায়। ঐ বছরেই কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'বীরভূমি' পত্রিকায় কবিতা প্রবন্ধ এবং মোপাসার কয়েকটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কবিতা-প্রবন্ধ রচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইংরেজি গল্পের কিছু কিছু অনুবাদ করতেন। পরবর্তীকালে 'বঙ্গদর্শনে' যেসব গল্প অনুবাদ করেছিলেন সেগুলি এবং আগের গল্পগুলি একত্রিত করে 'বিদেশী গল্প-সঞ্চয়ন' (১৩৫৭) প্রকাশিত হয়। এরপর 'বঙ্গভারতী'র পৃষ্ঠায় কয়েকটি ভাল অনুবাদ গল্প প্রকাশিত হয়—সেগুলি এখনও কোন বইয়ে সংযুক্ত হয় নি।

সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করার সময় তিনি লিখতেন কম, পড়তেন বেশী। স্কুল ছুটির পর শিক্ষকদের নিয়ে কাব্যালোচনা করতেন। তাঁর আলোচনার ভঙ্গীতে শিক্ষকরা মোহিত হয়ে যেতেন। এ সময় তিনি নব্বই নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটের ত্রিতলে থাকতেন—একটি ছোট্ট

চিলে কোঠার মত খুপরি ঘরে। স্কুল ছুটির পর বহুবাজার অঞ্চলেই কোন কোন সুহৃদের বাড়ীতে কিংবা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যায় সাহিত্য-আড্ডায় হাজিরা দিতেন। তাঁর বাড়ীর নীচের তলায় সে-সময় কবিরাজী দোকান করেছিলেন জীবনকালী রায়। জীবনকালীবাবুর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। পরে (১৩৫৮) 'বাংলা ও বাঙালী' বইখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। বন্ধুত্ব গড়ে উঠার পর পথে সময় না কাটিয়ে তাঁর দোকানে সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ইত্যাদির আলোচনা করতেন। কোন শনি কিংবা রবিবার কাঁচড়াপাড়া (থাকতেন কবি-জননী) বা বারাকপুরে (কবি-প্রিয়ার পিত্রালয়) যেতেন। দুরবস্থা যতই থাক সাহিত্য-চচাব আনন্দ প্রচুর পবিমাণে জুটেছিল বলে দুঃখকষ্টকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। ইতিপূর্বে জ্ঞাতি খুল্লতাত দেবেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। কাব্য-সাধনায় করুণানিধানের নিষ্ঠা রূপচচা তাঁকে চমৎকৃত ও পরোক্ষে প্রভাবিত করেছিল। 'বিস্মরণী'র উৎসর্গপত্রে এই ঋণ তিনি স্মরণ করেছেন—

> চলেছিনু ক্লান্তপদে সুন্দরের তীর্থ-অভিলাষে,
> সমুখে পড়িল ছায়া,—বনপথে এ কোন্ পথিক
> গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান!
> জিজ্ঞাসিনু, কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
> বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্যের অধিক!
> অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান।

কবি করুণানিধানও তাঁকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ কবতেন। তাঁর মৃত্যুব পব 'লক্ষ্মণ-তর্পণ' নামে তিনি একটি অপূর্ব কবিতা লেখেন

> বড ব্যথা দিয়ে গেলে, এ উচিত হয় নি তোমার,
> আমার আগেই তুমি পঁহুছিলে মৃত্যুর ওপার।
>
> ছিলে জন্মান্তর-সাথী, যোগ-সূত্রে দিলে এসে ধরা,
> তব প্রীতি-নিদর্শন 'বিস্মবণী'—রসেব পসরা।
>
> কবে কোন্ শুভক্ষণে আমাদের প্রথম মিলন,
> আনন্দ মুহূর্তগুলি ভরিল তোমার গুঞ্জরন।

.. ..

হেদুয়ার পাড়ে গিয়া দূর্বাদলে বসিতাম মোরা,
পাসরিয়া সুখ-দুঃখ, বাস্তবের সাদা-কালো ডোরা
রসবোদ্ধা ছিলে তুমি, গুণবতী কনক-তুলায়
বিচারিলে বহু লেখা, সত্য কথা ঢাক নি মিথ্যায়।

... .

অবগাহি গঙ্গাজলে বিরাটের ধ্যানে নিমগন
আত্মার উদ্দেশে তব করিলাম 'লক্ষ্মণ-তর্পণ'।

—শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৮

'ভারতী' গোষ্ঠীর সংস্পর্শে তিনি আসেন। এই গোষ্ঠীর সংস্পর্শেই তাঁর প্রতিভা ক্রমশঃ বিকশিত হতে থাকে। 'ভারতী'র তদানীন্তন সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-জীবনের এক মস্ত বড় সহায়ক ছিলেন। 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্য তাঁকে উৎসর্গ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর কবিতা-প্রবন্ধাদি ছাড়া তিনি 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনাম নিয়ে ১৩২৬ অগ্রহায়ণ থেকে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় মাসকাবারি নামক অধ্যায়ে কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী', 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাঁর গদ্য-পদ্য বেরিয়েছে। সে সময় সাহিত্যসেবীদের দুটি বড় আড্ডা ছিল—'ভারতী' ও গজেনদা'র আড্ডা ছাড়া 'মোসলেম ভারত' ও 'যমুনা' কার্যালয়েও ছোটখাট জমায়েত বসত। মোহিতলাল এইসব আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিতেন। তবে বেশীর ভাগ 'ভারতী' ও গজেনদা'র আড্ডাতেই তাঁকে পাওয়া যেত। নবীন প্রবীণ বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর এ ভাবে আলাপ হয়েছিল—তার মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় উল্লেখযোগ্য। এর আগে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, কিন্তু ব্যক্তি শরৎচন্দ্রকে দেখার আগ্রহ তাঁর জন্মে। প্রথমে 'যমুনা' অফিসে শরৎচন্দ্রকে দেখেন। 'ভারতী'র বৈঠকে তিনি শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং ১৩২৩-এ ঢাকায় তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয়। মোহিতলাল এই সব সাক্ষাতের বিবরণ 'শরৎ-পরিচয়' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।

'কল্লোল যুগে' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন যে গজেনদা'র আড্ডায় মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। কিন্তু খবরটি ভুল। তাঁদের

সাক্ষাৎ-পরিচয় প্রথম কোথায় হয়েছিল মোহিতলাল কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন।

একদিন করুণানিধানের বাসায় মোহিতলাল 'মোসলেম ভারতে'র কয়েক-খানি সংখ্যা পান। মলাটের আরবী নক্সার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা—

বাদলা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনা যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়·
জমলো আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকী লাও ভর-পিয়ালায়!
ভিজলো কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হরদম্! হরদম্ দাও মদ, মস্ত করো গজল গেয়ে!
ফেরদৌসের ঝরকা বেয়ে গুল-বাগচায় চলচে হাওয়া,
এই তো রে ভাই ওক্ত খুশিব, দ্রাক্ষারসে দিলকে নাওয়া।
কুঞ্জে জরীন ফারসী ফরাস বিছিয়েছে আজ ফুলবালারা,
আজ চাই-ই-লাল শিরাজী স্বচ্ছ সরস খোর্মা-পারা!
মুক্তকেশী ঘোর নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকী,
চুম্বন এবং মিষ্টি হাতের মদ পেতে তাই ভরসা রাখ!
কান্তা সাথে বাঁচতে জনম চাও যদি কওসর অমিয়,
সুর বেঁধে বীণ্ সারেঙ্গীতে খুবসে শিরীন শরাব পিয়ো!
খুঁজবে যেদিন সিকান্দারের বাঞ্ছিত আব-হায়াত কুঁয়ায়,
সন্ধান তার মিলবে অনেক দিল-পিয়ারার ওষ্ঠ চুমায়!
খামখা তুমি মরছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদখোরের এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে!

বাদল-প্রাতের শরাব: মোসলেম ভারত, ১৩২৭ আষাঢ়। পূবের হাওয়া 'রিমঝিমিয়ে' আর 'সিঞ্জিনী যে' মিলের এই অপরূপত্বে করুণানিধানের দৃষ্টি আকৃষ্ট করায় দুই কবিই একটু উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। পরে একে একে নজরুলের প্রকাশিত সবকটি কবিতাই পড়া হয়। এরপর 'মোসলেম ভারতে' মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে নজরুলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দেন। সেই চিঠি ছাপা হয় ১৩২৭ সালের ভাদ্র মাসে। চিঠিতে লেখেন—

"আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী—এক কথায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি, এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতার শব্দার্থময়ী কণ্ঠভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারুচাতুরীতে পর্যবসতি হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বরসপ্তকের সেবক হইয়াছে।..."

এই দীর্ঘ চিঠি পড়ে উৎসাহিত হয়ে তরুণ কবি গান গাইতে গাইতে একদিন মোহিতলালের বাসায় উপস্থিত হন। সেই থেকে উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়।

তরুণ উদীয়মান কবিদের প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দেবার কাজে মোহিতলালের প্রচুর উৎসাহ ছিল। প্রমাণস্বরূপ একজন অপরিচিত অখ্যাতনামা কবি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'নবফুল' কাব্যখানা নিয়ে 'ভারতী'র 'মাসকাবারি'র প্রথম কিস্তি শুরু করেছিলেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' যখন 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে বেরুচ্ছিল (আষাঢ় ১৩৩৫) তখন মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি' মারফৎ 'পথের পাঁচালী'র গুণাগুণ ব্যক্ত করেছিলেন (ফাল্গুন ১৩৩৮)। নজরুলের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁর মনকে হৈ-হল্লা থেকে সাহিত্যাভিমুখী করার জন্যে নিজের পরিবেষ্টনের মধ্যে নিয়ে এলেন। নজরুলকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর চেষ্টা ও

উপদেশের বিরাম ছিল না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই গুরু-শিষ্যে বিরোধ বাধল—পরস্পরের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। মোহিতলাল রাগের মাথায় শিষ্যকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন। 'দ্রোণ-গুরু' কবিতায় তিনি লিখলেন—

আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি তুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে!—ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার,—মহাবীর হওয়া মর্কট সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস—
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!

'দ্রোণ-গুরু' কবিতাটি কবি কোনও বইয়ে দেন নি। কিন্তু 'বিস্মরণী'তে নজরুলের প্রতি অভিশাপমূলক আর একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। সেটির নাম—'সুইনবার্ণের অনুসরণে'। ইংরেজি কবিতার অনুসরণ হলেও কবির মনে ছিল নিজের ও নজরুলের তুলনা। এর দুটি পঙক্তিও বড়ই মর্মান্তিক-রূপে সত্য—

সর্পদষ্ট মৃতসম মরিয়াও হইবি অমর—
শব হ'য়ে জাগিবি রে তুই মৃত্যুহীন মরণ-বাসর!

পরবর্তীকালে নজরুল কি সত্যই শব হয়ে অনন্ত 'মরণ-বাসরে' জেগে ছিলেন না? কিন্তু 'স্বপন-পসারী'তে নজরুলের উদ্দাম তারুণ্যকে লক্ষ্য করে কী স্নেহ-সরস কবিতাই না তিনি লিখেছিলেন একদিন 'ঘরের বাঁধন' নাম দিয়ে—

বেরিয়ে-পড়া এতই সোজা? বারে বারে তুই যে বলিস্!
কানুর-পিরীত-নেশায়-রঙীন্ অন্ধকারে তুই যে চলিস্!
পায়জোরে তোর ঝম্‌ঝমাঝম্
ছিটকে পড়ে শঙ্কা-শরম্!
কাল-ফণী সে লুটিয়ে ফণা, পায়ের তলায় যখন দলিস্!
আলতা পরায় পথ যে তোরে, গহন বনে যখন চলিস্
কাঁটা দলিস্!

... ...

বেরিয়ে পড়া নয় ত' সহজ !—সে কাজ শুধু তোরেই সাজে,
ফাগুন-ফুলের মালা গাঁথে যে-জন আগুন-খেলার মাঝে !

এছাড়া 'উপাসনা'র ১৩২৮ ভাদ্র সংখ্যায় 'শ্রীযুক্ত নঃ ইঃ-এর উদ্দেশ্যে' 'প্রবাসী'র ১৩৩০ আষাঢ় সংখ্যায় 'কবি-বিদ্রোহীর প্রতি' নামে আরও দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এ দুটি কবিতা তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নি। পুরো দুটি কবিতা এখানে তুলে দিলাম। 'উপাসনা'য় প্রকাশিত কবিতা—

বক্ষ তোমার আদুল এ যে, কণ্ঠ কালো কিসের বিষে ?
প্রাণের দাপট ঝড়ের ঝাপট্ উড়িয়ে দিল উত্তরী' সে !
লাল সে দেখি নখের কিনার,
নয় ত রঙীন্ ছাপ সে হেনার !—
কলজেখানা টানতে ছিঁড়ে লাগল শোণিত-চিহ্ন কি সে '
উর্ধ্বমুখে রক্ত ছোটে,
ঠোঁটে কি তাই আলতা ফোটে ?
তাই কি হাসির খর্‌রা এমন ফুটছে আবির পিচকিরিতে ?
মরণ-চুমা চুঁইয়ে ঝরে আফিম-নেশার মিছরি-গীতে ?
চক্ষে তোমার ঘনায়-আঁধার—সাঁঝের দীঘির অতলকালো !
মূর্চ্ছে সেথায় ডুবে-মরা কোন্ রূপসীর হাসির আলো !
এখনো তার নীলাম্বরী
দেয় গো দেখা সোপান 'পরি,
কলস-মুখের বুদবুদেরা কখন গেছে হাওয়ায় মিশে,
জলের তলে নিথর নিশা শিউরে ওঠে শ্যামার শিসে !
তবুও কি আজ মেঘের ছায়া নামল ললাট-অলক-বনে !
ইন্দ্রধনুর পুচ্ছ-চূড়া দেখছি যে তার ক্ষণে ক্ষণে !
মা-যশোদার প্রাণের কূলে
আজ যে ভয়ে বাদর দুলে !
কৃষ্ণা তিথির কোন্ অতিথি তৃষ্ণাতে মুখ দিলে স্তনে !
বৈশাখী সে বাজের জ্বালা
আজ যে ভাদর-আদর ঢালা !
মাথায় যে তাই মেঘের কাজল উথলেছে কার স্নেহাশিষে
কাঁদন-কারায় বাঁধন-হারায় নূতন জনম-অষ্টমী সে !

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত কবিতা—

মাথায় তোমার কৃষ্ণমেঘের নিশান দোলে!
নহে ত অশ্রু! তরল তড়িৎ চোখের কোলে!
ওকি ও পিপাসা! নিদারুণ আশা বক্ষে ধরি'
ঘোষিছ প্রলয়-ডমরু-নিনাদ বজ্ররোলে!
মানস-আকাশে রক্ত-সাগরে ডুবিছে রবি?
কাল-নিশীথিনী বধূ কি তোমার, মরণ-লোভী?
এতটুকু আলো কোথাও নাহিরে!— সৃষ্টি শেষ!
চিতায় চিতায় ফুৎকারি তাই ফিরিছ কবি!
যুগান্তরের বহ্নি-আহবে মশাল জ্বালি'
করোটি-কপালে বিষ-অভিশাপ-আসব ঢালি'
একি সুধাপান! ভয়ঙ্করের একি এ নেশা!
উদ্যত ফণা ফণীর সমুখে কি করতালি!
তবু যে তোমার ললাটে জ্বলিছে উদয়-তারা!
কণ্ঠে তোমার প্রভাতী রাগিণী দেয় যে সাড়া!
নবজীবনের নবীন নবনী মুঠায় ভরি'—
কোন্ পুতনার স্তন পান করি আত্মহারা!
ওরে উন্মাদ, চিরশিশু, তোর একি এ খেলা!
কি স্বপন তুই দেখেছিস বল্ রাত্রিবেলা?
সে যে শশিকলা ছুরিকার ফলা নহে সে নহে
রোজ-কিয়ামত নয়, সে যে নওরোজের মেলা।
আমি জানি ঐ কণ্ঠে তোমার অমৃত রাজে;
বিষ যদি থাকে থাক্-না সে এ বুকের মাঝে!
তার জ্বালা সে যে'জীবনের দাহ, সঞ্জীবনী—
তাহারি দহনে চিত্ত-গহনে দীপক বাজে!
হাজার বছর ম'রে আছে যারা তাদের কানে
কী বাণী দানিবে ঘূর্ণি-হাওয়ার নৃত্য-গানে?
জাগরণ নয়!—দণ্ড ছ'য়ের দানোয় পাওয়া
তারপর? ছি ছি মড়ার উপর খাঁড়া কি হানে!

তুমি নির্ভীক, তুমি দুর্দম, ঝড়ের সাথী ;
তুমি সমীরণ ফুলেদের সনে কাটাও রাতি :
জীবন-মরণ দুই সতীনেরে করেছ বশ—
যখন যাহারে খুশী হয় দাও চুমা কি লাথি !
রক্ত যাদের নেই এক ফোঁটা দেহের মাঝে—
খুন-খারাবী মন্ত্র তাদের দেওয়া কি সাজে ?
পচা দেহে যার কিল্‌বিল্‌ করে শতেক ক্রিমি,
কোন আগুনের তাপ তারে কভু লাগিবে না যে !
কারা সে করিবে মরণের মহা-গরল পান ?
বিষ-নিঃশ্বাসে আপনা দহিবে—কোথা সে প্রাণ ?
যারা মরে আছে তারা কি আবার মরিতে পারে !
ভেবে দেখো নিজে ত্যাগ করো বৃথা এ অভিযান ।
চেয়ে দেখ দেখি পূর্ব-তোরণে কিছু কি জাগে—
নিশীথের নীল আঁচলে আলোর ছোপ কি লাগে ?
ও নহে রক্ত !—শতেক ভক্ত ছেয়েছে হোথা
উদয়ের পথ হৃদয়ের প্রেম-পদ্মরাগে !
তুমি গেয়ে চল ঐ পথে পথে আপন-হারা .
জন্ম-বাউল ! আলোকের দূত ! পথিক-পারা
চুলগুলি তুলি' চূড়া বাঁধি লও, খঞ্জনীতে
ঝঙ্কার তুলি জাগাও সারাটি ঘুমের পাড়া ।
তুমি শুধু ডাকো—'জাগো সবে জাগো' আলোক জাগে !
হিরণ কিরণ প্রাণের দুয়ারে প্রবেশ মাগে ,
মোর মুখে তোরা চেয়ে দেখ্‌ দেখি, অবিশ্বাসী !
এমন হাসিটি দেখেছিস কোনো গোলাপ-বাগে ?
'ওরে কেটে গেছে চিরতরে মোর দুঃস্বপন !
কাঁটা যেথা ছিল দেখ্‌রে সেখানে ফুলেরি বন !
মহা-আশ্বাস ছায় নীলাকাশ—দেবতা জাগে !
সাগর-সিনানে যাবি যদি—এই পরমক্ষণ !
'তবু একবার ডেকে বল্‌ তোরা—মরি[illegible]রা !
মরণ !—সে যে গো মহাকাল-হাতে র[illegible]ডোরা !
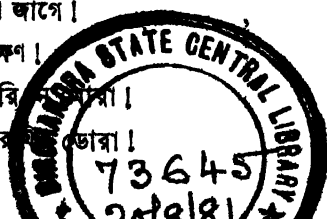
জীবনেরি মোরা পরমাত্মীয়, চিনেছি তারে !
জীবনেই জয়, প্রেমেই অজয়—বল্ গো তোরা !
'মরিয়া যে বাঁচে —বাঁচা তার নয়, সেই তো মরে !
বাঁচাতে যে মরে মরণ তাহারে প্রণতি করে ।'
যুগে যুগে এই মহাবাণী এই অমৃত-গীতা
গেয়েছেন যারা—জন্মেছি মোরা তাদেরই ঘরে ।
হে কবি নবীন জীবন তোমার মুক্ত-ধারা !
তুমি গাও গান—শুনিবে সকলে নিদ্রাহাবা ।
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বাস—অভয়-বাণী
আলোক-আঘাতে ভেঙে দাও এই আঁধার কারা !

নজরুলের অসুস্থ অবস্থার জন্যে মোহিতলাল দুঃখ অনুভব করেছেন, তাঁকে মনে মনে ভালবেসেছেন। 'কল্লোল যুগ' পাঠ করে অচিন্ত্যকুমারকে পত্রে জানিয়েছিলেন, "নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহার একাধিক কারণ আছে, আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড shock—তাহার পবিমাণ বা গভীরতা অন্যে বুঝিবে না। যদি আমার 'স্মৃতিকথা' লিখিয়া যাইতে পাবি, তবে তাহার একটা বড অধ্যায় হইবে ওই কাহিনী।" কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লেখার অবসবই পান নি। আকস্মিক মৃত্যু তাঁর মনেব বাসনাকে অপূর্ণ রেখে গেছে। এবার নজরুল-মোহিতের বিরোধের কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করি।

কবিরাজ জীবনকালী রায়ের দোকান-বাড়ীতে, গজেনদা'র আড্ডায়, 'মোসলেম ভারত' কার্যালয়ে, 'ভারতী'ব আড্ডায় মোহিতলালেব পাশে নজরুলকে দেখা যেত। সেসব আড্ডায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। মোহিতলাল তখন কাজীর কবিতা যত্রতত্র আবৃত্তি করতেন এবং লোকের দৃষ্টি যাতে নজরুলেব প্রতি আকৃষ্ট হয় তার জন্যে 'মোসলেম ভারতে' দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ, জনগণের সস্তা প্রশংসার কাঙাল ছিলেন না। আর তিনি জানতেন জনতার বাহবা নিয়ে কেউ বড় কবি হতে পারে না। কাজেই কাজীর কবি-খ্যাতিতে তাঁর ক্ষোভ হবার কথা নয়।

মোহিতলাল একদিন 'মানসী' (পৌষ ১৩২১) থেকে 'আমি' শীর্ষক প্রবন্ধটি কাজীকে পাঠ করে শোনান। এর কিছুদিন পরেই নজরুল 'বিদ্রোহী'

কবিতা লেখেন (কার্তিক ১৩২৮)। 'আমি' ও 'বিদ্রোহী'র মধ্যে পরস্পরের বৈশিষ্ট্য পৃথক হলেও ভাবধারার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন—

আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর নভোনীলিমার ন্যায় সর্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্ত-সীমন্তের সিন্দূরচ্ছটা, সূর্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাট চন্দন। ··

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ, পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্যাস্ত-শেষ প্রায়ান্ধকারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তর-উষার (Aurora Borealis) ন্যায়।

আমি ভীষণ,—অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্ন-বিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, বিদীর্ণহৃদয় পিতৃরোষ। আমি ভীষণ,—রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মত, আগ্নেয়গিরির ধূমাগ্নিবমনের মত, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত, অখণ্ডনীয় প্রাক্তনের মত। দুর্ভিক্ষের সচল নরকঙ্কালে আমাকে দেখিতে পাইবে; যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ভোগলালসায় আমার জিহ্বা লক্‌লক্ করিতেছে। আমিই মহামারী। রুধিরাক্তকৃপাণ ঘাতকের অট্টহাসিতে, মৃতজনের শূন্যদৃষ্টি চক্ষু-তারকায় আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবে।

আমি মধুর,—জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনের মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধারাস্পর্শের মত; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিবাহধূমারুণলোচনশ্রী নববধূর পাণিপীড়নের মত; যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সরমসঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত। ···। —আমি : জীবন-জিজ্ঞাসা।

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর.
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
··· ··· ··
আমি ধূর্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর।
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!

আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণি-সুত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য!
... ...
আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।
..
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে
দেখা-অনুখণ,
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তা'র
কাঁকন চুড়ির কন-কন্!
—বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা

পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি কাজীর কবিতায় ছিল না বলে মোহিতলাল একটু ক্ষুণ্ণ হন। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর কাজীর বহু তরুণ বন্ধু জুটে গেল। মোহিতলাল হৈ-চৈ ভালবাসতেন না, কাজেই আস্তে আস্তে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনও বাদ-বিবাদ হয় নি। 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন চাঁপা', 'বিষের বাঁশী' কাব্য-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজী মোহিতলালকে উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেকটি কপি দিয়েছিলেন।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ মিলিত হয়ে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা প্রকাশ করেন (২৬শে জুলাই, ১৯২৪)। এ পত্রিকার কোন গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল গদ্যে-পদ্যে লোকের নামে ফুটকি কেটে তাঁকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখার নিছক আমোদ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই উদ্যোক্তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নজরুলই হলেন এ পত্রিকার প্রধান টারগেট। তাঁকে লক্ষ্য করেই প্রতি সপ্তাহে চিঠি বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ

করতে শুরু করল—কাজী এজন্যে পরিহাস করে বলতেন, "শনিবারের চিঠির কৃপায় আমি গালির গালিচায় বাদশাহ।" 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাতেও এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, "প্রতি শনিবারই চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা'!" 'বিদ্রোহী' প্রকাশের (১৯২১) বছর দুয়েক পর সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠিতে (১৯২৭, ৪ঠা অক্টোবর) সজনীকান্ত দাস 'বিদ্রোহী' কবিতাকে বিদ্রূপ করে 'ব্যাঙ' শীর্ষক কবিতা বেনামে প্রকাশ করেন—

আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ।
আমি ব্যাঙ
দুইটা মাত্র ঠ্যাং।

·

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিতফণা
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গোণা—
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অব বিস্কে', 'সাইক্লোন' আমি, মরুসাগরের আঁধি।

কাজী ও তরুণ বন্ধুরা এ কবিতাটি মোহিতলালের রচনা বলে ভুল করলেন। এর আগে 'চিঠির প্রথম সংখ্যায় (২৬শে জুলাই, ১৯২১) কাজীকে ব্যঙ্গ করে 'গাজী আব্বাস বিটকেল' ও সপ্তম সংখ্যায় 'আবাহন' কবিতা দুটি বেরোয়। ক্রোধের ইন্ধন প্রথম থেকেই জমছিল, 'ব্যাঙ' এসেই আগুন জ্বালিয়ে দিল। স্বয়ং কাজী এবার আসরে অবতীর্ণ হলেন—মোহিতলালকে লক্ষ্য করে 'সর্বনাশের ঘণ্টা' ('ফণি মনসা' বইয়ে নাম দিয়েছেন 'সাবধানী ঘণ্টা') কবিতাটি কল্লোলে' লিখলেন (১৩৩১, কার্তিক)—

চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি!
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা ক'রে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি!

হে অস্ত্রগুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়কেতু, হ'লে কুক্কুর-কুরু-নেতা!
... ...

আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে!
কালীয় দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে—
তাহার দাহ ত তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জলুনীর চোটে। তুমি পাও কোন্ সুখ?
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি?
... ...

তুমি ভিড়িও না গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল-শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।

কবিতাটি মোহিতলালের বিরুদ্ধে লিখিত হলেও কাজী তাঁর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারেই লিখেছিলেন। কবিতায় তাঁর যত কিছু আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে যারা মোহিতলালকে অধিকার করে বসেছে তাদের প্রতি। অথচ তিনি জানতেন না যে মোহিতলাল কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি থেকে অনেক দূরে ছিলেন। মোহিতলাল গেলেন রেগে—'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে তিনি তখন জড়িত হয়ে পড়েন নি। দূর থেকে কাজীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিনি লক্ষ্য করছিলেন—সজনীকান্তের সঙ্গে তখন ভাল করে পরিচয়ও হয় নি তাঁর। যখন তাঁকে আক্রমণ করে 'কল্লোলে' কাজীর কবিতা বেরুল তখন তার প্রত্যুত্তরে 'দ্রোণ-গুরু' কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশের জন্য পাঠালেন। ঐ সূত্রে সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় পাকা হল, কবিতাটি 'চিঠি'র বিশেষ বিদ্রোহ-সংখ্যায় যথাসময়ে (২৫শে অক্টোবর ১৯২৪: ৮ই কার্তিক ১৩৩১) প্রকাশিত হল এবং তিনি শনি-চক্রের দলভুক্ত হলেন। দলভুক্ত হবার ইতিহাস সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "যখন ঐ নূতন সাহিত্যিক উপদ্রবটি বেশ একটু উৎসাহ সহকারে আত্মঘোষণা করিতেছে, তখন আমি 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।...এই সময়ে আমি ইহাদের বৈঠকে বসিতাম বটে কিন্তু ঐ পত্রিকায় কিছু লিখি নাই; আমার বয়সের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ইহারাও আমাকে টানিতে সঙ্কোচবোধ করিতেন।

...ই'তমধ্যে কোন একটি ঘটনার (নজরুল প্রসঙ্গ) সাক্ষাৎ তাড়নায় আমি 'শনিবারের চিঠি'র সেই সাপ্তাহিক হুল্লোড়ের মধ্যে একরূপ নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি, আমিও কয়েকটি কবিতা শেষের দিকে উহাতে লিখিয়াছিলাম; এই কারণে আমার সহিত একটি যোগসূত্র ঘটিয়াছিল। ক্রমে আমি ঐ মণ্ডলীতে উপদেষ্টার আসনও লাভ করিয়াছিলাম।" (আমি ও শনিবারের চিঠি)। পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝবার ফলে গুরু-শিষ্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেল। বিরোধ হলেও কাজীর কবিতা মোহিতলালের প্রিয় ছিল, যখন-তখন আবৃত্তি করতেন। কবির সঙ্গে যাই হোক তাঁর কবিতাকে ভালবেসেছেন—উৎকৃষ্ট কবিতা তাঁর মাতৃভাষার সম্পদ। বাংলা সাহিত্যকে যখন ভালবেসেছেন তখন ঐ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানানো যে তাঁর নিত্যপূজার অর্ঘ্য।

১৩২৮-এর শ্রীপঞ্চমীতে (১৯২১) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয়। তখন বাংলা-সাহিত্যে নূতন ও পুরাতনের কোলাহলময় দ্বন্দ্ব মুখর হয়ে উঠেছে। 'দেবেন্দ্র মঙ্গল' কাব্যপুস্তিকা প্রথম হলেও মোহিতলাল তাকে পরবর্তী জীবনে স্বীকৃতি দেন নি। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। যুদ্ধ ভারতবর্ষে সংঘটিত না হলেও তার বিষময় প্রতিক্রিয়া থেকে ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করতে পারে নি—বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার চাপে শিক্ষিত যুবকদের হতাশা-বিড়ম্বিত বেকার জীবন, পুরোনো সংস্কারে কুঠারাঘাত. পাশ্চাত্ত্যের ধ্যান-ধারণাব অভ্যুদয় ইত্যাদি কার্যকারণে নতুনের দল 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি'তে ফুল ফোটাবার সাধনায় লেগে গেলেন আর অপরদিকে রক্ষণশীলরা চোখ-কান বন্ধ করে 'গেল' 'গেল' চীৎকার জুড়ে দিলেন। 'স্বপন-পসারী'র আবির্ভাব সে-যুগের পক্ষে সংস্কারবিরোধী ও বিদ্রোহাত্মক বলে বিবেচিত হয়েছিল। সেই কারণে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নিকট তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছিল। পুরোনো মনের নোঙর-করা জাহাজকে চিহ্নিত তীর থেকে পরম দুঃসাহসে নতুন দিগন্তের সন্ধানে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে তরুণদের কাছ থেকে তিনি আশাতীত অভিনন্দন পেয়েছেন। সেদিন তিনি শুধু একজন কবি ছিলেন না, ছিলেন একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, কত তরুণ কবির প্রেরণার উৎসস্থল। তাঁর কবিতার কত ছত্র তাঁরা পথে পথে মুখস্থ আওড়িয়েছেন—

এই দুনিয়ার ডরি না কাহারে, আমরাই প্রজা আমরা রাজা!
আমাদের সাধে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা!

—বেদুঈন

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি', যেই জন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ।
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয় নি নিমন্ত্রণ। —পাপ

জীবন মধুর। মরণ নিঠুর— তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হয়ে যাক হিতাহিত-জ্ঞান!
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শম্ভুর মত তুলি'—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি!
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি'! —অঘোর-পন্থী

ধর্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে—
মন্ত্রে তন্ত্রে প্রাণ নাহি পূরে!
আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে ক'রি লব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব। —মৃত্যু

'স্বপন-পসারী' কাব্যগুচ্ছ প্রকাশের আগে তিনি 'মানসী', 'বীরভূমি' প্রভৃতি কাগজে কবিতা লিখেছেন কিন্তু সেগুলি তিনি কোন কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত করেন নি। 'স্বপন-পসারী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, "প্রথম বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই, গত দশ বছরে যাহা লিখিয়াছি তাহারই কতক বাদ দিয়া বাকি কবিতাগুলি একত্র করিয়া দিলাম।" প্রথম বাইশ বছর পর্যন্ত তিনি যেসব কবিতা লিখেছেন সেগুলিকে তিনি পরবর্তীকালে কাব্যমর্যাদা দেন নি। তেইশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে যা 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছেন সেগুলিই 'স্বপন-পসারী'র মধ্যে সংকলিত হয়েছে। এই সময়ে শিক্ষকতা করেছেন, কিছুকাল সরকারী কানুনগোর চাকরী করেছেন। এই কানুনগো জীবনের অভিজ্ঞতা 'স্বপন-পসারী'র কয়েকটি কবিতার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কলকাতার সাহিত্যিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয়ে তিনি সরকারী চাকরী ত্যাগ করে আবার শিক্ষক-জীবনে

ফিরে আসেন। তখন 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি আড্ডা জমে উঠেছে। মোহিতলাল এই পত্রিকায় লেখা প্রকাশসূত্রে আড্ডার অংশীদার হন এবং শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এই ঘনিষ্ঠতা তাঁর কবি-জীবনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। 'স্বপন-পসারী'র অনেক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলামের প্রভাব দেখা যায়।

১৩৩৩-এর শ্রীপঞ্চমীতে (১৯২৬) তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হতেই তাঁর খ্যাতির ক্ষেত্র আরও প্রসার লাভ করে। ড. সুশীলকুমার দে 'প্রবাসী' আষাঢ় ১৩৩৪ সংখ্যায় 'বিস্মরণী'র বিস্তৃত আলোচনা করেন। সংস্কার-বিরোধী তরুণ লেখকগোষ্ঠী কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি' তাঁকে সংস্কারমুক্তির অন্যতম পথপ্রদর্শক ও আধুনিকতার আচার্য হিসেবে গণ্য করেন। উক্ত গোষ্ঠীর পত্র-পত্রিকাতেই শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নয়, সেদিনকার প্রত্যেক তরুণ কবি মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলার মন্ত্র নিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু সেদিন অচিন্ত্যকুমারকে পত্র মারফৎ জানিয়েছিলেন, "এবারকার 'কল্লোলে' শৈলজার ছবি দিয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। আধুনিকদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান করার সময় বোধ হয় এসেছে। তা হলে কিন্তু এবার মোহিতলালের ছবিও দিতে হয়। কারণ আজকের দিনে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন শৈলজানন্দ, কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি মোহিতলাল—নয় কি?"—কল্লোল যুগ। প্রগতি' পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যায় তিনি দৃপ্তভরে লিখেছিলেন, " 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হবার পর একথা বলা বাহুল্য যে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই। বাংলা কবিতার ধারা যে রবীন্দ্রনাথের যুগ পেরিয়ে এসেছে আমাদের সাহিত্যের উন্নতি-কামীদের পক্ষে এটা আনন্দের কথাই তো হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। বলা বাহুল্য হলেও এ-কথা বলার আজ প্রয়োজন হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই বাংলার কাব্য-সাহিত্যের সমস্ত possibilities-এর পরিণতি বা পরিসমাপ্তি হয় নি। আজ যদি কোন কবি দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের জন্মের চল্লিশ বছর পরে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটি যেমনভাবে বলেন নি, সেই কথাটি তেমনভাবে বলে' থাকেন, তবে ভাবধারার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্বের জন্য কি কুৎসার কলঙ্কই তাঁর একমাত্র প্রাপ্য হবে? রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় romanticism-এর ভগীরথ—এক romanticism-এর চরম প্রকাশ হয়তো তাঁর

কবিতায় আছে, কিন্তু romantic ছাড়াও যে উঁচুদরের কবিতা হয় সে-কথা ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন। আজ যদি বাংলা কবিতায় অনেকখানি dramatic ও intellectual element প্রবেশ করে থাকে, তবে তার জন্যে আমরা যুগধর্মকে অভিশাপ না দিয়ে অভিনন্দনই করি, কেননা তা থেকে আমরা অন্ততঃ এই কথাটা বুঝতে পারি যে এযুগের কবি জীবনটাকে যেমন ক'রে দেখছেন তেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বা পূর্ববর্তী আর কোনো কবি দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন বাংলা সাহিত্যকে শাসন করতে আরম্ভ করলে, তখন একটা হলো তার reaction অতএব revolution এবং আর একটা হলো তার evolution, এই revolution রূপ পেয়েছে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা'য় এবং evolution পরিণতি লাভ করেছে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী তে।' পরবর্তী কালে মোহিতলালের মৃত্যুর পরও এ কথার তিনি প্রতিধ্বনি করেছেন, "আমাদের তরুণবয়সে যখন রবিদ্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপটি আমরা পার হচ্ছিলাম তখন যে দু জন কবিতে আমরা তখনকার মতো গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, তাদের একজন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর একজন বিস্মরণীর মোহিতলাল।" —কবিতা: আশ্বিন ১৩৫৯।

এই প্রাণোচ্ছল তরুণের দল মিলিত হয়ে ১৩৩০ বৈশাখ থেকে 'কল্লোল' কাগজ বের করেন। এই 'কল্লোল' শিবিরে আধুনিকতার পূজারীরা সমবেত হলেন। মোহিতলাল তখন মনে-প্রাণে তরুণ, কালো চিকণ নয়ন থেকে তারুণ্য উপচিয়ে পড়ছে, দৃষ্টিতে রয়েছে একটি প্রত্যাশার দ্যুতিই নয়, রয়েছে একটি সুদৃঢ় প্রত্যয়। তরুণ-মনের প্রেরণায় হঠাৎ একদিন কল্লোলে' এসে হাজির হলেন জমকালো ফ্যাশন দুরস্ত পোশাক নিয়ে নয়, একমুঠো যযাতিক প্রেমের তৃষ্ণার্ত কবিতার অঞ্জলি নিয়ে। 'কল্লোল তাঁকে মাথায় তুলে নিল। তাঁর বিদ্রোহ ও দেহবাদী প্রেমের কবিতা প্রকাশের সাহস 'কল্লোল' ছাড়া আর কোন কাগজের ছিল না, তখন 'কল্লোলে' না এলে মোহিতলালের বিকাশও সম্পূর্ণ হত না। কল্লোল-গোষ্ঠীর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয় যজনযাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জানতেন

না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম, তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্থ ছিল।·· তিনি নিজেও সেটা বুঝতেন নিশ্চয় তাই একদিন পরম-প্রত্যাশিতের মত এলেন আমাদের আস্তানায়, শোপেনহাওয়ারের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'পান্থ' সঙ্গে নিয়ে। সেই কবিতা আধুনিকতায় দেদীপ্যমান। 'কল্লোলে' বেরিয়েছিল তেরশো বত্রিশের ভাদ্র সংখ্যায়। আর এ কবিতা বের করতে পারে 'কল্লোল' ছাড়া আর কোনো কাগজ তখন ছিল না বাংলা দেশে।···তারপর তাঁর 'প্রেতপুরী' বেরোয় অগ্রহায়ণের 'কল্লোলে'। ···মোহিতলালও এলেন 'উত্তরা'য়, এলেন আমাদের পুরোবর্তী হয়ে। 'কল্লোলে'র সঙ্গে সঙ্গে 'উত্তরা'ও সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু কত দিন যেতে-না-যেতেই কেমন বেসুর ধরল বাজনায়। মতে বা মনে কোনো অমিল নেই, তবু কেন কে জানে, মোহিতলাল বেঁকে দাঁড়ালেন—'কল্লোলে'র দল ছেড়ে চলে গেলেন পল্বলের দলে।" —কল্লোল যুগ।

মোহিতলাল এ সময় (১৯২৩) থাকতেন ২৭ নং বাদুরবাগান লেনের মেসে। এই মেসে সজনীবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ছিলেন রাশভারী লোক—যেচে কারো সঙ্গে আলাপ করতেন না। সজনীবাবু তাঁর সঙ্গে আলাপ করার পথ খুঁজতেন কিন্তু মোহিতলালের ব্যক্তিত্ব ছিল এমনই যে কোনরূপ পথের হদিস সজনীবাবু পেলেন না। অগত্যা একদিন নিজের কুঠরীতে বসে মোহিতলালের 'স্বপন-পসারী' থেকে কতকগুলি কবিতা উচ্চস্বরে পাঠ করতে সুরু করে দিলেন—যাতে তাঁর কণ্ঠস্বর মোহিতলালের কানে যায়। মোহিতলাল তখন নিজের কুঠরী থেকে মুখহাত ধোবার জন্যে কলতলায় চলেছেন—এমন সময় তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে সজনীবাবুর দোরগড়ায় এসে দাঁড়ালেন। তারপর আলাপ হল—ক্রমে সজনীকান্ত মোহিতলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। কিছুদিন ঐ মেসে থাকার পর মেস ছেড়ে মোহিতলাল মাণিকতলা অঞ্চলের বাসা (৯৩১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট) ভাড়া করে সপরিবারে বাস করেন। এই বাসায় মোহিতলালের সাংসারিক জীবন সম্পর্কে সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে একটি রেখাচিত্র দিয়েছেন—"অত্যন্ত এঁদো গলিতে একটি জীর্ণ বাড়ি। তেতলায় দুইটি মাত্র ঘর। আর একটি নামমাত্র রান্নাঘর। দুইটি ঘরের মধ্যে একটিকে ঠাকুরঘর বলিলেও চলে। সেইটি 'ম' বাবুর বৈঠকখানা। তাঁহার আদরের মেয়ে (তাঁহার প্রথম সন্তান, ডাকনাম পেলা,

ঢাকায় গিয়া ইহার মৃত্যু হয় এবং ইহারই মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন পিতা তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মৃত্যুদর্শন' লেখেন।) 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াই আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। 'ম' বাবু তাহাকে কোলে লইয়া আমাকে তাহার কাকাবাবু বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো, আজ আমাদের অতিথিশালা সরগরম।' আমরা বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। বাড়ির চতুর্দিকের জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম—এই দুঃস্থ পরিবারের ঘাড়ে বোঝা হইয়া থাকা! 'ম' বাবু বাললেন, 'ভায়া, গিন্নী রান্না করুন, আমরা ততক্ষণ একটু কাব্যচর্চা করি। খুকী ঘুমিয়েছে।' তিনি তাঁহার দপ্তরপত্র টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। 'ম' বাবু ৪৫ টাকা মাহিনায় সামান্য স্কুল-মাস্টার, মাসে ১৫ টাকা তাঁহার ঘরভাড়াতেই লাগে। আজ মাসের ২৯ তারিখ, হয়ত কাল কি করিয়া রান্না চড়িবে তাহার ঠিক নাই। সেই লোক একটি স্থায়ী অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্বেগে কবিতা শোনাইতে বসিলেন!" সজনীকান্ত তখন কপর্দকহীন অবস্থায় ঘুরছেন, কোথায় খাবেন, কোথায় থাকবেন তার কোন স্থিরতা নেই। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর দেখা হল—নিজের দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁকে ধরে আনলেন, তাঁর চরিত্রের এদিককার পরিচয় আজকের দিনে চাপা পড়ে গেছে—তাঁকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যাতে পাঠক মোহিতলালের নাম শোনামাত্রই একটা 'শুষ্কং কাষ্ঠং' মেজাজী মানুষের কল্পনা করে নেয়।

জীবনের কোন বিশেষ ঘাটে মোহিতলাল বেশীদিন নোঙর ফেলে অবস্থান করতে পারেন নি—ছুটেছেন এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে, এক দল থেকে আর এক দলে। ১৩৩০-এ 'ভারতী' গোষ্ঠী ছেড়ে এসেছিলেন 'কল্লোলে'র দলে, 'কল্লোল' ছেড়ে চলে গেলেন 'শনি-চক্রে'। মানুষ যাকে ঢেকে রাখতে চায় সেই কামপ্রবৃত্তিকে নিয়ে তারুণ্যের নামে মাত্রা হারিয়ে মাতামাতি কল্লোল-গোষ্ঠী চূড়ান্তভাবে আরম্ভ করলেন, জীবনের সৎ ও সৌন্দর্যের দিকটা ত্যাগ করে কদর্যতার দিকটা নগ্নভাবে চিত্রায়িত করাকেই সত্যকার জীবন-শিল্পীর পরিচয় বলে মনে করলেন, তখন মোহিতলাল আস্তে আস্তে সরে দাঁড়ালেন। মোহিতলাল বললেন, "জীবন যাহার বিষয়, সেই সাহিত্য আর্টের মত নীতিহীন হইতে পারে না।" 'শনিচক্রে' গিয়ে ঐ অনাচার ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তাঁর দুর্বার লেখনী চালনা শুরু করলেন। 'কল্লোলে'র সঙ্গে মতানৈক্য হলেও 'কালি-কলমে'র সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছেন কিছুদিন (১৩৩৩-৩৪)।

'কল্লোলে'র মধ্য থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও মুরলীধর বসু ১৩৩৩ বৈশাখ থেকে 'কালি-কলম' কাগজ বের করলেন। কাগজের প্রথম সংখ্যায় তাঁর 'নাগার্জুন' কবিতা বেরোয়। 'কালি-কলমে' প্রকাশিত তাঁর রচনার তালিকা—

প্রথম বর্ষ ১৩৩৩

বৈশাখ	নাগার্জুন
জ্যৈষ্ঠ	তীর্থ পথিক (বৈশাখ ১৩৩৩-এর 'উত্তরা' থেকে 'চয়নিকা'য় উদ্ধৃত)
আষাঢ়	নারী-বন্দনা
শ্রাবণ	গদ্য ও পদ্য (শ্রাবণ ১৩৩৩-এর প্রবাসী থেকে 'চয়নিকা'য় উদ্ধৃত)
	সাধ্বী (আনাতোল ফ্রাঁসের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে গল্প)
ভাদ্র	ঘর-উদাসী
আশ্বিন ও কার্তিক	প্রেম ও ফুল
কার্তিক	সৃষ্টির আদিতে
মাঘ	বিদায় বাদল

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৩৪

বৈশাখ	স্মর-গরল
জ্যৈষ্ঠ	শ্মশানবাসিনী
আষাঢ়	রুদ্র-বোধন
	সত্যেন্দ্র-স্মরণে
	দেয়াল ভাঙা (ইংরেজি গল্পের অনুবাদ)
	কবি সত্যেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
শ্রাবণ	নারীস্তোত্র
আশ্বিন	শরৎচন্দ্রের প্রতি
কার্তিক	গান (হাইনের অনুভাবে)
অগ্রহায়ণ	রূপ-রহস্য
পৌষ	অপ্রেমিক
মাঘ	বিদায়-বাণী

'কালি-কলমে'র সঙ্গে মোহিতলালের সম্পর্ক ছেদের কারণ প্রসঙ্গে মুরলীধর বসু বলেছিলেন যে উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিচিত্রা'র

প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গ' বেরুবার পর তার বিরুদ্ধে মোহিতলাল একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখে 'কালি-কলমে' প্রকাশের জন্য আনেন। মোহিতলালের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পাদক একমত হতে পারেন নি বলে 'কালি-কলমে' সেই লেখাটি ছাপা হয় নি। তিনি লেখাটি 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপালেন এবং 'শনিচক্রে' পাকাপোক্তভাবে যোগ দিলেন। 'কালি-কলমে'র শেষ কবিতা 'বিদায় বাণী' 'কালি-কলম' থেকে তাঁর বিদায় ঘোষণা করল।

মোহিতলালের দেহবাদ রিরংসার প্রবৃত্তি নয়—তাঁর দেহবাদ দেহ থেকে বিদেহে যাত্রা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেদিন আদিরসাত্মক কবিতার মধ্যে মোহিতলালের কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নে একথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এই জন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পায়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জাবোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরী নেই। কিন্তু শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেখানেই উদ্দামভঙ্গীতে কেবল জলের নীচেকার পাককে আলোড়িত করতে থাকে। সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায়নি বা এরপরে স্থান পাবে না এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু ও জিনিষটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদজনক। বলাবাহুল্য সামাজিক বিপদের কথা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে ওটা অত্যন্ত সস্তা—ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ ধুলোয় যার লুটোতে সঙ্কোচ নেই, তার পক্ষে একেবারে সহজ।"
—সাহিত্যে নবত্ব: প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

১৩৩১, ১০ই শ্রাবণ থেকে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম হল। তারুণ্যের আড়ালে অশ্লীলতা রোধ করার নামে এদলও ভারসাম্য রাখতে পারেন নি। 'কল্লোল' 'কালি-কলম' পরে 'প্রগতি' উত্তরা'য় তরুণ লেখকদের

আধুনিক মতবাদ, জীবন-প্রেমের সঙ্গে দেহকামনা, অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের পুরোনো অচল মূল্যবোধগুলিকে আক্রমণ করে অনিবার্যভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে যুক্তি ও জিজ্ঞাসা মানুষের মনে জেগে উঠেছিল, তাকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল, অস্পষ্টতা ও অপটুতা থাকলেও বাঙলা দেশের 'Waste Land'-এ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বীজ বোনা হয়েছিল সেদিন। সেই জন্মলগ্নের সময় সাহিত্যে সনাতনীরা 'শনিবারের চিঠি' মারফৎ টীকা-টিপ্পনী সহযোগে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছিলেন। এ দলের নেতা ছিলেন সজনীকান্ত দাস। তিনি যখন একা পেরে উঠলেন না তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে সালিশ মানলেন। আধুনিক সাহিত্যের গতি ও রীতি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রাভবনে' এক সভা আহ্বান করলেন। দু'দিন সভা হয়েছিল (৬ঠা ও ৭ই চৈত্র, ১৩৩৪)। প্রথম দিন 'চিঠি'র দল উপস্থিত ছিলেন না। দ্বিতীয় দিনে এদলের যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন সজনীকান্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, নীরদ চৌধুরী, রবীন্দ্র মৈত্র, মোহিতলাল এবং আরো অনেকে। আর এক দলে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, দীনেশরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি। কথা-কাটাকাটি আর হট্টগোল বেশ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের চিরন্তন সত্য নিয়ে ভাষণ দিলেন। সেটি 'সাহিত্য ধর্ম' নামে ছাপা হল 'প্রবাসী'তে। শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র এর প্রতিবাদে প্রবন্ধ লিখলেন। আধুনিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাদের উৎসাহ দিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে তিনি চিঠিতে লিখলেন, 'আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে।...যেসব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো।' 'চিঠি'র দল গেলেন রেগে—তাঁরা ভাবলেন কবিগুরুর উৎসাহেই তরুণেরা পরিপুষ্ট হচ্ছে। অতএব এখন থেকে আধুনিক তরুণদের সঙ্গে তাঁরও লাঞ্ছনা শুরু হয়ে গেল। মতের একটা প্রতিপক্ষ মত থাকবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে নবীন-প্রবীণ সমস্ত সাহিত্যিককে 'চিঠি' অস্বীকার করে। তাঁদের রচনাকে উপলক্ষ করে ব্যক্তিগত জীবনের উপর কুৎসা আরোপ, শালীনতাহীন রসিকতা ও অশ্লীলচিত্র সহযোগে এক বিশ্রী ব্যাপারকে কোনক্রমে সমর্থন করা যায় না। প্রথমে 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্রনাথকে

সামনে রেখে বরং তাঁকেই সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনে করে তীক্ষ্ণবাণ ছুঁড়ছিলেন, তখন তরুণের দল রবীন্দ্রনাথকেও আক্রমণ করতে কসুর করেন নি, এঁদের হাতেও রবীন্দ্রনাথ লাঞ্ছিত হয়েছেন। পরে যখন রবীন্দ্রনাথ তরুণদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে মুগ্ধ হয়ে আধুনিক সাহিত্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করে নজরুলকে 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করলেন, অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসের, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির রচনাবলীর প্রশংসা করলেন, তখন 'চিঠি' শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভদ্রতা সব কিছুই বিসর্জন দিল। 'শনিবারের চিঠি'কে প্রতিরোধ করার জন্যে তরুণেরা 'রবিবারের লাঠি' বের করলেন।

রবীন্দ্রনাথের অকাতরে প্রশংসা বিতরণকে মোহিতলাল কটাক্ষ করেছেন। যার প্রশংসা করতে পারি না তার নিন্দা কেন করব—এই নীতিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ অক্ষম সাহিত্যিকদেরও দু'ছত্র বাণী দিয়েছেন। তাই মোহিতলাল বলেছেন—

> তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
> নিরুদ্দেশ, দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
> করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক!—
> কে শোনে তাদের গান?—মাছিদের কল্লোলে হারায়!
> এমনি দুর্ভাগ্য দেশ!—তুমি রবি, তবুও হা ধিক!
> তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায়!
>
> —রবির প্রতি: হেমন্ত গোধূলি

১৯৩১-এ 'শনিচক্রে'র পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় হয় এবং ১৩৩৪-এর গোড়ার দিকে তিনি শনিচক্রের দলপতি হয়ে ওঠেন। 'কল্লোল' প্রমুখ কাগজের রচনাদির ওপর 'চিঠি' মন্তব্য করতেন, অশ্লীল বলে চিহ্নিত করতেন কিন্তু মোহিতলালের সঙ্গে 'শনিচক্রে'র পরিচয় ছিল বলে তাঁর কবিতার কোন বিরূপতা তাঁরা করেন নি। ১৩৩৪, ভাদ্র মাস থেকে 'চিঠি' সাপ্তাহিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়। পাকাপোক্ত-ভাবে মোহিতলাল তখন 'শনি-চক্রে'র পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন আধুনিক দলের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। 'চিঠি' মারফৎ তাদের রচনার তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁর আগে 'চিঠি'র সাহিত্যমান কিছুই বড় একটা ছিল না। মোহিতলালের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় 'চিঠি'

জীবন ও জগৎকে দেখবার ছেলেমানুষি দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ ত্যাগ করে চিন্তাপ্রবণ প্রবীণের একটি বিশিষ্ট আদর্শ ও নীতিকে অনুসরণ করে বিদ্বজ্জনসমাজে এক বিশেষ মর্যাদা পায়। বিদ্বৎসমাজে কাগজটিকে জনপ্রিয় করার জন্যে মোহিতলালকে কিরূপ অকল্পনীয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং কঠোর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেকথা তিনি নিজেই বলেছেন, "ঐ সাপ্তাহিক 'অভিযান' ক্রমে অনিয়মিত ও হীনবীর্য হইয়া পড়িল।·· তখন পত্রিকাখানিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং উহার আদি প্রবর্তনাকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়াই সাহিত্যের গুরুতর দিকটিকে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া এক অভিনব উদ্দেশ্যমূলক পত্রিকার পত্তন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অশোকবাবু উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। সেজন্য একটি সভারও অধিবেশন হইল, এবং আমি মুখ্যতঃ সেই আদর্শ রক্ষার ভার লইতে প্রতিশ্রুতি দিলে অর্থাৎ আমি ঐ পত্রিকার সাহিত্যিক কর্ণধার হইতে স্বীকৃত হইলে, অতঃপর 'শনিবারের চিঠি'র নবজন্ম ও নব-কলেবর বিধান হইল—'চিঠি' মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হইল। শ্রীমান সজনীকান্তই উহার সারথিরূপে উহাকে সচল রাখিবার যে প্রায় একক চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও যেমন সত্য, তেমনই আমিই উহার রথীরূপে সেকালের সেই কুরুক্ষেত্রে ভীমার্জুন ভীষ্ম কর্ণের সহিত সম্মুখরণে উহাকে অটল রাখিয়াছিলাম। বাস্তবের দিকটির ভার ছিল সজনীকান্তের উপরে, কিন্তু উহার আদর্শরক্ষা করিয়াছিলাম আমি,·· 'শনিবারের চিঠি'র যে অংশের ভার সজনীকান্ত লইয়াছিলেন, সেই বিদ্রূপ ও খোলাখুলি আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অর্থাৎ অতিশয় অসামাজিক ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ব্যঙ্গবিদ্রূপের ফলে, সে সময়ে সারা বাংলার সাহিত্যিক সমাজ—শুধুই তরুণের দল নয়—তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া, আহত বৃদ্ধের দলও 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। শেষে এমন হইল যে, ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে 'শনিবারের চিঠি'র নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। 'শনিবারের চিঠি'র জীবনে এই কালটা সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ,···এইকালে আমি খাঁটি সাহিত্যের আদর্শ ও নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ অবারিত লেখনী চালনা করিয়াছিলাম তাহার প্রমাণ সেই কালের 'শনিবারের চিঠি'র সর্বাঙ্গে পাওয়া যাইবে।···'শনিবারের চিঠি'র যাহা কিছু মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তাহা একমাত্র আমিই রক্ষা করিতেছিলাম।" (আমি ও শনিবারের চিঠি)। সজনীকান্তও তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র দ্বিতীয় খণ্ডে একথা সমর্থন করেছেন, "কলহ

কচকচির মধ্যে একা মোহিতলাল বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ ও আলোচনা দিয়া শনিবারের চিঠির ওজন ঠিক রাখিয়া চলিলেন।" তবু 'চিঠি'তে দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী ও নেতাদের নিয়ে অশিষ্ট ও অশ্লীল ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে। মোহিতলালই স্বয়ং এই আবর্তে মাঝে মাঝে পড়েছেন এবং 'চিঠি'র অশ্লীল মন্তব্য ও চিত্রাদির জন্য মোহিতলালের সম্মানও ক্ষুণ্ণ হত। অথচ 'চিঠি'র এই বেয়াদপি রোধ করার কোন ক্ষমতা তাঁর ছিল না—এ সম্পর্কে তিনি ছিলেন একান্ত অসহায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "··· এমন অনেক অকারণ ও অন্যায় আক্রমণ থাকিত যাহা সমর্থন না করিলেও সহ্য করিতেই হইত, কারণ সর্ববিষয়ে কঠিনতা অবলম্বন করিলে—আর একটা যে শক্তিকেও বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেই শক্তি স্ফূর্তির অভাবে হতোদ্যম হইয়া পড়ে, একটা দিকে স্বাধীনতা না দিলে আমার কার্যও উপযুক্ত উৎসাহলাভে বঞ্চিত হইতে পারে। তাছাড়া, 'শনিবারের চিঠি'র যে আদি প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছি তাহার সেই নিজস্ব ধর্ম একেবারে ত্যাগ করিবার কথাও ছিল না, সেই আদি প্রেরণা আমার নয়, আমি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবার অধিকারী নই—যখন তাহার কর্ণধার হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম—তখন তেমন কোন সর্ত উত্থাপন করিলে ঐ পত্রিকার সহিত আমার সম্বন্ধই ঘটিত না। অতএব, 'চিঠি'র ঐ দিকটার সঙ্গে একটা রফা পূর্ব হইতেই ছিল—ঐ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শক্তি এবং তাহার প্রয়োজনও আমি পুরা স্বীকার করি তবে তাহার মাত্রা-নির্দেশ করিবার শক্তি আমার ছিল না, ইচ্ছা থাকিলেও আমি তাহা পারিতাম না। ধর্মনীতির ও কার্যনীতির মধ্যে এই যে আপোষ ইহা আমি সজ্ঞানেই করিয়াছিলাম, ইহার জন্য আমাকে অনেক অভিযোগ এমনকি দুর্নামও সহ্য করিতে হইয়াছে।" —আমি ও শনিবারের চিঠি।

উত্তর-তিরিশ যুগের উঠতি সাহিত্যিকদের দল রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নতুন পথে চলতে চেয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যদি আধুনিক কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে হয় তাহলে পথ ও মতের অভিনবত্ব অনুসন্ধান করতে হবে নইলে বাঁধা পথের অনুবৃত্তি করে লাভ কী! তাঁদের 'সাধু জিদ'কে অনেকেই কদর্থে ব্যবহার করেছেন। সে-সময় ভালো-মন্দ মিলে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার হাওয়া বয়েছিল; যদিও সে-হাওয়া ঘূর্ণী হাওয়া ছিল তবুও তারই মধ্যে চিন্তাপদ্ধতি ও ভাবন-প্রযুক্তির দিক দিয়ে কিছু এমন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যার দ্বারা সাহিত্যের নিজস্ব এলাকা সূচিত করা

যায়। কিছু দিনের পর সে-হাওয়া থিতিয়ে গেল, প্রত্যেকে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন—রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করে কল্লোলীয় সাহিত্যিকরা নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্বাদ দিয়ে গেলেন। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-দলীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অন্যপথে চলতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিরুদ্ধবাদী দল তাঁদের চেয়ে আরো এক কাঠি সরেস ছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে অশ্লীল ও বাঁকা মন্তব্যসহ কার্টুন অঙ্কিত করে কল্পনাতীত লাঞ্ছনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতে তৎকালীন হাওয়া হয়ত মোহিতলালকে পরোক্ষে সাহায্য করেছে কিন্তু একথা স্বীকার্য বাতাসে ভাসবার মত হালকা কবি তিনি ছিলেন না। কবি রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই তাঁর ভক্তিভাজন ছিলেন। যখন রবীন্দ্রনাথ বাণীর সেবক তখনই কবি তাঁকে পূজার অর্ঘ্য দেন—যেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কর্ণধার বা ধর্মপ্রবক্তার আসন গ্রহণ করেন, সেখানে মোহিতলাল আর পাঁচজনের মতই তাঁর সকল উক্তি ও আচরণকে বিচার করে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। যারা একটা রবীন্দ্র-cult গড়ে তুলে তার পাণ্ডা-পূজারী সেজে কবির প্রাপ্য পূজা নিজেরাই আত্মসাৎ করতে চায় তাদের মোহিতলাল দু'চোখে দেখতে পারেন নি।—

তাই আমি কাব্যগীতিমুখরিত তব পূজা-উৎসবের দিনে,
লুপ্ত করি' আপনারে, একান্ত নিঃসঙ্গ হেন জনতাবিপিনে,
বসেছিনু বাক্যহারা, গণি নাই মান নাই কিবা প্রয়োজন
খুলি' দিতে কণ্ঠ মোর সে-সভায়, মুক্ত যবে নয়ন-শ্রবণ !
কত ভক্ত নিবেদিল পুজাঞ্জলি থরে থরে চরণে তোমার,
মন্ত্র পড়ি পুরোহিত সমর্পিল অনবদ্য নৈবেদ্যসম্ভার !
হেরি' মোর মূঢ় দৃষ্টি, রিক্ত হস্ত, নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভ বদন,
ডাকে নাই কেহ মোরে—ধন্যবাদ ! সে যে হ'ত বড় অশোভন !

—রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে : ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকৃত সমালোচনা বাঙলা দেশে খুব কম হয়েছে। যা সমালোচনা বেরিয়েছে তার অধিকাংশই রবীন্দ্র-প্রশস্তি, 'ওঁ রবীন্দ্রায় নমঃ' দিয়েই সারা হয়েছে। মোহিতলাল রবীন্দ্র-সমালোচনা যে-খাতে বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে অস্বীকার করি না, কিন্তু সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার তারিফ না করে পারা

যায় না। কারণ যেখানে আলোচনা করার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি মহামানব মহাপুরুষ' হিসেবে কল্পনা করে নিয়েই কথা আরম্ভ করা হয় সেখানে প্রকৃত সমালোচনা হয় কি? ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশের ঐতিহ্য ও সাহিত্য নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি সংকীর্ণ অর্থে nationalist হয়ে পড়েছেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখী মননধারার মধ্য থেকে বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথকে আলাদাভাবে পূজো দেবার পক্ষপাতী তিনি। 'কবি-বরণ' কবিতার মধ্যেই তাঁর এই মনোভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি পাওয়া যায়—

হে বরেণ্য বঙ্গ-কবি, জাতি-দেশ-ভাষার দিশারী!
আজ তুমি বিশ্বকবি—সেই গর্ব জানি অকারণ,
যা' দিয়েছ বিশ্বে তুমি, আমি তার নহি যে ভিখারী।
নিখিলের নীলাকাশে আছে শুধু মহা মরুপথ,
নাই সেথা স্নেহ-শ্যাম ছায়া-তরু, নীড়ের জগৎ।
রচিয়াছ যেই নীড় স্বর্ণ'বড় হর্ষে শিহরিয়া,
ভুঞ্জিয়াছি শুধু মোরা যে নবান্ন অমৃত-সমান,
যে আনন্দ-অধিকারে বিদেশীর বৃথা অভিমান—
তারি গর্বে সমর্পিনু এই অর্ঘ্য অঞ্জলি ভরিয়া।

—স্মর-গরল

এজন্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্যক্‌ মূল্যায়ন-বিচার-ধারায় স্বাভাবিক কারণেই ত্রুটি রয়েছে। 'রবি-প্রদক্ষিণ' 'সঞ্চয়িতা'র ভাষ্যরচনা, কবির প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় বহন করে এবং এ অনুরাগ কবির প্রতি পাঁচজনের মত অন্ধ অনুরাগ নয়। 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য' গ্রন্থের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় 'কবিগুরুর এক প্রাচীন শিষ্য ও মুক্ত-সঙ্গ ভক্ত' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কবির মৃত্যুর পর তিনি 'তর্পণ' নামে এক অপূর্ব শোকগাথা রচনা করেন। সেই কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

মরিতে চাহি না আমি এই চিরসুন্দর ভুবনে—
প্রাণের কামনা সেই নিবেদিলে কবে না সে জানি!
তার পর ফুরাল না সেই গান সারাটি জীবনে,
মৃত্যুও মধুর হেসে বার বার গেল হার মানি।
সেই এক মন্ত্রে তুমি জীয়াইলে বাঙালার বাণী—
ভুবন সুন্দর, তাই সুদুর্লভ মানব-জীবন;

আকাশে তারায়-ভরা নিশীথের নীল ফুলবন,
তারো চেয়ে ভাল লাগে পৃথিবীর পান্থশালাখানি !
... ...
তবু যে হয়নি ব্যর্থ সেই তব কামনা প্রাণের —
চেয়েছিলে তুমি, কবি, 'মানবের মাঝে বাঁচিবারে' ;
এতদিন বুঝি নাই, আজ বুঝি মর্ম সে গানের,
শত-শিখা হয়ে সেই প্রাণ জ্বলে শত দীপাধারে !
গান হয়ে গুঞ্জরিছে অশ্রু আর হাসির মাঝারে,
মুকুলে মুঞ্জরি' ওঠে অলক্ষিতে শতেক শাখায়,
শতেক নয়নে সে যে স্বপনের কুহক মাখায়,
বাণী হয়ে ফিরিছে সে হৃদয়ের দুয়ারে দুয়ারে !

—শনিবারের চিঠি : আশ্বিন ১৩৩৮

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার হাওয়া বয়েছে ; তাঁর কাব্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা নেই, একথাও আধুনিকপুরুষরা সগর্বে ঘোষণা করেছেন। কল্লোল-কালিকলম যুগে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার প্রতিবাদে মোহিতলাল সেদিন শনিবারের চিঠির ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সত্যবাদ ও রবীন্দ্র বিদ্রোহ' প্রবন্ধে যা বলেছিলেন সেটি আধুনিক পুরুষদের আস্ফালনের বিরুদ্ধে মুখের মত জবাব বলে বিবেচিত হতে পারে ! "রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইয়াছে বা হইবে ইহা লইয়া এত আক্রোশ বা আস্ফালনের ঘটা কেন ? ঢাক বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথকে দুয়ো দিবার এই প্রবৃত্তি কেন ? প্রথমতঃ, কোনো যুগ শেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ একটি নূতন যুগের আবির্ভাব নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইলেই কি রবীন্দ্রনাথের আসন ভাঙিয়া পড়িবে ? তাঁহার প্রতিভার সেই অভ্রভেদী চূড়া পূর্ব ও পশ্চিম তোয়-নিধি পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের মানদণ্ডস্বরূপ বিরাজ করিবে না ?" এরপরও কি মোহিতলালকে 'রবীন্দ্র-বিদ্বেষী' বলে প্রচার করা হবে ? মোহিত-রবীন্দ্র সম্পর্কে আমার শেষকথা হচ্ছে যে মোহিতলাল নিজের বুদ্ধি-শিক্ষা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলেন—অপরের মুখে ঝাল খেয়ে ঝোলের স্বাদ নেন নি।

কবি-জীবন ক্ষুণ্ণ করে 'শনিবারের চিঠি'তেই তিনি প্রধানভাবে সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কবি হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ

করলেও সমালোচক হিসেবেই তিনি উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আন্দোলন ও গতি-পরিবর্তন, প্রধান সাহিত্যসাধকদের সাহিত্যকীর্তির পরিচয়-সম্বলিত প্রবন্ধ, প্রসঙ্গ কথা স্বনামে, বেনামে নামহীনভাবে অবিরত চিঠিতে লিখতে লাগলেন। ফলে তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে এমন জড়িত হয়ে পড়েছিলেন যে সাধারণ পাঠক মোহিতলাল বলতে 'শনিবারের চিঠি' এবং 'শনিবারের চিঠি' বলতে তাঁকেই বোঝাত। আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য-কথা' 'সাহিত্য বিতান' 'বাংলা কবিতার ছন্দ', 'রবি প্রদক্ষিণ' 'বাংলার নবযুগ' প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা-পদ্ধতিকে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। তাঁর পূর্বে সমালোচনা বলতে তেমন কিছু ছিল না—পিঠ থাক বা না থাক পিঠ থাবড়িয়ে দেয়াটাই চলন ছিল, আজও অবশ্য তা আছে। তিনি তৎকালীন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অবস্থা 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের' মুখবন্ধে' বর্ণনা করেছেন, "বাংলা ভাষায় আধুনিক সাহিত্য যেটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সম্বন্ধেই আধুনিক রীতি-সম্মত কোন সমালোচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এককালে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বসাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য উভয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনা ছিল, কিন্তু সেগুলির মধ্যেও ব্যস্ততার লক্ষণ আছে, এবং আলোচনার প্রণালীও সুষ্ঠু নহে। তথাপি তাহাতে আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার একটা ভিত্তি-স্থাপনা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর বিশেষ কিছু হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা সাহিত্য অথবা বাংলা সাহিত্যের আলোচনা নয়—রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা শরৎ-প্রশস্তির কলোচ্ছ্বাস।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব তিনি অনুভব করেন। বাংলা বইয়ের অভাবে তাঁর নিজের কষ্ট হলেও ছাত্রদের খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা 'সাহিত্য-কথা'র মুখবন্ধে লিখেছেন, "ইংরাজীর মত উৎকৃষ্ট সমালোচনাগ্রন্থ এবং সাহিত্যের নানাবিধ ইতিহাস যতদিন সুলভ না হইতেছে, ততদিন ছাত্রগণকে ঐরূপ পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া তোলা দুষ্কর। এ অভাব দূর করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রির ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না।—তৎপূর্বে এইরূপ পঠন-পাঠনের

ব্যবস্থা এবং আবশ্যকীয় গ্রন্থ-প্রণয়নে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতে হইবে। ...বাংলা ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্য-বিচারের মূলসূত্র বুঝিয়া লইবার জন্য ছাত্রগণকে প্রচুর পরিমাণে ইংরাজীর সাহায্য লইতে হয়।" ফলে মোহিতলাল কবিতার রাজপথ ত্যাগ করে সমালোচনার দুরূহ দুর্গম পথে একক যাত্রা শুরু করেন। সাহিত্যের শুচিতা ও আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে সমালোচনার যে 'স্কুল' তিনি স্থাপন করেন সেখানে একাই 'গাণ্ডীবীরূপে খাণ্ডব দাহনে' তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই সাহিত্য-সাধনার রম্যকানন তাঁর কাছে বিপদসঙ্কুল সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই একাকিত্বের দরুন তাঁর প্রাণশক্তির ক্ষয় হয়েছিল প্রচুর।

পাঁচ

১৩৩৫ সালে (১৯২৮ জুলাই) তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক (লেকচারার) নিযুক্ত হন। তখন বাংলা বলে পৃথক কোন বিভাগ ছিল না। বাংলা বিষয়ে এম. এ. পড়তে হলে বাংলা ও সংস্কৃত উভয় বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হত। ১৯৩৭ সালে বাংলা ও সংস্কৃত দুটি পৃথক বিভাগ হয়। মোহিতলাল তখন বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ড. সুশীলকুমার দে এই ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯১২-১৩ সালে লেখার সূত্র ধরে ডক্টর দে'র সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় হয়। 'বীরভূমি' পত্রিকায় এঁরা দু'জনেই তখন লিখতেন। মোহিতলালের কিছু কবিতা তখন এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।—

অগ্রহায়ণ ১৩১৭ —পদ্ম-ফোটা (প্রভাতের পদ্মটিরে হেরিনু সরসী নীরে)
পৌষ ১৩১৭—মানসিক (সারা দিনমান পল্লীর পথে বিজনে)
মাঘ ১৩১৭—প্রসাদ (অজানা দেশের অজানা অতিথি মন্দির মোর ঘর)
বৈশাখ ১৩১৮—থিওক্রিটাসের অনুকরণে (ডক্টর হিউগো)
(নদীর তীরে কাশের বনে একলা ছিল বসে)
শ্রাবণ ১৩১৮—শ্রাবণে (গগন আঁধার, ঝরে বারিধার জনহীন যমুনায়)
ভাদ্র ১৩১৮—শেষ গান (ফুলগুলি সব ফুটে' ফুটে' গেল কানন গহন তলে)
আশ্বিন ১৩১৮—মালা গাঁথা (সাজিটি ভরিয়া প্রভাতের বেলা পুণ্য-সিনান শেষে)

পরে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের আবাসস্থলে প্রায়ই দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ হত। মোহিতলাল যখন আমহার্স্ট স্ট্রীটে এলেন তখন সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। 'স্মর-গরল' কাব্য মোহিতলাল বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে উৎসর্গ করেন।

ঢাকা থাকাকালীন তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৩৪৩), 'সাহিত্য-কথা', 'বিচিত্র কথা', 'বিবিধ কথা' এবং তৃতীয় কাব্য 'স্মর-গরল' (১৩৪৩) প্রকাশিত হয়। 'স্মর গরলে' মোহিতলাল সংস্কার-ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন—আধুনিকতাব প্রতি তাঁর অনুবাগ কমে যায়। কারণ হল, মোহিতলাল উনবিংশ শতাব্দীর জীবনদর্শন নিয়ে তগন পুরোদস্তর আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছেন—প্রাচীন-সাহিত্য তাঁকে যত আকৃষ্ট করেছে আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তত বিচ্ছিন্ন হয়ে পডেছে। প্রকৃতপক্ষে 'স্মর গরলে'র পর আব আগের মত নিয়মিত ক'বিতা লিখতেন না—মাঝে মাঝে লিখতেন। 'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশিত হবাব (১৩৪৮ শ্রাবণ) পর কবিতা লেখা তিনি একেবারে ছেড়ে দিযেছিলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, রসের উৎস শুকিয়ে গেছে, লেখার প্রেরণা পান না। জোর করে লিখতে গেলে তা হবে অপকৃষ্ট পদ্য নযত পূর্ব রচনাব পুনরাবৃত্তি। কবির আত্মহত্যা হয় তখনই, যখন তিনি নিজেকে নিজে অনুকরণ করতে শুরু করেন। অতএব সময় থাকতেই থেমে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমাদের দেশের লেখকরা থামতে জানেন না, প্রথম খ্যাতির অক্ষম জের টেনে চলেন তাঁব'। শেষ উল্লেখযোগ্য নাট্য-কবিতা 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' প্রকাশিত হযেছে ১৩৬০ এর 'মাসিক বসুমতী'ব ফাল্গুন সংখ্যায়। কবিদের সম্পর্কে মোহিতলালের আরও একটি নিজস্ব মত ছিল যে, প্রত্যেক কবির কানে বিধাতাপুরুষ একটি মন্ত্র দিয়েছেন এবং সেই মন্ত্রটিকে বিকশিত করাই কবির কাজ। তা না করে কেঁউ য'দি পরানুকরণ করে জন্মগত অবিকার ত্যাগ করে তাহলে তার স্বধর্মচ্যুতিকে তিনি নিন্দা করেছেন। এজন্যে শরৎচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের লেখাগুলিব তিনি প্রশংসা করেন নি। কবিতার যে অনবদ্য ভঙ্গী তিনি আয়ত্ত করেছিলেন সেটি পরে কিছু সনেট রচনার কাজে লাগিয়েছেন আর লাগিয়েছেন বিদেশী কবিতাব অনুবাদ করে। তাঁর সনেটগুচ্ছ 'ছন্দ-চতুর্দশী' আশ্বিন ১৩৫৮-এ বেরোয় এবং তাঁর অনুবাদ কবিতার সংকলন 'বিদেশী কাব্যসঞ্চয়ন' এখনও প্রকাশকেব দেরাজে অপেক্ষা করছে।

অধ্যাপনাকে তিনি সাহিত্যসেবার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন বলে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রমহলে আদর্শ অধ্যাপকরূপে সমাদৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রি' থাকলেই অধ্যাপক হওয়া যায় না, অধ্যাপনা করতে হলে জ্ঞান থাকা চাই, সবচেয়ে বড় যে সাহিত্যপ্রেম সেই প্রেমের প্রে'মক হওয়া চাই। মোহিতলাল একাধারে সবকিছু ছিলেন,—সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিক। তি'ন অধ্যাপকদের হালচাল লক্ষ্য করেছেন, বাইরে ভড়ংটাই রয়েছে, ভেতরটা ফাঁপা। অধ্যাপকদের জ্ঞানাভাবের চেয়েও বড় কথা হল পাঠপদ্ধতির গলদ। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকালের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ করে শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কার্যকাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা দেখেছেন। ধাপে ধাপে আধুনিক কালে শিক্ষার যে অবনতি ঘটেছে তার সমস্ত ইতিহাসটা তাঁর চোখের সামনে ভাসত। বিশ্ববিদ্যালয় আজ একটি ডিগ্রি বিতরণের কারখানায় পরিণত হয়েছে। কেবলমাত্র ডিগ্রির জন্যই পরীক্ষা এবং সেই পরীক্ষার জন্যই কলেজে নাম লেখানো—এ ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন কেউই শিক্ষিত হতে পারবে না। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক—দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই অধঃপতন এবং তার ফলে শিক্ষার এই প্রহসন তাঁকে মর্মান্তিক আঘাত করত। সেইজন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনাচার ও কদাচারের তিনি নির্মম সমালোচনা না করে থাকতে পারতেন না। বিরোধীপক্ষ মনে করত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী না পাওয়া এর হেতু। তিনি পঠনপদ্ধতির গলদ সম্পর্কে লিখে গেছেন, "সংস্কৃত ও বাংলা উভয় সাহিত্যের সহিত ভালরূপ পরিচয়, এবং সেই সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, তেমনই বাংলা সাহিত্যের সেইরূপ আলোচনা করিতে হইলে আর একটি দুর্লভ গুণ থাকা দরকার—আমি ইহাকে সাহিত্যপ্রেম বলিব। এই প্রেম হইতেই যে অন্তর্দৃষ্টি জন্মে, যাহার বলে সাহিত্যের মর্মস্থলটি আবিষ্কার করা যায়, নতুবা কেবল পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইবে না। বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপনা-কার্যে এইরূপ প্রতিভার প্রয়োজন আছে, কারণ ইংরাজী সাহিত্যের মতো এ সাহিত্যের অধ্যাপনায় গ্রন্থাগারের সাহায্য পাওয়া যাইবে না। এ অভাব দূর করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রির ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না—তৎপূর্বে এইরূপ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা এবং আবশ্যকীয় গ্রন্থ-প্রণয়নে উৎসাহ ও সাহায্য দান

করিতে হইবে। বাংলায় এম এ. হইলেই—সে যত উচ্চশ্রেণীর হউক—অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ত হইবে, এখনও অপরাপর ডিগ্রির মত বাংলার ডিগ্রির সেই মূল্য হয় নাই, এখনও ডিগ্রিধারীর পরিবর্তে বিশেষজ্ঞের দ্বারাই অধ্যাপনাকার্য চালাইতে হইবে—এ বিষয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।" —মুখবন্ধ : সাহিত্য-কথা।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে সকলেরই কবিতা থাকে। কিন্তু মোহিতলালের কবিতা থাকে না। বালক-বালিকাদের উপযোগী তাঁব কতকগুলো কবিতা আছে (কিশোর কাব্য-সংকলন—'রূপকথা') কিন্তু সেগুলি বহুল প্রচারিত নয়। তাছাড়া স্কুলের শিক্ষকদেব বিদ্যেবুদ্ধির বহর তাঁর জানা ছিল। কারণ যেখানে টিউশানি প্রধান লক্ষ্যবস্তু সেখানে পড়াশুনা করার অবসর অত্যন্ত কম। এঁরা বাংলা সাহিত্যের কোন সংবাদ রাখার প্রয়োজনবোধ করেন না, নোট বইয়ের বাইবে যান না, স্কুলেব চার দেয়ালেব বাইরে যে জীবন রয়েছে সেই জীবনের সন্ধান তাঁরা কেউই করেন না, অবস্থা অনেকেম সচ্ছল থাকলেও নয়। দোষটা একতরফা তাঁদেরও নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রেব অসম ব্যবস্থায় শিক্ষককে জীবনসংগ্রামে এত সময় ব্যয় কবতে হয় যে চচাব একটু নিরিবিলি অবসর তাঁরা পান না।

শিক্ষকদের হাতে ছাত্রবা মোহিতলালের কবিতার রস গ্রহণ করতে পারবে না—এই ছিল তাঁর নিজস্ব ধারণা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বি এ. অর্নাসের পাঠ্যতালিকায় একবার 'স্মর-গরল' কাব্যকে পাঠ্য কবেছিলেন। 'স্মর-গরল' কাব্য মোহিতলালের সবচেয়ে কঠিন কাব্য, রসগ্রহণ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ। তিনি যে দেহবাদ নিয়ে কবিতা লিখেছেন তার খোলাখুলি আলোচনা ছাত্রছাত্রী মহলে করা যায় না। প্রত্যেক কলেজে তাঁর কাব্য কীভাবে পড়ানো হচ্ছে তার খোঁজ তিনি রাখতেন। অনেক অধ্যাপকের গভীর ও বিস্তৃত পড়াশুনা না থাকায় তাঁদের ব্যাখ্যায় তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। 'স্মর-গরল'এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এ সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন, "ইহাতে (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্য করার জন্য) আমি যেমন ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত বোধ করিতেছি, তেমনই একটু শঙ্কিতও হইয়াছি, কারণ ছাত্র ও অধ্যাপকের সঙ্গে এবার আমার কবিতাও পরীক্ষার্থিনী হইল। এইরূপ 'বলাদকৃষ্যমাণা' হইয়া তিনি যে কিরূপ মুখভঙ্গি করিবেন, তাহাই ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছি।" (চৈত্র ১৩৫৪)। এজন্যে ভূমিকার মধ্যেই

কবিতার মর্মকথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য শ্রীতারাচরণ বসু তাঁর কবিতার রস উপলব্ধি যথাযথভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি একটি ব্যাখ্যা-পুস্তক ('মোহিতলালের স্মর-গরল', প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৩৫৫) লেখেন। এ বইটি মোহিতলাল নিজে দেখে শুনে দিয়েছিলেন।

বাঙলা দেশের শিক্ষক ও অধ্যাপক-সমাজের বিদ্যাজনিত অভাব লক্ষ্য করেই তিনি স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে 'কাব্য-মঞ্জুষা' নামে একটি অভিনব কবিতাসংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের ওপর নির্ভর না করে তিনি নিজেই কবিতার রসগ্রহণের কুঞ্চিকা, ছন্দ ও শব্দার্থ পরিশিষ্টরূপে যোগ করেছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি' মন্তব্য করেছেন, "শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার-সঙ্কলিত এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'কাব্য-মঞ্জুষা' গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সঙ্কলিত হইলেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঠিক এই ধরনের সঙ্কলন ইতিপূর্বে আর একটিও হয় নাই। একজন প্রথম শ্রেণীর কবির মন এই সঙ্কলনের পশ্চাতে কাজ করিয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে আমরা বাংলা কাব্য-সাহিত্যধারার ক্রমবিকাশের একটি সুষ্ঠু পরিচয় পাই। কিন্তু এই পুস্তকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইহার 'উন্মোচনী' অংশ। ইহাতে কবিতার কথা, বাংলা কবিতার ছন্দ ও কবিতাপাঠ বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত সেভাবে আলোচনা কেহ করেন নাই। প্রত্যেকটি কবিতার টীকা ও কবির পরিচয়-অংশেও বহু নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। প্যালগ্রেভ সাহেব যে পরিশ্রম স্বীকার ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের বিখ্যাত কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও অনুরূপ শ্রম ও সাহিত্য-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই বাংলা 'কাব্য-মঞ্জুষা'টি খাড়া করিয়াছেন। বাংলা দেশের ভাবীকালের বালক-বালিকাদের কাছে শুধু এই কাজের জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এই কাব্যগ্রন্থখানি হাতে লইয়া আমরা এই দুঃখই বোধ করিলাম যে, আমাদের বাল্যে ও কৈশোরে এই জাতীয় পুস্তক আমরা পাই নাই।" (আশ্বিন ১৩৪৯) শেষ জীবনে মাতৃভাষা-শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি 'বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন (১৯৫১)। ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াসের ও শিক্ষার্থীদের জন্যে একটি মমতাকাতর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যাপনাকে পেশা বললে সাধারণ অর্থে টাকার বিনিময়ে যে দায়সারা কাজ বোঝায় সে রকম অধ্যাপনা মোহিতলালের ছিল না। অধ্যাপনাকে তিনি মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙলার অধঃপতনের জন্য তিনি যখন উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন সেই সময় তিনি কোন একজনকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি যদি আর সব ছেড়ে দিয়ে এখন অধ্যাপনা নিয়ে থাকতাম, তাহলে সুস্থ ও শান্ত হতে পারতাম। ওটা আমার একটা Refuge।" (অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যকে লিখিত) ছাত্রজীবনে যেমন সাহিত্যরস দুর্ভেদ্য বর্মের মত তাঁকে পারিবারিক দুঃখকষ্টকে ভুলিয়ে রাখত, উত্তরজীবনে তেমনি অধ্যাপনা ছিল তাঁর পক্ষে মুক্তির ক্ষেত্র, সমস্ত দুঃখবেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পরম আশ্রয়। এজন্যে এটা তাঁর পেশা নয়, পেশা বললে তাঁকে ছোট করা হয়, পেশারও অধিক, একটা Refuge। কাজেই যতটা খাটবার কথা তার চেয়ে বেশী খাটতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জের তাঁর বাড়ী পর্যন্ত চলত অনেক রাত অবধি। অধ্যয়নে অধ্যাপনায় তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। অধ্যাপনাকে তিনি পাণ্ডিত্যে, বৈদগ্ধ্যে, দার্শনিকতায় ও পরিবেশন-নৈপুণ্যে শিল্পকর্মে পরিণত করেছিলেন। তাঁর ঢাকার ছাত্র শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী মোহিতলালের শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট মিনিটে ঘণ্টা—প্রায় পুরো ঘণ্টাটাই তিনি পড়াতেন। আবার এমনও দিন দেখেছি, ঘণ্টা বেজে গেলেও তিনি অধ্যাপনায় বিরত হতে চাইতেন না। অধ্যাপনা যে ধ্যানকর্ম হতে পারে —অধ্যাপনাকেও যে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করা চলে, এই প্রথম গুরুদেবের কাছ থেকে উপলব্ধি করলাম।...কাব্যের মধ্যে কিংবা সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যে কবি ও সমালোচক মোহিতলালের যে একটি পৌরুষ-ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর অধ্যাপনার মধ্যেও আচার্য মোহিতলালের একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত।...অধ্যাপনা ব্যাপারে অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। বইখানি যে পাঠ্য এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন আসবে এবং সে প্রশ্নের জবাব লিখতে হবে—সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি পড়াতেন না। কবিসুলভ একটি অখণ্ড ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে তিনি গ্রন্থের মর্মলোকে প্রবেশ করতেন; সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে এবং স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টি-বীজকে আবিষ্কার করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সমালোচনাচ্ছলে তিনি তাঁর বিভিন্ন সৌন্দর্য-রসের দিকটা শতদল পদ্মের এক-একটি পাপড়ির মতো মেলে ধরতেন। বিকশিত পদ্মের ন্যায় সেই কাব্য কিংবা গ্রন্থের সৌন্দর্য বা রসরূপ আমরা

অপরোক্ষ করতাম, বাংলা সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করে আমরা ধন্য হতাম।" (আচার্য মোহিতলাল: শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫৯) সাহিত্য ও জাতির প্রতি তাঁর সীমাহীন প্রীতি অতি সহজে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে সংক্রামিত হত বলে যারা ছাত্র নয় তারাও ভিড় করত তাঁর পাঠনা শুনতে। তাঁর অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একবার সম্বর্ধনা জানান। এই সভায় মোহিতলাল সাহিত্যের স্বরূপ ও নীতি বিশ্লেষণ করে স্বরচিত 'কালাপাহাড়' কবিতা উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করত তেমনি তিনিও তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। এই সেদিন (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা সংগ্রাম করে প্রাণ দিল সেই ভাষার প্রতি প্রেম মোহিতলাল জাগ্রত করে দিয়ে এসেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী তরুণ যুবকদের ওপর তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল—মৃত্যুর আগে প্রায়ই বলতেন যে তাদের দ্বারা অনেক মহৎ কাজ হবে, বাংলা ভাষাকে তারাই প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে, বাঙালী সংস্কৃতির নতুন পর্ব ওখান থেকেই উন্মোচিত হবে। ছাত্রদের শ্রদ্ধা-ভক্তি স্মরণ করেই তিনি 'শ্রীমধুসূদন' বইখানা উৎসর্গ করেছিলেন—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের করকমলে স্নেহ-উপহার।" দীর্ঘ চৌদ্দ পনের বৎসর অধ্যাপনা করার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন (১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ: ১৯৪৪ জুন) তারপর ১৩৫৮এ বঙ্গবাসী কলেজে বাংলায় এম. এ. ক্লাশ খোলা হলে তিনি ঐ কলেজে মৃত্যুর পূর্ব পযন্ত অধ্যাপনা করেন (১৯৫২, ৫ই জুলাই তাঁর ইহজীবনের শেষ ক্লাশ)। তাঁর বক্তৃতার অপূর্ব ভঙ্গীতে সাহিত্যরস-পিপাসুদের চিত্ত সব সময়েই মোহিত হত। ছাত্রদের মনে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলা যদি শিক্ষকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে আচার্য মোহিতলালের তুলনা মেলা ভার।

ছয়

ঢাকার অধ্যাপনাজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয় নি। একজন সামান্য বি. এ. পাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় অনেকের গাত্রদাহ হয়। এই পদের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও ছিলেন। সমালোচক অপেক্ষা মোহিতলালের কবি-খ্যাতি ছিল তখন বেশী—'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক হিসেবে তাঁকে

খ্যাতি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি—কোন সমালোচনা-গ্রন্থ তাঁর তখন বেরোয় নি, সবেমাত্র তিনি 'শনিবারের চিঠি' 'নব্যভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন। ঢাকা অবস্থানকালেই তাঁর সমালোচক-সত্তার পূর্ণ বিকাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে ড সুশীলকুমার দের প্রচেষ্টাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁর চাকরী হয়, তখন ড. দে ছিলেন বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ। ড দে তাঁকে যদি না আনতেন তাহলে সমালোচক মোহিতলালের পূর্ণ বিকাশ হত কি না সন্দেহ। এজন্যে ড দেকেও কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি।

মোহিতলালকে নিয়েও কম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হয় নি। বুদ্ধদেব বসু-রচিত সবিতা দেবী নামক গল্পে এর প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। গল্পটি 'ভাসো আমার ভেলা' (সেপ্টেম্বর ১৯৬০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পের ললিতচন্দ্র চন্দ্র বাস্তবের মোহিতলাল মজুমদারের আদলেই গড়া। গল্পের প্রথমেই আছে—

"ললিতচন্দ্র চন্দ্র বিশুদ্ধ পশ্চমবঙ্গীয়। বাজেশিবপুরে জন্মগ্রহণ করে, উত্তরপাড়ার স্কুলে এবং হাওড়ার কলেজে বিদ্যাভ্যাস করে তিনি বাগবাজারের নীলশান্ত পাঠশালায় বহুভাষার শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেখানে কুড়ি বছর কাজ করার পরে তার মাইনে যখন চল্লিশ থেকে ষাটে এসে ঠেকেছে এবং উচ্চাশার শেষ সোপানে, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাষ্টারের চেয়ারটা যখন তাঁর কল্পনাকে শুড়শুড়ি দিচ্ছে, এমন সময় ভাগ্য তাঁকে নিয়ে একটু তামাশা করলো। হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারের পদ তিনি পেয়ে গেলেন। তিনি বি এ পাশ মাত্র, কিন্তু তাতে কী? তিনি কবি—এবং সমালোচক। তাঁর ভক্তসংখ্যা কম নয়, উঁচুদরের অধ্যাপকমহলেও কেউ কেউ তাঁর প্রাণের বন্ধু। কে বলে বাংলাদেশে প্রতিভার আদর নেই, কে বলে বাঙালি বন্ধুতার মূল্য দিতে জানে না।"

মোহিতলালের স্বভাবে কিছু ত্রুটি ছিল—তিনি পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও বাগ্‌ভঙ্গীর বিশ্রীভাবে সমালোচনা করতেন। ফলে ছাত্ররা মাঝে মাঝে তাঁর ওপর বিরূপ হত—মনপ্রাণ ঢেলে তিনি পড়াতেন বলে এই নিয়ে বিরূপতা প্রবলভাবে আন্দোলনের আকার ধারণ করে নি। তাঁর এই ত্রুটি 'সবিতা দেবী' গল্পে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে মোহিতলাল যেমন সামান্য কথাতে রেগে যেতেন, প্রিয়-অপ্রিয় কথা অক্লেশে বলে দিতেন, লোককে কবিতা পড়ে শোনাতেন, পেট্রার্কীয় রীতিতে কিছু সনেট লিখেছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি

ঐ গল্পে ব্যঙ্গসহকারে সুকৌশলে লেখক তুলে ধরেছেন। গল্পটির পটভূমিকায় মোহিতলালের প্রতি বিরূপতা লেখকের মনে ক্রিয়াশীল ছিল।

যদিও পূর্ববঙ্গের সমাজ ও সাংস্কৃতিক রুচি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ভাল ছিল না, বাচনভঙ্গী ও উচ্চারণদোষ তাঁকে উত্তেজিত করত তবু সেখানে যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও চর্চার আগ্রহ ছিল তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পত্র-পত্রিকা, প্রগতি লেখক-শিল্পী-সঙ্ঘের সাহিত্য-আন্দোলন এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহের খবরাখবর তিনি রাখতেন। এরকম দু' একটি সভা-সমিতিতে তিনি যোগদানও করেছেন কখনও সভাপতিরূপে, কখনও প্রধান অতিথি হিসেবে—যেমন নারায়ণগঞ্জে 'মণিমেলা'য় রবীন্দ্র-জন্মতিথি উৎসবের সভাপতি (১৩১০), নারায়ণগঞ্জ সাহিত্য-সমিতির রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের সভাপতি (১৩৪৬) প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় গ্রহণের সময় ঢাকার নাগরিকবৃন্দ মোহিতলালকে এক বিদায়-সম্বর্ধনা জানান (এপ্রিল ১৯৪৪)। এই সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ কিংবা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায় নি বরং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সমাজে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা তাঁকে কেমন ব্যথিত করে সেটিই বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববাঙলায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন তা তাঁর জীবনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে সেটি তিনি ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন। ঢাকার 'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রে তাঁর অভিভাষণটি প্রকাশিত হয়। কোন গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে মোহিতলালের যে দুর্নাম কোন কোন মহলে চালু আছে তারই প্রতিবাদস্বরূপ দুষ্প্রাপ্য পুরো ভাষণটি উদ্ধৃত করে দিলাম।—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়,

ঢাকাবাসী সুহৃদ ও সজ্জনবৃন্দ,

আজ আপনারা আমাকে বিদায় দান উপলক্ষে যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহা গ্রহণ করিতে আমার লজ্জা ও সঙ্কোচের অবধি নাই। আমি জানিতাম না, আমার এই দীর্ঘ-প্রবাসে আমি আপনাদিগের নিকটে এমন কি গুণের পরিচয় দিয়াছি যাহার জন্য আপনারা আমাকে এত শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিবেন। আপনাদের এই সুগভীর আত্মীয়তায় আমার হৃদয় অভিভূত হইতেছে। গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি এখানে প্রবাসী

ছিলাম না—এখানকার মাটি আমার জীবনের তথা হৃদয়ের তন্তুগুলিকে আলগা থাকিতে দেয় নাই—বরং চতুষ্পার্শ্ব হইতে আঁকড়িয়া ধরিয়া আপনার রসে সঞ্জীবিত ও বর্ধিত করিয়াছে—তাই আজ তাহাদের উচ্ছেদকালে বেদনায় অধীর হইতেছি। সে বেদনা এমনই যে আমার মত মর্ত্য-প্রীতি-বিহ্বল মানুষও সনিঃশ্বাসে গীতার সেই ভগবদুক্তি স্মরণ করিতেছে—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫।২২

যাহার আদি আছে তাহার অন্তও সুনিশ্চিত, সেই আদ্যন্তযুক্ত সুখের প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি আসক্ত হন না। কিন্তু উপায় কি? আপনাদের সহিত সংস্পর্শ কখনও কি এড়াইয়া চলিতে পারিতাম? তাহার যে সুখ তাহা হইতে বিমুখ হইবার শক্তি কি কখনও আমার আছে? সেই সুখের মূল্যস্বরূপ আজ এই দুঃখ বহন করিতে অনিচ্ছুক হইলে চলিবে কেন? জীবনের পান্থশালায় সুখভোগের যত ঋণ জমিয়া উঠে তাহা পরিশোধ করিতেই হইবে। আমরা তেমন জ্ঞানী নই তাই ঋণ করিয়া থাকি,—কিন্তু ঋণ শোধ করিবার জন্য প্রাণের ভিটা-মাটি বেচিবার যে নির্মম আত্মনিগ্রহ তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলে নিয়তির নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়; তাই শেষে প্রাণ দিয়াও মান রক্ষা করি। আমার আজ সেই অবস্থা; আপনাদেরও উপায় নাই—রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই পংক্তিগুলি স্মরণ করুন।—

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব-চেয়ে পুরাতন কথা, সব-চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

কেবল কবি যে বলিয়াছেন—'স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে'—এখানে একটু ভুল আছে, একথা মর্ত্যের সম্বন্ধে খাটে, স্বর্গের কথা স্বতন্ত্র, কারণ

অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে।

আমি সেই স্বর্গের কথাও জানি। এতদিন আমি যে স্থানে বাস করিয়াছি, সেই স্থানে বাস করিয়া খাঁটি দেশীয় ভদ্র-জীবন যাপন অর্থাৎ

সামাজিক ব্যবহার রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই—শহরের বাহিরে, নূতন নগরে এবং তাহারও প্রান্ত সীমায়, আমি প্রায় একক জীবন যাপন করিয়াছিলাম—তাহাতে বেশির ভাগ ছাত্রগণের সহিতই আমার নিত্যসংস্পর্শ ঘটিয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-প্রকোষ্ঠে এবং আমার নিভৃত গৃহকোণে আমি তাহাদের সহিত মিলন-সুখ ভোগ করিয়াছি। আমার সেই পল্লীর উচ্চতর সমাজে মেলামেশা করবার সুযোগ আমি স্বেচ্ছায় হারাইয়াছি—যদিও এই অতিশয় সঙ্গবিমুখ ব্যক্তিকেও শুধু নিজেদেরই সহৃদয়তার গুণে অনেকেই সঙ্গদানে অনুগৃহীত করিয়াছেন। সেই সমাজেও আমি যে কয়েকটি হৃদয়বান পুরুষের সান্নিধ্য ও স্নেহ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছি, তাহাও আমার গুণে নয়—এই অধমের প্রতি তাঁহারা যে কি কারণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন - মনে হয় অতিরিক্ত উদারতার মোহে তাঁহারাই ভুল করিয়াছিলেন- সে ভুল যে ভাঙ্গে নাই তাহা আমারই সৌভাগ্য। সেই সুখও শেষ পর্যন্ত ভোগ করিতে পারি নাই—কারণ ভাগ্যবিধাতার অমোঘ বিধানে আমি বহুপূর্বেই উদ্বাস্তু হইয়াছি।

তথাপি একটা কথা আমার নিজেরই স্বীকার করা উচিত, আমি যে-সমাজে সাক্ষাৎভাবে বাস করিয়াছিলাম সে সমাজের উপযুক্ত আমি কখনই নই, অতএব সে সমাজের সামাজিকতা আমার পক্ষে অদৃষ্টের একটা পরিহাসই বটে। আপনারা জানেন আমি আসিয়াছিলাম যে চাকুরীস্থানে তাহাকেই বাসস্থান করিয়াছিলাম— চাকুরীস্থানে আমার যে পদ লাভ হইয়াছিল তাহাতে সে-সমাজে কৌলীন্য দাবী করা যায় না; অথচ আমার স্পর্ধা আমার কৌপীনকে ছাড়াইয়া যায়—কিছুতেই তাহাকে শাসনে রাখিতে পারি নাই। এই অতিশয় দুর্বিনীত স্বভাবের জন্যই আমি সমাজ-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম—সে দোষ যে আমারই, তাহা স্বীকার করি। তার উপর আমার মত একরূপ অতিশয় অবিদ্বান্ ব্যক্তির কথাবার্তায় এমন একটা অশিষ্টভঙ্গি ছিল যে কোন বিদ্বৎসমাজই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। এই সকল চিন্তা করিয়া আমি প্রথম হইতেই সতর্ক হইয়াছিলাম, সামাজিক সঙ্গ-সুখের আশা ত্যাগ করিয়া আমি একটি উদ্যান রচনা করিয়া তরুলতার নীরব সঙ্গ সাধনা করিয়াছিলাম। ইহাও বলি যে, অতিশয় অসজ্জন ব্যক্তিকে স্নেহ করিবার মত দুই একজন মহাশয় পুরুষও সে সমাজে ছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমার চরিত্র-সংশোধন হয় নাই।

এ সকল সত্ত্বেও বড় সুখে ছিলাম শুনিলে হয়ত আপনারা আশ্চর্য হইবেন, কিন্তু আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। স্বেচ্ছায় সমাজ 'বহিষ্কৃত বা সমাজ' বহির্ভূত হইয়া বাস করিলেও তাহাতে আমার অন্তর উপবাসী থাকে নাই—চাকুরীস্থানে বাস করিলেও আমার বাসা ছিল আমারই, তাহাকে আমার প্রাণ দিয়া সাজাইয়া লইয়াছিলাম এবং চাকুরী করিতে হইলেও আমাকে দাসত্ব করিতে হয় নাই; আমার চাকুরীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের যে সম্মান ছিল, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। সে ব্যবস্থা এমনই যে, যে আপনাকে সম্মান করে, যে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, যাহা প্রাপ্য তাহার অধিক পাইবার লালসা যাহার নাই, এবং যে সেই প্রাপ্তির বিনিময়ে যাহা দিবার তাহা সাধ্যমত দান করিতে পরাঙ্মুখ নহে তাহার পক্ষে ইহা চাকরীস্থান নহে, কর্মস্থান; সে কর্মে ধর্মের পূর্ণ অবকাশ আছে। আজ বিদায়কালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এই একটি অতি যথার্থ কথা আপনাদিগকে অকুণ্ঠিতে জানাইলাম। আমার সুখে থাকিবার একটি প্রধান কারণ এই। অন্য কারণ আপনারা অনুমান করিতে পারেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে যাহাদের সহিত সত্যকার বন্ধন তাহারা ত মনিব নয়; আমি সেই ছাত্রছাত্রীদের সহিত বড় সুখে কাটাইয়াছি—আমার প্রতি তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার তুলনা নাই। দীর্ঘ যোল বৎসর আমি এই বিদ্যালয়ে যে অধ্যাপনা করিয়াছি—সেই অধ্যাপনায় যদি কিছুও সাফল্যলাভ করিয়া থাকি, তবে সে তাহাদেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বলে; মাতৃভাষার প্রতি তাহাদের অনুরাগ ও তাহাদের সহিত প্রীতি নীরবে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের ব্যাকুল শুশ্রূষাই আমার রসনার জড়তা দূর করিয়াছে। সে প্রীতি এবং সেই শ্রদ্ধা এমনই যে, অতিশয় রূঢ়-ভাষী দুর্মুখ বলিয়া আমার যে কুখ্যাতি আপনারা কেবল শুনিয়াছেন মাত্র, বারবার তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে মর্মবিদ্ধ হইলেও তাহারা যেমন সহ্য করিয়াছে এমন আর কেহ করিত না। এ বিষয়ে তাহাদের তুলনায় আমিই দুর্বল—আমার স্নেহ ও শুভচেষ্টা অপেক্ষা তাহাদের ভক্তি বড়—তাহারাই জয়ী হইয়াছে। গত কয়দিবস ধরিয়া তাহাদের মুখে অনুক্ষণ বিদায়-ব্যথার যে ছায়া ঘনাইয়া উঠিতে দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি।

এইবার আপনাদের কথা। আপনাদের সহিত আমার কি সম্পর্ক তাহা আপনারাই ভাল জানেন—আপনারা আমাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন ও কিভাবে পাইয়াছেন তাহা আপনারাই আজ বিদায়-বেলায় এই সভার মধ্যে ব্যক্ত

করিয়াছেন। আমি জানিতাম যে আপনাদের সমাজ হইতে দূরে রমনার শেষপ্রান্তে বাস করিলেও আপনারা আমাকে আপনাদেরই একজন বলিয়া অন্তরে স্থান দিয়াছিলেন—আমি যে আপনাদের প্রতিবেশী, সে কথা আমাকে আপনারা কখনও বিস্মৃত হইতে দেন নাই; কত উপলক্ষে আপনারা আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, আমাকে আপনাদের স্থানীয় অনুষ্ঠানসমূহে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আপনাদের নিকটে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা চাকুরী-স্থানবাসী পরজন ছিলাম না—আমি ছিলাম মাতৃভাষার সেবক, অতএব বড় আত্মীয়তার, বড় আদরের বস্তু। যে বৃহৎ স্বজাতি-সমাজে আমি কেবল কল্পনাতেই বাস করিয়াছি, যাহাদের মুখ চাহিয়া আমি নিরন্তর কত ভাবনা কত চিন্তা করিয়াছি, আমার সেই তুচ্ছ চিন্তারাজীকে পত্রিকায় পুস্তকে প্রচার করিবার দুঃসাহস করিয়াছি; যে একমাত্র সমাজই আমার সমাজ, যাহার সঙ্গলাভ করিয়া বিজনেও স্বজনতা বোধ করিয়াছি—জাগর-স্বপ্নে কত নিঃসঙ্গ প্রহর কাটাইয়াছি, যে সমাজের আকর্ষণে আমি আর সকল সমাজ বর্জন করিয়াছি—স্নেহ, প্রেম, বন্ধুতা, সুখ্যাতি বা সুযশে নিশ্চেষ্ট আছি, আপনারা আমার সেই সমাজের সাক্ষাৎ পরিচিত মানুষ, দূর হইতে পত্রে যাহাদের সহিত আলাপ করি তাঁহাদেরই সগোত্র। ঢাকা বাসকালে আমি আপনাদিগকে বড় নিকটে পাইয়াছিলাম—আবার আপনারা দূর হইয়া পড়িবেন। তাই যে দুঃখ পাইতাম না তাহাই পাইতেছি; নতুবা আপনারা ত চিরদিন আমার পরমাত্মীয়—আপনারা যে দেশকে, সমাজকে, বাঙালীকে, বাংলা ভাষাকে ভালবাসেন, সেই ভালবাসা নিকটে হোক, দূরে হোক, কখন হ্রাস হইবার নয়। তবু আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগ্য'—হায়! হায়! আজ যে কেবলই ওই এক কথাই বারবার মনে পড়িতেছে: ঐ নিষ্ঠুর কথাই কি একমাত্র সত্য?

আমি ঢাকায় দীর্ঘকাল বাস করিলাম, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল আমি এখানেই যাপন করিয়াছি। আজ বিদায়কালে আমার স্বাস্থ্যও এমন হইয়াছে যে মনে হয় শুধুই চাকুরীর কাল নয়, জীবনকালও অবসান-প্রায়। তাই আজ ভবিষ্যতের দিকে নয়—সদ্য-অতীতের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। আমি আমার এই ঢাকাবাসের লাভালাভ ভাবিতেছি। আমি এখানে সুখে ছিলাম সে কথা বলিয়াছি—সে সুখ চাকুরীর সুখ নয়, ইহাও বোধ হয় আপনারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন; ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার এই চাকরী আমার ধর্ম নষ্ট করিতে

পারে নাই। কিন্তু যাহা পাইয়াছি তাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ; আমি এইখানে আসিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মনে সাহিত্যসেবার অবকাশ পাইয়াছি—আমি স্বসমাজ ও পর-সমাজ—সকল সমাজ এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রভাবমুক্ত হইয়া আত্মসাধনার সত্যমন্ত্রটিকে ধরিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং এইখানেই আমি এমন কয়েকটি মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছি, যাহাতে আমার জাতির প্রতি তথা মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। মানুষের মধ্যেই যে ভগবান আছেন, সেই ভগবান যে আমাদের দেশ ও জাতিকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই, সেই আশ্বাস পাইয়াছি। আরও যাহা পাইয়াছি তাহার উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে আমার শেষ সম্ভাষণ জানাইব। আপনারা জানেন আমি বাঙলার যে সমাজে জন্মিয়াছি সেই সমাজ ও আপনাদের সমাজে কিছু পার্থক্য আছে—সে পার্থক্য স্বাভাবিক, কিন্তু তাহারই কারণে দুই সমাজের মধ্যে একটা ভাবগত ব্যবধান জন্মিয়াছে। আমি দুই সমাজকেই দেখিলাম, দুইএরই দোষগুণ বারবার মিলাইয়া দেখিলাম—বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের যে একটা জাত্যভিমান আছে—বিশেষ করিয়া এই দুজনের একটু বেশিমাত্রায় আছে—সেই জাত্যভিমানবশে আমি বাঙলার কোন সমাজকে ছোট দেখিতে পারি না—ঠিক সেই কারণেই আমি দুই সমাজের দোষ-ত্রুটির সম্বন্ধে সমান অসহিষ্ণু; পূর্ববাঙলায় আমি যাহাদিগকে গালি দিই, পশ্চিম বাঙলায় আমি তাহাদিগের গুণকীর্তন করিয়া সেখানকার যুবকগণকে কশাঘাত করি—ফলে আমি কোথাও কাহারও প্রিয় হইতে পারি নাই। দোষ দুই বাঙলারই আছে—দুইএরই দোষ দুই প্রকারের। তথাপি, আমার বরাবর মনে হইয়াছে পশ্চিমের সমাজ আরও দুর্বল আরও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে—বাঙালী জাতির পক্ষে সেও কম শোচনীয় নয়; বিশেষতঃ হিন্দু বাঙালীর পক্ষে সে যে কতবড় দুর্ভাগ্য তাহা চিন্তাশীল বাঙালীমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এখানে সে বিষয়ে আমি কিছু বলিব না। পশ্চিমবঙ্গে সমাজ বলিয়া আর কিছু নাই—ভিতরে বাহিরে বহুদিন যাবৎ ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আপনাদের সমাজে আমি যেটুকু সমাজচেতনা দেখিলাম—বিশেষ করিয়া ব্যবহারের যে আন্তরিকতা এবং যে প্রাণপূর্ণ আত্মীয়তা লক্ষ্য করিলাম, তাহাতে আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। বাঙলার পল্লীসমাজে পরস্পরের মধ্যে যে আত্মীয়তা-বন্ধন এক্ষণে ইতিহাসগত হইয়া পড়িতেছে তাহা আপনাদের সমাজে এখনও সম্পূর্ণ মরে নাই, ইহাই আমি দেখিলাম, দেখিয়া আমারই পূর্বপুরুষকে স্মরণ করিলাম, এবং ধন্যবোধ করিলাম।

আজ বিদায়ের দিনে আপনাদিগকে সেই আশ্বাস ও আনন্দের কথা জানাইয়া বিদায় লইতেছি—আপনাদের স্মৃতি আমার জীবনের অস্তগগনে সন্ধ্যাতারার মত স্নেহরশ্মি বিকিরণ করিবে। এখানে যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমার শেষ সঞ্চয়, তাই তাহার মূল্য এত অধিক! একদিন যে দেশকে বিদেশ মনে হইয়াছিল, তাহাই কখন চুপে চুপে আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—আজ আমি যেন স্বদেশ হইতে বিদেশে যাইতেছি—এ বয়সে তেমন যাত্রা যে কত দুঃখজনক তাহা কে না জানে? সেই যাত্রাপথে আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষাই আমার পাথেয়—আপনারা আমার সকল অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করিয়া প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দিন; আমি আপনাদিগকে যুক্ত-করে আমার বিদায় অভিনন্দন জানাইতেছি।

ঢাকায় থাকতে থাকতেই ১৯৩১ সালে টাইফয়েড রোগে তাঁর দুটি কন্যা অমিয়া ও অরুণা দিন কয়েকের ব্যবধানে মারা যায়। তখনকার দিনে টাইফয়েডের ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। পরপর দুটি কন্যার বিয়োগে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে গেলেন। ঢাকা থেকে ফেরার পর ১৩৫২-এর ১লা বৈশাখে তাঁর আর একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। প্রথম দুটি কন্যার মৃত্যুতে তিনি একটি শোকগাথা রচনা করেন এবং 'রূপকথা' নামে 'কিশোর কাব্যের উৎসর্গ-পত্রে সেটি প্রকাশিত হয়েছে'। পুত্রের বিয়োগব্যথায় তিনি 'মৃত্যুর দান' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি 'জীবন-জিজ্ঞাসা' (২৮শে আষাঢ় ১৩৫৮) গ্রন্থেই রয়েছে।

সাত

মোহিতলালের পঞ্চাশত্তম জন্মদিন (১৩৪৫, ১১ই কার্তিক) ঢাকায় ঘটা করে পালিত হয়। সেই উপলক্ষে মোহিতলাল একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। কবিতায় তিনি বলেছিলেন—

আয়ু-বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা অর্ধ শতক আগে,
অসীম শোভার সৃষ্টির পরে উঠিয়াছে দিন রাত;
আজি সে ক্লান্ত, পক্ষে তাহার জরার জাড্যমা জাগে,
নয়ন মুদিয়া দিবস-নাথেরে করিতেছে প্রণিপাত।
... ...
অবশেষে আর রহিবে না কিছু বাহির-ভুবনে মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির সনে!

তবু যতখন জাগিব আঁধারে—রহিব নেশায় ভোর,
তোমারে দেখেছি—এই কথা শুধু জপিব পরাণপণে।
—পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে : হেমন্ত-গোধূলি

তাঁর এ কামনা পূর্ণ হয় নি। দেহে ও মনে একটা নিদারুণ অবসাদ, বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা তাঁর মন অধিকার করতে শুরু করেছে এই সময় থেকেই। সাহিত্য ব্যাপারে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল তাতে ক্রমশঃ ভাঁটা পড়ছে, বাঙালীয়ানার গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ধ্যান শুরু করেছেন, গান্ধীজির অহিংসা, রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ অর্থহীন ঠেকেছে তাঁর কাছে। কাজেই অন্ধকারে যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গানের নেশায় মশগুল থাকতে পারেন নি, বাঙালীর নিদারুণ দুরবস্থা তাঁকে সর্বদা পীড়িত করেছে, সাহিত্য ছেড়ে স্বজাতির কল্যাণচিন্তায় বিভোর হয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনে (১৩৪৭, ৬ঠা জ্যৈষ্ঠ) মূল সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে তাঁর মনোভাবের পূর্ণ পরিচয়টি পাওয়া যাবে। সেই ভাষণের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"আমি আজীবন সাহিত্যের সেবাই করিয়াছি, সাহিত্যই আমার ইষ্টমন্ত্র ও জপমন্ত্র হইয়া আছে, কিন্তু ইহারই আকর্ষণে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের ফলে আমি আমার জাতির প্রাণের ইতিহাস ও জীবনের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া পারি নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পরিচয় করিতে গিয়া এই জাতির সমাজ ও ধর্মজীবন, নৈতিক সংস্কার, পুরুষপরম্পরাগত সাধনার ধারা—তাহার অন্তরের আকূতি ও বাহিরের দৈন্য, মনের দীপ্তি ও চরিত্রের দুর্বলতা—যে ভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আজ এই জাতির জন্য আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে জাতিস্মরতার বেদনা জাগিয়াছে। এ জাতির বর্তমান দুর্দশা দর্শনে আমি অতিশয় বিহ্বল হইয়াছি। আজ আমি বাঙালা কবি ও কাব্যের কথায় উৎফুল্ল হইতে পারিতেছি না, এমনকি, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হইলেও সে চিন্তাও দূর করিয়া আপাতত এই জাতির জীবন মরণ সমস্যার কথা ভাবিয়া অধিকতর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যখন বয়স অল্প ছিল, প্রবল জীবনানুভূতি যখন মৃত্যুকে স্বীকার করিত না, তখন সে যুগের সেই ঘূর্ণবাত্যায় বাঙালীর বাস্তুভিটার ভিত্তিমূল যখন টলিতে আরম্ভ করিয়াছিল;

আত্ম ও পর উভয়বিধ শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে যখন ভিতরে ও বাহিরে আগুন লাগিয়াছিল—তখনও আশা করিতাম, এ জাতি মরিবে না ; ··আজ আর সে ভরসা পাইতেছি না ; দিকে দিকে মৃত্যুর বাতাস বহিতেছে, জাতির জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, যেন জীবধর্মও লোপ পাইতেছে।···

আমার মত ব্যক্তিও, যে চিরদিন ভাব-চিন্তার জগতে ঘুরিয়াছে যে জীবনের কর্মশালার ঘর্মাক্ত ধূলিধূসর দেহের অভিজ্ঞতা সভয়ে বর্জন করিয়াছে, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যবর্তী একটা জীবনই যাহার কাম্য ছিল, সেও আজ সূক্ষ্ম চিন্তা ও সূক্ষ্ম ভাবের চর্চাকে নিতান্ত নিরর্থক মনে করিতে বাধ্য হইয়াছে। গাছই যদি মরিয়া গেল, আর ফুলের হিসাবে প্রয়োজন কি? ভিটাই যদি উৎসন্ন হইল, তবে পুষ্পোদ্যানের ভাবনা করিয়া কি হইবে? তথাপি একটা কাজ আছে। সাহিত্য তো কেবল কাব্যসৃষ্টিই নয়, ভাষা কেবল বিদ্যারই বাহন নয়। যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে, ততক্ষণ ভাবনাও আছে, সাহিত্যও শেষ পর্যন্ত সেই শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবাহ। অতএব একালে সকল সাহিত্যচর্চার মূলে থাকিবে জাতির জীবনরক্ষার ভাবনা—মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের আরাধনা।"

—জাতির জীবন ও সাহিত্য : বিবিধ কথা

সাহিত্যের ভাবরাজ্য ছেড়ে মোহিতলাল যখন বাঙালীয়ানার কোটরে বাসা বাঁধলেন তখন অনেকের 'সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব হল না। কারণ তিনি যা বুঝতেন সেটিই চরম বলে মনে করতেন, কারো সঙ্গে আপোষরফা করে তাঁর মত পরিবর্তন করতেন না। স্বভাবের এই একগুঁয়েমির জন্যে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন অনেকে। বাঙলার বর্তমান অবস্থা তাঁর মাথাকে এত গরম করে দিত যে ধৈর্য ধরে অপরের বক্তব্য শুনতেন না, অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন—জাতির জীবন-রক্ষার ভাবনায় অধীর হয়ে উঠেছেন। 'বাংলার নবযুগ' (১৩৫২) 'জয়তু নেতাজী' (১৩৫৩) 'বাঙলা ও বাঙালী' (১৩৫৮) বইগুলি তাঁর এই মনোভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন।

যে 'শনিবারের চিঠি'কে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, যার সম্পাদককে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন, বাঙালীর দুর্গত অবস্থায় মর্মাহত হয়ে সেই প্রিয় বস্তুর সংস্রব ত্যাগ করলেন (ফাল্গুন ১৩৫১)। 'চিঠি' তাঁর মতানুযায়ী পথে চলল না, বাঙলা ও বাঙালীর কথা চিন্তা করল না, সারা ভারতের প্রেমে দেওয়ানা হল, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রচার আরম্ভ করল, যা আজ সমগ্র ভারতের কাঁধে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ নামে চেপে বসতে উদ্যত হয়েছে। বাঙলাদেশের

প্রতি ভারতীয় কংগ্রেসের ঔদাসীন্য, নেতৃবৃন্দের তাচ্ছিল্য, সর্বোপরি মহাত্মাজীর দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মনঃপূত ছিল না ; বিশেষ করে ত্রিপুরি কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের প্রতি মহাত্মাজীর মনোভাব তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। 'জয়তু নেতাজী' বইয়ের মধ্যে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অথচ 'চিঠি' এসবের কোন প্রতিবাদই করল না বরং সেই গান্ধী ও গান্ধী-প্রবর্তিত কংগ্রেসী নীতিতে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ল। মতের অমিলে তিনি সরে দাঁড়ালেন। এই গান্ধীজী সম্পর্কেই তিনি প্রথম জীবনে দুটি কবিতা (মহামানব, আবির্ভাব) লিখেছিলেন, যে-সময় গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের কর্ণধার হয়েছেন, সেই আবির্ভাবকেই স্বাগত জানিয়েছেন—

এমন সময় কোথা হ'তে ওঠে তিমির-গগন ভেদি'
আবাহন-গান, স্তোত্র মহান্—'আবিরাবীর্ম এধি !'
কাহার কণ্ঠে কুমারী-উষার বোধন-মন্ত্র-বাণী
বাণের মতন প্রাণ-কোদণ্ডে ভীম টঙ্কার হানি'.
ধ্রুবলোকে পশি ফিরিয়া আনিল আলোকের সন্ধান—
চেতন-দুয়ারে ভ্রান্তি-কবাট ভেঙে হ'ল খান্-খান্ !

... ...

অধরে তাহার মৌন-মহিমা, ললাটে অমৃত-ভাতি !
নয়নে গভীর প্রসাদ-দীপ্তি, হেরিছে প্রভাত রাত্তি !
ক্ষীণ তনু, তবু বজ্রে রুখিতে—ঝড়েরে বাঁধিতে জানে !
উদ্যতফণা কালিয় তাহার বাঁশির শাসন মানে !
জন-সমুদ্রে কল্লোল ওঠে—'অবতার ! অবতার !'
রুদ্ধ-নিশাসে হেরিছে ভারত নব লীলা বিধাতার।

—আবির্ভাব : স্বপন-পসারী

'মহামানব' কবিতার মধ্যেও গান্ধীভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যুগ-সংকটে ভারতে বার বার যেসব অবতারদের আবির্ভাব হয়েছে তাদের সঙ্গে গান্ধীজীকে তিনি এক করে দেখেছেন। এজন্যে গান্ধী তাঁর কাছে মহামানব। তাঁর আবির্ভাব ভারতের মরা গাঙে যে প্রাণের জোয়ার এনেছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই শ্রদ্ধাবোধ বেশীদিন থাকে নি—ক্রমে ক্রমে গান্ধীজীর কাজকর্ম, বিশেষ করে নেতাজী ও বাঙলাদেশ সম্পর্কে তাঁর তাঁকে ব্যথিত করেছে, ফলে গান্ধীজীর প্রতি তিনি সব শ্রদ্ধা

হারিয়েছেন। 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদনায়, 'বাংলা ও বাঙলী' গ্রন্থে এবং নানাজনকে লিখিত পত্রাবলীতে তাঁর এই মনোভাবের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

ফাল্গুন ১৩৫৫ সংখ্যাই মোহিতলালের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র শেষ সংখ্যা। ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পাঁচ মাস পরে সপ্তম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৫৬) বেরোয়। 'বঙ্গদর্শন' থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিদায়কালীন উক্তি করেছিলেন সপ্তম সংখ্যায় সেটি উদ্ধৃত করে মোহিতলালের সম্পাদক হিসেবে বিদায়কালীন যুক্তি দেখানো হয়। তবু শেষরক্ষা করা গেল না অষ্টম সংখ্যা (শারদীয় ১৩৫৬) 'বঙ্গদর্শনে'র মৃত্যু ঘোষণা করে। প্রথম সংখ্যা পাঠকদের মধ্যে যতটা আগ্রহ সঞ্চার করেছিল সেই আগ্রহ মোহিতলাল শেষ পর্যন্ত জীইয়ে রাখতে পারেন নি। সম্পাদনার বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রথম সংখ্যা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায় —দ্বিতীয়বার মুদ্রণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যদিও মুদ্রিত হয় নি। প্রথম সংখ্যা যখন বেরিয়েছিল তখন বাঙলাদেশ ভাগ হয়েছিল। স্বভাবতঃই বাঙালীর মন বেদনায় ভারাক্রান্ত ছিল—মোহিতলাল বাঙালীর সেই বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছিলেন। ফলে সেদিন সেটি বাঙালীর মনের কথা হয়েছিল কিন্তু ক্রমশঃ মোহিতলাল তাঁর বক্তব্যকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না করে আবেগের বাষ্প সঞ্চালিত করে হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের জন্য আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকালে তিনি কোন লেখকগোষ্ঠী তৈরী করতে পারেন নি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা পত্রস্থ করেন নি—যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর নীতিগত বিবাদ ছিল। এইসব কারণে 'বঙ্গদর্শন' যতটা সাড়া জাগাবে বলে চমক দিয়েছিল ততটা পারে নি।

সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, "নির্মলকুমারের (বসু) সঙ্গে আমার সাহিত্য-জীবনের সর্বাধিক ট্রাজেডি জড়াইয়া আছে। 'আত্মস্মৃতি'র পূর্বাপর পাঠকেরা যদিও জানেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত, 'শনিবারের চিঠি'র শুম্ভ গান্ধী বিরোধী মোহিত-লালের ধারণা হইয়াছিল নির্মলকুমার আমাকে গান্ধীভক্ত করিয়া তুলিয়া 'শনিবারের চিঠি'র ক্ষতি করিতেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর মত আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্য। যাহা আত্মনেপদী তাহাকে পরস্মৈপদী আখ্যা দিতে আমি রাজি হই নাই—নির্মলকুমারকে বর্জন করিবার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

ফলে মোহিতলালের সহিত আমার সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছিল।" —(শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৬২)। সজনীকান্ত যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা প্রধানতঃ একতরফা এবং বিতর্কমূলক। তিনি যে প্রথম থেকে গান্ধীভক্ত এবং ইদানীং রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ শিষ্য হিসেবে 'আত্মস্মৃতি'তে প্রচার করছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর, কারণ সে-যুগের 'শনিবারের চিঠি'র আষ্টেপৃষ্ঠে গান্ধী-বিরোধী ও রবীন্দ্র-বিরোধী অনেক অশ্লীল কার্টুন ও অশিষ্ট মন্তব্য সহযোগে তাঁদের শ্রাদ্ধ করা হয়েছে যার সঙ্গে স্বয়ং সজনীকান্ত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত—এ সব কথা 'চিঠি'র পুরোনো পাঠকদের অবিদিত নেই। 'চিঠি' যে কোনদিন কোন নির্দিষ্ট নীতি নিয়ে পরিচালিত হয়েছে তা বিশ্বাস করা কঠিন—যে ধারে রোদ লাগে সে ধারে ছাতা ধরাই তার কাজ। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সংস্রব ত্যাগের ইতিহাস মোহিতলাল 'আমি ও শনিবারের চিঠি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বিবৃত করেছেন। 'বিংশ শতাব্দী'র শারদীয় ১৩৬৬ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে যাই হোক, ঢাকায় থাকতেই 'চিঠি'র সঙ্গে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়; 'শনিবারের চিঠি'তে শেষ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বাংলার নবযুগ' ১৩৫১ মাঘ সংখ্যায় সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 'চিঠি'র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সজনীকান্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর কন্যার বিবাহে কন্যাকে আশীর্বাদ করার পর কলকাতার সন্নিকটে থেকেও সজনীকান্তের মুখদর্শন করেন নি, ত্যাজ্য পুত্রকে পিতা যেমন ভর্ৎসনা করে, অভিশাপ দেয়, শেষ ক'বছর তিনি তাই করেছেন—নিজস্ব মতবাদে তাঁর এমনই নিষ্ঠা ছিল। 'চিঠি'র গোষ্ঠিভুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তিনি কোন সম্পর্ক রাখেন নি। যে তারাশঙ্কর মোহিতলালের সাত্ত্বিক তান্ত্রিক সাধনা দেখে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন সেই তারাশঙ্কর যখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দীকে সমর্থন করলেন তখন মোহিতলাল তাঁকেও ত্যাগ করলেন। তিনি দুঃখ করে 'কথাসাহিত্যে'র তারাশঙ্কর-অভিনন্দন সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৫৭) লিখেছিলেন, "যে তারাশঙ্করকে আজ আপনারা চেনেন ও জানেন সে তারাশঙ্করকে আমি চিনি না।" কতবড় বেদনা থাকলে মানুষ একথা বলতে পারে!

তিনি যে বাঙালীয়ানার মনোভাব পোষণ করতেন তার প্রচার ও প্রসার-কল্পে 'বঙ্গদর্শন' ও বঙ্গভারতী' পত্রিকা বের করেন। তাঁর এই সময়কার রচনাদি অন্য পত্র-পত্রিকা ছাপাতে ইতস্ততঃ করত আর মোহিতলালও তাদের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। যাঁরা পত্রিকার সঙ্গে কারবার করেন তাঁরাই বোঝেন,

সাময়িক পত্রে লেখা ছাপতে হলে কিরূপ ধৈর্য রাখতে হয়। নামকরা লেখকদের লেখা কেউ বর্জাসে ছাপে, কেউ অখ্যাতদের লেখা প্রথম পাতায় ছেপে পরে খ্যাতনামাদের লেখা ছাপে, প্রুফ দেয় না, ছাপা-কপি লেখককে পাঠায় না, ফাইল কপি দেয় না। মোহিতলালের মত অভিমানী লেখকের পক্ষে এসব সহ্য করে সম্পাদকের মন জুগিয়ে চলা অসম্ভব ছিল। একটা ছাপার ভুল থাকলে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হত। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক তাঁর মেজাজ বুঝে চলতেন বলে তাঁর লেখা 'চিঠি'তে অতি যত্ন সহকারে ছাপা হত। 'চিঠি'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের পর আর কোন সম্পাদক তাঁর কাছে ভিড়তে সাহস করেন নি।

তিনি বলতেন, "সাহিত্যসেবার অর্থ শুধু নিজে লিখতে পারা নয়, ভাল লেখার রস উপভোগ, এবং সকলকে সে উপভোগের আনন্দের ভাগ দেওয়া। আমি নিজেই লিখি আর অন্যেই লিখুক, ভাল লেখা হলে তা আমার মাতৃভাষার সম্পদ, কাজেই আমার সম্পদ। এই সম্পদ যাতে সাধারণের ভোগে লাগে, তার জন্য সকল প্রয়াসই সাহিত্যসেবা। ভাল লেখা যা সাধারণের চক্ষের অগোচরে থেকে গেছে তাকে লোকচক্ষুর সামনে মেলে ধরলেও সাহিত্যসেবাই হয়। যা উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাও সাহিত্যসেবা। অন্যান্য ভাষায় যেসব উৎকৃষ্ট লেখা আছে সেগুলোর অনুবাদ অন্ততঃ সন্ধান দেওয়াও সাহিত্যসেবা।" সাহিত্যের এই আদর্শ ও বাঙালীয়ানাকে সামনে রেখে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার (১৩৫৪, শ্রাবণ) সূচী ছিল এইরূপ—

"১। পত্রসূচনা

২। রবীন্দ্র-স্মৃতি-তর্পণ

মহাপ্রয়াণ

স্মৃতি-তর্পণ

স্মরণীয় কাব্যপংক্তি

রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ

৩। রবীন্দ্রনাথ ও স্মৃতিপূজা—ক্ষিতিমোহন সেন

৪। বঙ্গ-কবির বিদায় (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়

৫। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৬। ভাগ্যবন্ত (গল্প)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। মণিমঞ্জুষা (কবিতা-চয়ন)

বাংলার কবি

রূপতৃষ্ণা

মনোহারিকা

কিশোরী

মালতী

দ্বিপ্রহরে

সধবা

৮। শ্রুতি-স্মৃতি

পলিটিক্‌স্‌

বাংলার বৈশিষ্ট্য

৯। আমার সাধ

১০। ইতিহাসের ইন্দ্রপ্রস্থ—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

১১। মাধুকরী (অনুবাদ)

লায়লা-মজনু

সভ্যতা

১২। গ্রন্থ-পরিক্রমা

১৩। বঙ্গ-দর্শন (সম্পাদকীয়)"

'পত্রসূচনা'য় মোহিতলাল পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করেছিলেন, " 'বঙ্গদর্শন' নামের দ্বারাই কতকটা তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শকেই এই যুগের উপযোগী করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিতে, সাহিত্যের সত্য ও সাহিত্যের ধর্ম রক্ষা করিতে চাই।...বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন নব্য বাংলা সাহিত্যের ভিত-পত্তন করিতে; আমরা চাই, সেই ভিতের উপর যে সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, সেই সৌধের আয়তন বৃদ্ধি করা যদি বর্ত্তমানে অসম্ভব হয়, তবে অন্ততঃ সেই ভিতটিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন তদানীন্তন নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে সেই শিক্ষার অমৃতফল আস্বাদন করাইতে, তাহা দ্বারা বাঙালীর মনুষ্যত্ব উদ্বোধন করাই ছিল তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র অভিপ্রায়। আমরাও আজ এই 'বঙ্গদর্শনে'রই সাহায্যে বাঙালীর সাহিত্য নীতিকে সঞ্জীবিত করিতে চাই, সাহিত্য-সাধনাকেই মনুষ্যত্ব-সাধনার একটা অঙ্গ বলিয়া তাহার প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে

চাই।...বঙ্কিমের ব্রত ছিল সাহিত্য-সৃষ্টি, আমাদের ব্রত সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, সাহিত্যের প্রাণরক্ষা।..'বঙ্গদর্শনে'র প্রধান কাজ হইবে, রসিকসমাজে রস-নিবেদন, এবং সেই সঙ্গে, যাঁহারা রসপিপাসু অথচ রসজ্ঞ নহেন তাহাদিগকে সাহিত্য-জ্ঞানসম্পন্ন করা। এজন্য আরও দুই-একটি উপকরণ-আয়োজন থাকিবে। প্রথমতঃ, অনুবাদের সাহায্যে বিদেশী সাহিত্য হইতে সাহিত্যরস আহরণ; দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সাহিত্যের পূর্বগামী আচার্যগণের, তথা বিদেশী সাহিত্যাচার্যগণের উৎকৃষ্ট উক্তি বা ভাবচিন্তার সুপারিখিত সঙ্কলন। এতদ্ব্যতীত, সাময়িক সাহিত্যের যাহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহাও যথাসম্ভব কেলাম্য রক্ষা করিয়া 'বঙ্গদর্শনে'র পুষ্ট-পোষণ করিবে। আমাদের এই আদর্শকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন সেই যুগান্তরজীবী সাহিত্যিক যে কয়জন একালেও বাংলা সাহিত্যের মান রাখিতেছেন তাঁহাদের রচনাও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইবে, প্রাচীনের সহিত নবীনের এই সম্মিলনে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে কাব্যের রস পাত্রভেদে যতই ভিন্ন-রূপ হোক—তাহরে স্বাদ-গন্ধ একই।" গল্প-উপন্যাস-প্রা বত পত্র-পত্রিকার দেশে তিনি এনেছিলেন সাহিত্যের একটা উঁচুমানের পত্রিকা। প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে, প্রথম বছর শুরু হয়েছিল শ্রাবণ ১৩৫৪ সনে। দ্বিতীয় বছর শুরু হয়েছিল আশ্বিন মাসে ১৩৫৫ সনে। এই পরিবর্তনের কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে তিনি 'আমাদের নববর্ষ' নামক এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বৎসর ১৪ই আগষ্ট তারিখে 'বঙ্গদর্শন' বাহির হয়; ঐ তারিখ 'র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড' প্রকাশিত হওয়ার তারিখ।...ঐ লগ্ন অতিশয় কু-লগ্ন—ঐ লগ্নে বাংলার সর্বনাশ হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভ ভারতের পক্ষে যত বড় সৌভাগ্য হউক - ঐ র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডের বহু বিভাগ, অর্থাৎ বাংলার হিন্দু অংশটারও সেই অনুচ্ছেদ-ঘটনা তাহার পূর্বেই ঘটিল।..ইহার পর আমাদের যাত্রার মাসিক পদক্ষেপে বার বার কালবিলম্ব হইয়াছে, তাহা আমাদের অক্ষমতা, এবং বাহিরের বাধাবিঘ্ন—যে কারণেই হইয়া থাকুক, আমরা দুইটি ত্রুটি—কালবিলম্ব এবং যাত্রার ঐ লগ্ন—সংশোধন করিবার জন্য 'বঙ্গদর্শন'-এর দ্বিতীয় বর্ষ নূতন লগ্নে আরম্ভ করিলাম।" লগ্ন পরিবর্তন করেও পত্রিকাকে বাঁচানো যায় নি। আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যার পর আটটি সংখ্যা বেরিয়েছিল—তার মধ্যে মোহিতলাল ছটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি জনৈক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, " 'বঙ্গদর্শন' বোধহয় বন্ধ হইয়া গেল, তার কারণ, ব্যবসায়ী ও ব্যবস্থা উহার

প্রতিকূল। বাঙলাদেশে এমন একজন ধনী নাই, যাহার কিছুমাত্র প্রেম আছে। ধর্ম—অর্থাৎ নিঃস্বার্থতা একেবারে লোপ পাইয়াছে। একেবারে! কোথাও কোনখানে কাহারও মধ্যে নাই- যাহাদের আছে তাহারা একেবারেই অর্থ-সামর্থ্যহীন, এমনও মনে হয় যদি তাহারা অর্থশালী হইত, তবে তাহারাও ঐরূপ পিশাচ হইত।" —জীবনকালী রায়কে লিখিত।

আবার বছর তিন পরে অনুরূপ আদর্শে 'বঙ্গভারতী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বের করেন। প্রথম সংখ্যার (১৩৫৯ বৈশাখ) সূচী—

আমাদের কথা
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
অকাল-উৎসব
বাংলার বৈষ্ণব—শ্রীতারাচরণ বসু
ফুলদান (কবিতা চয়ন) :
  বর্ষবর্তন
  ভাগ্যহ
পুরাতনী •
গত শতাব্দীর বাঙলা সমাজ ও বাংলা সাহিত্য
মাতৃরূপা মাতা —শ্রীপ্রশান্তকুমার বাগচি
বিদেশী ছোট গল্প আনাতোল ফ্রান্স
বৈদেশিকা •
  এক বক্তার বৈঠক
গোষ্ঠীবহার •
সাময়িকী •
  সভ্যতা
  শ্রীঅরবিন্দ-কথা
  বিবেকানন্দ-কথা
সত্যমপ্রিয়ম্ (সম্পাদকীয়)

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'আমাদের কথা' শীর্ষক অধ্যায়ে ঘোষণা করেন, "বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়, ইহার উদ্দেশ্য তাহার বিপরীত বলিলেও হয়, বিপরীত বলিয়া বিরোধীও নয়।... ইহার লক্ষ্য থাকিবে মুখ্যত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি—বিশ্ব বা ভারতের দিকে নয়।'

সাহিত্যের যে আদর্শ এবং ভাষার যে-ধর্ম এই সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া বিশ্বের সাহিত্য-সমাজে তাহার একটা স্থান করিয়া দিয়াছে সেই আদর্শ ও সেই ধর্মকে পাঠকের হৃদ্‌গোচর করা এবং বিস্মরণ ও অপসারণ হইতে তাহাকে রক্ষা করাই ইহার প্রধান ব্রত।" মাত্র তিন সংখ্যা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) তিনি সম্পাদনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন—আকস্মিক মৃত্যু এর ওপর যবনিকা টেনে দেয়। মোহিতলালের আদর্শে এ পত্রিকা বছর খানেক চলার পর উঠে যায়।

আট

উনবিংশ শতাব্দীর জীবনকে অদ্ভুতভাবে আঁকড়িয়ে নিজস্ব মতবাদ গড়ে উঠেছিল বলে তাঁর মানসপ্রকৃতি বড় বেশী উগ্র হয়ে উঠেছিল। এজন্যে অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়েছে, সভাসমিতি তাঁকে বর্জন করেছে। আর তিনিও তাদের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করে একপ্রকার নির্জন-বাসই শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। তিনি প্রকাশ্য সম্বর্ধনা ও সম্মান পান নি বললেই চলে—যে সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল, যে সম্মান তিনি অধিকার বলে মনে করতেন। এজন্যে তাঁর ক্ষোভ ছিল না, 'দয়া করে মান করিবে যে দান কবি সে করুণা চায় না।' ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে পাটনায় পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (অধুনা নাম নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন) মোহিতলাল সাহিত্য-শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৩৫৩ সালে (১৯৪৬ খ্রীঃ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'সরোজিনী পদক' পান এবং ১৩৫৬ সালে (১৯৪৯ খ্রীঃ শরৎ-স্মৃতি-লেকচারার নিযুক্ত হন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস'। তাঁর লিখিত বক্তৃতাগুলি সংকলিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন-বিভাগ থেকে 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' নামে বেরিয়েছে (১৯৫৩ খ্রীঃ)। পরে তিনি বক্তৃতাগুলিকে আরও পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করেন—আয়তনে পূর্বের দ্বিগুণ হয়। পরিবর্ধিত সংস্করণ এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। এই সময়েই কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়ালের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি চয়ন করে তাঁদের প্রত্যেকের পৃথকভাবে কবিকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্বের একটি রসসমৃদ্ধ সংকলন-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। সম্প্রতি (১৩৬৭) বই দুটি প্রকাশিত হয়েছে 'কাব্য-চয়নিকা' নামে। নদীয়া জেলা সাহিত্য-সম্মেলনে (১৩৫৮, ৮ই বৈশাখ: ১৯৫১, ২২শে এপ্রিল) মূল সভাপতি হওয়া তাঁর শেষ জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁকে সভাপতি করায় বহু সাহিত্যিক ও বিভিন্ন

সাহিত্যগোষ্ঠী বিরূপ মন্তব্য করেছেন, সম্মেলনে যোগদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ভাষণ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল বিভিন্ন কাগজ। তিনি সেই ভাষণে বলেছিলেন, "আজ বাঙ্গালার বাস্তুটাও শতখণ্ড হইয়া মানচিত্র হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে— উন চতুর্থাংশ ভূমি পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান কাড়িয়া লইয়াছে। ভূমি কাড়িয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই তাহার মুখের বুলিও কাড়িয়া লইবার জন্য অহিংসার সত্যাগ্রহীরাও যেমন ইসলামী পাক-পন্থীরাও তেমন বাংলা ও বাঙালীর প্রতি ন্যায়ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। কিন্তু তাহাই এ জাতির আসন্ন বিনাশের কারণ নয়—সে কারণ এই যে বাঙালী আর বাঙালী নামে পরিচিত হইতে চায় না, নূতন প্রভুদের পাদুকা বহন করিয়া ভারত-পিতার দাসীপুত্র হইতে চায়। জাতি এখন প্রকৃতিস্থ নয়, এমনকি দেশস্থ বা সমাজস্থও নয় ...এমনের এই দারুণ বিপ্লবে সাহিত্যের যাহা কিছু প্রেরণা তাহা অর্থহীন হইয়া যায়।'

বাঙলা দেশের বর্তমান অবস্থা তাকে নৈরাশ্যবাদী করে তুলেছিল এবং এই নৈরাশ্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিসত্তা ও সমালোচক-সত্তাকে গ্রাস করেছে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে। গৌরবময় ঐতিহ্যের সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লেও তার রক্তিম আভাটুকু মোহিতলালকে উদ্বোধিত করেছে ঐ ঐতিহ্যের সাধনমন্ত্রে। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি সাহিত্য জীবনের গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। মনে মনে যে শতাব্দীর ধ্যান করতেন সেই শতাব্দীর বাস্তব রূপ তিনি পেতেন না অথচ চাইতেন। ঊনবিংশ থেকে বাঙলা দেশ বহুদূরে সরে এসেছে, আর্থিক দিক দিয়ে বাংলা দেশের সমাজ বিধ্বস্ত হলেও বাঙালী সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণায় এগিয়ে চলছে। মোহিতলাল সেই ঊনবিংশীয় চশমা চোখে এঁটে এ শতকের বাঙালীকে যখনই দেখেছেন তখনি সেই চশমায় প্রতিফলিত হয়েছে বাঙলার শ্মশানিক রূপ একালের বীজমন্ত্র তাঁর কানে যায় নি। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করতে করতে বাঙলা দেশকে ভালবেসেছিলেন মনে প্রাণে। বাঙলা দেশের ওপর কেউ একটু অনাচার করলে কিংবা বাঙলার বাঁচার দাবীকে কেউ স্বার্থের বিনিময়ে খর্বিত করতে উদ্যত হলে তাকে তিনি শত্রুরূপে দেখতেন। ভারতবর্ষ থেকে বাঙলা দেশকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখতেন। দেখার কারণ ছিল যে বাঙলা দেশই সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের মধ্যে একদিন নেতৃত্ব করেছে বাংলা ভাষা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা, সেই বাঙলার উন্নতি তিনি আগে কামনা করতেন।

নৈরাশ্য তাঁকে ছেয়ে ফেললেও বাঙালীর মৃত্যু যে সহজে হবে না এই বিশ্বাসের জোরে সর্বপ্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন অকুতোভয়ে।

বাঙলা দেশের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর অত্যধিক মমত্ববোধ তাঁকে নানা কারণে পীড়িত ও অসুস্থ করে তুলেছিল। আত্মবিস্মৃত পথভ্রষ্ট বাঙালীকে গেল-যুগের যুগ ও জীবন সম্পর্কে অবহিত করাব জন্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর দেহ শীঘ্রই ভেঙে পড়ে এবং জীবনীশক্তির যেটুকু বাকী ছিল তা শেষ জীবনে অর্থাভাব দূর করবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা দুঃখ-কষ্টে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

বাণীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করে অকৌশলী মোহিতলাল কোন দিন লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পান নি—অভাবের সঙ্গে তাকে অহরহ যুদ্ধ করতে হয়েছে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে খেটে পয়সা রোজগার করতে হয়েছে। চাকরী করে অর্থসঞ্চয় কিছুই করতে পারেন নি। প্রকাশকরা ঠকিয়েছে, টাকা নিয়ম-মাফিক দেয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মাইনে পেতেন তাতে সংসারে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকত না। দশটি সন্তানের (তিনটি মৃত—১৯৩১-এ ঢাকায় প্রায় একই সময়ে দুই কন্যার মৃত্যু, ১৯৪২ এপ্রিলে ১২ বছরের এক পুত্রের মৃত্যু।) পিতার পক্ষে সংসার-সংগ্রাম সহজেই অনুমেয়। অপরের অনুগ্রহের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে; শেষ জীবনে তাঁকে বাসা বদলও করতে হয়েছে অনেকবার। ঢাকা থেকে এসে কিছু দিনের জন্যে বারাকপুরে ছিলেন। বারাকপুর থেকে তিনি বাগানে এসে বসবাস করেন বছর তিন-চার। এরপর তিনি বড়িশায় শেষ জীবন কাটিয়ে গেছেন। অধ্যাপনা থেকে অবসর নেয়ার পর প্রধানতঃ লেখনীর ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে। লেখাকে জীবিকার পর্যায়ে ফেলতে হলে মস্তিষ্ককে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয় এবং তার জন্যে মাঝে মাঝে দীর্ঘ বিশ্রামও নিতে হয়, নইলে দেহ ভেঙে পড়ে। মোহিতলাল অর্থাভাবের জন্যে বিশ্রাম করার অবকাশ পান নি—অবিরাম লেখনী চালনা করে গেছেন। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাবের তাড়নায় পীড়িত হয়েও অর্থোপার্জনের জন্যে সাহিত্যিক-আদর্শ থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি। এর ওপর বাঙালীর অধঃপতন তাঁকে প্রতিনিয়ত আঘাত দিয়েছে। যে বয়সে শান্ত সমাহিত চিত্তে পরপারের আহ্বানের প্রতীক্ষা করা যায় সেই বয়সে তিনি যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে হতবীর্য বাঙালীকে বীর্যবান করে তোলার জন্যে অকল্পনীয় দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়েছিলেন। তাঁর এ সময়কার আর্থিক অবস্থা

বন্ধু-বান্ধবদের নিকট লিখিত চিঠিপত্র পাঠ করলে বোঝা যাবে। এখানে খানকয়েক চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল—

"আহার বহুদিন প্রায় অনাহারে ঠেকিয়াছে—নিদ্রা নাই। অতিরিক্ত Blood pressure, তাহার উপর হাঁপানি-কাশির নিত্য ও নৈমিত্তিক পীড়ন। ভাবিয়া দেখুন, তবু আমি যে অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করিতেছি—শুধু লেখা নয়—পড়িতেও কম হয় না—এ শক্তি আসে কোথা হইতে? তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমি এক্ষণে যাহা করিতেছি, তাহা আমার কাজ নয়। কিন্তু ফল কি? চারিদিকে আমার বিরুদ্ধে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও অভিশাপের যেন ঝড় বহিতেছে—উৎসাহ, সহানুভূতি, সাহায্য তো দূরের কথা।" —জীবনকালী রায়কে লিখিত।

"আমার অনেকগুলি পুস্তক (গদ্য ও পদ্য) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা আমি কিছুমাত্র আর্থিক লাভবান হই নাই। তাহাতে দুঃখ নাই।...আজ রোগজীর্ণ শরীরে এবং জীবনে কিছু সঞ্চয় করিতে না পারার ফলে ভবিষ্যতের ভাবনা হইয়াছে, চাকরীও আর বেশীদিন করিতে পারিব না।...আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে, যে বইগুলি আমার সাধনার ফল, পূজার নির্মাল্য—কোথায় কাহার কাছে কত মূল্যে বিক্রয় করিব—সে চিন্তা অনিবার্য হইয়াছে; ইহাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয়।" —শ্যামসুন্দর মাইতিকে লিখিত।

"আমি চিরদিনই লক্ষ্মীছাড়া হয়েই রইলাম। যখন ১০০.০০ মাসিক উপার্জন ছিল তখনও যে অবস্থায় ছিলাম, আজ ৮০০.০০ মাইনে পেয়েও সে অবস্থা ঘুচেনি। কেবল একটু ভাবনা হয়—স্বাস্থ্য ভেঙ্গেছে বয়স বাড়ছে—অনেকগুলি নাবালক ছেলে মানুষ করতে হবে। তাই ভাবনা হয়েছে।" —ঐ।

কিন্তু দারিদ্র্য তাঁকে কোনদিন অবনমিত করতে পারে নি। শত অভাবের মধ্যে থেকেও কারো তোষামোদ করে অবস্থার উন্নতির জন্যে নিজ মতবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে সাময়িকভাবে কারুর পোঁ ধরেন নি।

সব জিনিসেরই শেষ আছে। কথার শেষ না থাকতে পারে জীবনের তো শেষ আছে। উপক্রমণিকার সঙ্গে উপসংহার ত চাই। সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সভ্যতার সর্বগ্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একলা একটা মানুষ কাঁহাতক সংগ্রাম করতে পারে, অনড় অচলায়তনকে কতটুকু নাড়া দিতে পারে? অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম তাঁর জীবনীশক্তিকে একেবারে শূন্য করে এনেছে। নানা রোগ তাঁর দেহে বাসা বেঁধেছে—ব্লাডপ্রেসার হাঁপানি, কফ-কাশি

সবকিছু মিলে তাঁকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলল, ১৯৫২-এর ১০ই জুলাই দুপুর থেকে। পেটে ও বুকে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হল। দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকে চলল। ডাক্তারী পরীক্ষায় রোগ ধরা পড়ল করোনারী থ্রম্বসিস। বাড়ীতে এরূপ রোগীর চিকিৎসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সেবাশুশ্রূষা করার কেউ নেই। কবি-জায়া আগে থেকেই শয্যাশায়িনী একটি ছেলের টাইফয়েড, আর একটি জ্বরে আক্রান্ত—বাড়াটাই যেন হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। কে কার দিকে দেখে! ডাক্তারের অনুক্ষণ সাহায্য ও চব্বিশ ঘণ্টা নিখুঁত সেবা-শুশ্রূষা যাতে পাওয়া যায় সেজন্যে কবির অনুরাগী বন্ধু ও ভক্তশিষ্য কয়েকজন মিলিত হয়ে তাঁকে ২২শে জুলাই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের সেপারেশন ওয়ার্ডে (ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ড) ভর্তি করে দিলেন। সমস্ত চেষ্টাই বিফল হল, অবশেষে শনিবারের অশুভ রাত্রি (২৬শে জুলাই ১৯৫২ : ১০ই শ্রাবণ ১৩৫৯) এল। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ তার সর্বাঙ্গে হাত বুলাতে শুরু করল। কোন যন্ত্রণায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন না, কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন না, আক্ষেপও করলেন না, আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। বন্ধু-বান্ধব-ছাত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু বললেন, "মজাসে চল্ বহেঁ।" তারপর সব শেষ। রাত বেশী হয় নি—মাত্র নটা বেজে পনের। একদিন এই হাসপাতালে (সম্ভবতঃ সেই একই ওয়ার্ডে) মধুসূদনের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে ছিল—তাঁর জীবনের শোকাবহ সমাপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে রইল তাঁর ভক্ত ও ভাষ্যকার মোহিতলালের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কটি।

ঝির-ঝির নিশা-বায়
ফুল যথা মুরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি
ধরণীতে মাথা রাখি
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোন শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোনো সুন্দর পরলোক!

—মৃত্যু : স্বপন পসারী

নয়

মোহিতলালের 'উগ্রচণ্ডী' রূপের বর্ণনা অনেকেই করেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁকে বলেছেন 'হুতাশন কবি', কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেছেন, 'মনীষী তবুও একেগুঁয়ে আর রাগী, মতভেদে করে চিমটা লইয়া তাড়া' ইত্যাদি আরো অনেকের বর্ণনা থেকে মোহিতলালের কাঠিন্যের পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তার জন্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ছিলেন বদরাগী স্নেহ-প্রেম ভালবাসা-বিবর্জিত এক কার্কশ্যের প্রতীক। কিন্তু তাঁর এ পরিচয় বাইরের পরিচয়, কাঠিন্যের অন্তরালে যে কুসুম কোমল অন্তঃকরণ ছিল তার পরিচয় বড় কেউ একটা দেন নি। তাঁর এদিকের পরিচয়-প্রসঙ্গ কয়েকজনের লেখা থেকে নিম্নে তুলে দিলাম।

"অনর্গল ব'লে যাচ্ছেন, শুনে যাচ্ছি। যেখানটায় মিলত না, টুকতাম, অবশ্য সেলামেম করেই। ওঁর যাতে স্থান ছিল, তা ভিন্ন রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক বিতণ্ডা করবার চেষ্টা কিন্তু যাই নি আমি। হেসে ফেলতেন, হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বলতেন, 'না আপনি বোঝেন না, অবশ্য আমার ব্লাড প্রেসার আছে রক্ত মাথায় চ'ড়ে যায়, কিন্তু প্রত্যেক কথা যা বলছি তার প্রমাণ সংগ্রহ করা আছে আমার, গোড়া থেকেই ওদের পলিটিক্স আমি ফলো ক'রে যাচ্ছি। আমি লিখে রেখে যাব, সবাই যে এদের ভাঁওতায় ভোলে নি, ফিউচার একথা জানবে'

ওঁর বক্তৃতার (বক্তৃতাই বলি) এইটে ছিল মাধুর্য, এই হঠাৎ একটু হেসে নরম হয়ে যাওয়া, কখনও টুকে দেওয়ার ওপর, কখনও নিজে হতেই—হঠাৎ যেন সাড় হয়েছে, বড় একতরফা হয়ে যাচ্ছে আর বড় উগ্র। বলতেন, 'না, নিজের কথাই পাঁচকাহন করছি। আপনাদের খবর বলুন এদিককার।'

বেশি দূর এগুতে হ'ত না, বাঙলার দুঃখ যে ওঁকে পেয়ে বসেছে! তুচ্ছ রাজনীতি গিয়ে ঘুরে ফিরে সাহিত্যের হত অবতারণা।

শুধু আমার কথাই নয়, আর সবাইয়ের মুখেও শুনেছি, আসতে দিতে চাইতেন না।

'ন-মাস ছ-মাসে আসবেন, তাও রিক্সাওয়ালাকে ধ'রে রাখবেন। ছেড়ে দিন ওকে; আনিয়ে দোব রিক্‌শ।'"

—বাগনানে—বড়িশায়: বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

"সাহিত্য তাঁর তপস্যা। এই তপস্যা-মন্দিরে কণামাত্র অশুচিস্পর্শ না

লাগে—এই ছিল তাঁর জীবন পণ। এই জন্যই 'দণ্ডপাণি সাহিত্যিক' বিশেষণে অভিহিত করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু অমৃতনিষেকে সাহিত্যপ্রাণতা উদ্বুদ্ধ করেছেন কত ক্ষেত্রে, কজনে তার খবর রাখে? আমি একজন সাক্ষী। অপ্রত্যাশিতভাবে একদা তাঁর কাছ থেকে নির্মম অবিচার পেলাম কঠিন এক চিঠির মারফতে। কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের উপর তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তাঁর ধারণা—আমিও সেই সূত্রে জড়িত। দীর্ঘদিন চলল এমনই ভাবে। আমার প্রতি তিনি অতিমাত্রায় বিরূপ—এই জেনে বসে আছি। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত আমার এক স্নেহাস্পদ তরুণ সুদূরবর্তী স্যানিটোরিয়াম থেকে চিঠিতে জানালেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বিশ্লেষণ উপলক্ষে মোহিতলাল আমার কয়েকটি লেখার ধারণাতীত অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভালবাসায় অন্ধ আমার অতি-বড় বন্ধুও অত বেশি বলতে পারতেন না আমার সম্বন্ধে। এই ব্যাপারে অনেকের ধারণা, তাঁর সঙ্গে আমার বুঝি অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং ক্রোধ-দুঃখ মান-অভিমান একেবারে বাহুল্য ছিল তার কাছে।" —বাঙালা মোহিতলাল : মনোজ বসু।

"প্রতি পত্রে লিখতেন--হবে, আপনার হবে। নিজেকে দৃঢ় রাখুন। 'রসকলি' গল্প সংগ্রহ বের হল। বইখানি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলাম। কবিকে বই পাঠালাম, মোহিতলালকেও পাঠালাম। মোহিতলাল বই পেয়েও কিছু লিখলেন না। আমি আবার লিখলাম, আপনি 'রসকলি' সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। আবার লিখলাম। লিখলেন, 'এ সম্পর্কে আমার মতামত আমি ঘোষণা করিয়া বলিব স্থির করিয়াছি। তাহার সময় আসিয়াছে। কাগজে লিখিব। তাহা হইতেই জানিতে পারিবেন। এবং গল্পগুলি সম্পর্কে মতামত তো প্রতিটি গল্প প্রকাশের সময়েই জানাইয়াছি সুতরাং এত ব্যগ্রতা কেন?'

'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৫ সালের প্রথম দিকে। গোটা পঁয়তাল্লিশ সাল চ'লে গেল, কোথাও কোন সমালোচনা (মোহিতলালের) প্রকাশিত হ'ল না।

১৩৪৬ সালের ১লা বৈশাখ। সে দিন বেলা আড়াইটার সময় নিষ্ঠুর বেদনায় ক্ষোভে ব্যথাতুর ক্ষুব্ধ মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।...আমি দেখলাম বারান্দায় পড়ে রয়েছে ১৩৪৬ সাল বৈশাখের 'প্রবাসী'। সেই দিনই এসেছে। উল্টে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল 'রসকলির' সমালোচনা। নীচে সমালোচকের নাম মোহিতলাল মজুমদার।..

দীর্ঘ সমালোচনা। প্রতি ছত্রেই এই অকুণ্ঠিত প্রশংসার ঘোষণা।... মোহিতলালকে পত্র লিখেছিলাম। প্রশংসা সম্পর্কে সঙ্কুচিত হয়েই কিছু লিখেছিলাম।

পত্রোত্তর পেলাম—'আমার সমালোচনার মধ্যে আপনার যে প্রশংসা আমি করিয়াছি তাহাতে আপনি বেশ সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন। আমার কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। সত্যকে আমি চিরদিনই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিয়াছি। না করিলেই অন্যায় করিতাম। ইহাতে আপনার সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, আবার ইহাতে স্ফীত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেও মহাভ্রম করিবেন। সাধনা করি। চলুন

তিনি আমার গুরু। আমার জীবনসাধনায় তার কাছ থেকে অহরহ অভয়বাণী পেয়েছি। —আমার সাহিত্য-জীবন। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়।

"বাংলার সেরা জ্ঞানী ও গুণীদের একাংশের সহিত আমার গভীর প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল। আমি একজন অখ্যাতনামা আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়ী, বন্ধুগণ শক্ষ লক্ষ জ্ঞানে পরিচিত। অসম মিলন অবাস্তব হইলেও আমার পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল—মোহিতলালের ভালবাসার জন্য। তাহার সঙ্গী হইয়াই আমি কালে কালে ভারতী সমাজ, শনিবারের চিঠি ও গজেন্দ্রদার বৈঠকে কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও জ্ঞানী ও গুণীগণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি।

সত্যকার কাব্যরস থাকিলে কবিরা খ্যাতিতে না থাকিলেও তাঁহাদের সমাদর করিতেন। কবি মোহিনীর 'মিলনোৎকণ্ঠা' কবিতাটি সে সময় প্রায় দিয়া আবৃত্তি করিতেন। পরবর্তীকালে তাঁহার 'কাব্যমঞ্জুষা'য় মোহিনীদার 'স্বাগত' কবিতাটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এখানে তিনি কবির আভিজাত্য দেখিতেন না—দেখিতেন কবিতা ও কবিকে।

কবির সময়ের জ্ঞান কোনদিন ছিল না। একদিনের কথা বলি—তিনি স্কুলে যাইতেছেন আমি রোগী দেখিয়া ফিরিতেছি। দুজনের দেখা হইল আমার বাসার সম্মুখে—সুকিয়া ষ্ট্রীটের উপর। রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলাপ চলিতেছিল, পাশ দিয়া একখানা মোটর গাড়ী কাদা জল ছিটাইয়া চলিয়া গেল, বেশ খানিকটা জল কাদা কবির জামা-কাপড়ে যেন লেপিয়া দিল। চলন্ত গাড়ীর দিকে একবার তাকাইয়া নিজের পরিচ্ছদের অবস্থা দেখিলেন, তারপর

আমাকে বলিলেন—আজ আর যাওয়া হ'ল না—বলিয়া আমার গৃহাভিমুখী হইলেন। সেদিন দশটা না বাজিতে আসিলেন, যখন ফিরিলেন তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এর মধ্যে আর বিশ্রাম ছিল না, সাহিত্যচর্চা ভিন্ন প্রসঙ্গান্তরও ছিল না, আমারও কাজ কর্ম, আহার নিদ্রার ব্যাঘাত কম হইত না, তবুও ছাড়িতে পারিতাম না।

আমি যখনই তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থগুলির কোন না কোন একখানি সাদরোপহার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি

বড়িশায় আসিবার পর আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। দেখা করিতে গিয়া অতিথিসৎকারও কম পাই নাই। যখনই গিয়াছি তখনই সেটার মধ্যে 'চা' এর সঙ্গে রুটি, বিস্কুট, চিড়াভাজা, হালুয়া যা হয় একটা পাইতাম। আবার ফিরিবার পূর্বে লুচি তরকারী সন্দেশ ও পেট ভরিয়া খাইয়া আসিয়াছি।

বড়িশায় গেলে তাঁহার নিজের কাব্য বা সাহিত্যসন্দর্ভ লইয়া কেবল আলোচনা করিতেন না, যাঁহাদের লেখা ভালবাসিতেন, তাঁহাদের বই লইয়াও আলোচনা করিতেন।

মোহিতবাবুর কাছে গেলে দু'একজন সু-সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিতেন। একবার বিভূতিবাবুর বাপুর প্রথম ভাগ' এবং আরও কোন কোন লেখা নিজে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন, পাঠ করিতেও আনন্দ পাইতেন।

১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি অনেক দিন কলিকাতায় ছিলাম। কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে ২ শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। এইদিন 'সাহিত্য-বিতান' দিলেন, দু'একস্থান পড়িয়া শুনাইলেন, আমি তারাশঙ্করের লেখার সহিত বিশেষ পরিচিত নই শুনিয়া 'তারাশঙ্কর' ও তাঁহার 'কবি' নিবন্ধটি পড়িলেন, অনেক ব্যাখ্যাও করিলেন।"

-বন্ধু মোহিতলাল : জীবনকালী রায়।

জীবনকে যেভাবে চাওয়া যায় সেভাবে জীবন না এলে পৃথিবীকে মনে হয় মরুভূমি, শ্যামল দুর্বার মখমলে মোড়া দুনিয়াকে মনে হয় কংক্রীটের আস্তরণ আর কারোর যদি কবি ও শিল্পী-মন থাকে তাহলে সে তো 'সিনিক' হতে বাধ্য। মোহিতলাল ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী-মানুষ। তাঁর জীবনে প্রীতির স্পর্শ তেমন আসে নি আর যদিও কিছু কোন সূত্রে এসে থাকে তাকে উপলব্ধি করার মত মনের প্রফুল্লতা তিনি পান নি—যাকে জীবন-সংগ্রামের

নিষ্ঠুরতায় দিন কাটাতে হয় মাইনের ওপর নির্ভর করে দশটি সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিতে হয় তার মেজাজ খিটখিটে যদি না হয় তাহলে কার হবে! তাঁর সেন্টিমেণ্টাল মন বিরাট ধাক্কা খেল যখন দেখল এ সমাজে গুণের মর্যাদা নেই যোগ্যতার স্বীকৃতি নেই, আছে শুধু আর্থিক সাফল্যের মাধ্যমে কৃতিত্ব-বিচার, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের ওপর আঘাত হানতে থাকে রুচির স্থূলতা, সেখানে আত্মমুখীনতাই একমাত্র বাঁচার পথ। মোহিতলাল নির্বান্ধব অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। কেন কাটিয়েছেন তা আপনারা দেখেছেন কে, দেখেছেন তাঁর অন্তরের দগ্‌দগে ঘাকে? মানুষটা যে রূঢ় প্রকৃতির হয়ে গেল, সে তো এ প্রকৃতিকে সঙ্গে করে আনেনি। দিকে দিকে স্বার্থপর পৃথিবীর বিদঘুটে কামনার কালো রঙের ছাপ তাকে কঠিন হতে শিখিয়েছে, তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে [illegible], দেখে, যে [illegible] সেই আজকের সমাজে তত সম্মানী ব্যক্তি পণ্ডিতদের চেয়ে মূর্খ ধনীর সম্মান বেশি [illegible] মত লোককে সে পদে পদে [illegible] পারে জীবনে আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তি যদি [illegible] অর্থকরী দুনিয়ার এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, একটি রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে [illegible] সম্ভব নয় [illegible] সত্যকথাকে মালায়েম করে বলা যায়, একথা মানি জীবনে শান্তি পেতে হলে অনেক ত্যাগ করতে হয় অনেক কিছু পাশ কাটিয়ে যেতে হয় অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করতে হয়, [illegible] কান্না নয় [illegible] একথাও মানি এবং সে সঙ্গে এও মানি, যে তা না পারে সে নিজের শান্তিপথ না [illegible] তার কাছে স্নেহ প্রীতি [illegible] তিনি বলেছিলেন শ্রেষ্ঠ কবির জীবন হবে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মত অর্থাৎ তিনি যা কল্পনা করবেন কবিতায়, মনে যা ভাববেন তার বাস্তবরূপ নিজের জীবনে ধরে রাখা চাই। মোহিতলালের আদর্শ ছিল তাই সাহিত্যে অনুপ্রাণিত জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। এ সমাজে যখন তা সম্ভব হল না তখন তিনি কঠিন রুক্ষ-মেজাজী হয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর কাছে অনেকেই আঘাত পেয়েছেন কিন্তু অন্তর থেকে কাউকে চটাবার ইচ্ছে ছিল না। শুধু নিজের আহত মনকে আবৃত করে রেখেছেন রূঢ়তার আবরণে। কেউ যদি তাঁর কাঠিন্যকে ভেদ করে একটু জমিয়ে নিতে পেরেছেন তাহলে তিনি দেখেছেন সারা পৃথিবীর দিকে খুশির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনার কাছে নিজের অন্তরকে খুলে দিয়েছেন।

সাহিত্য বিষয়ে সংলাপ ও বাগান রচনা করার দিকে মোহিতলালের

প্রধান আগ্রহ ছিল। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি বিখ্যাত rosarian হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া ঋতু-নির্বিশেষে বিভিন্ন ফুলের নানা বর্ণসমাবেশে রমণার নীলক্ষেত পল্লীতে বাসা-সংলগ্ন বাগানকে সর্বদা সজ্জিত করে রাখায় তাঁর বাগান বহুবিখ্যাত লোকের নিকট আকর্ষণের বস্তু ছিল। তাঁর স্বল্প আয়ের অধিকাংশ বই-কেনা ও গোলাপ-চাষে ব্যয়িত হত। শেষ জীবনে তাঁর ইচ্ছে ছিল 'গোলাপী আলাপ' নামে গোলাপের চাষ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করবেন।

মোহিতলাল খুব চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর বাড়ীতে কিংবা তাঁর সঙ্গে কারোর দেখা হলেই নিজের কবিতা কিংবা অপরের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। যখন যৌবন ছিল—সেই ভারতী-কল্লোল কালীন যুগে—সেই সময় তিনি পদব্রজে চলেছেন, পকেটে কবিতা রয়েছে, সন্ধ্যা নেমেছে কলকাতার পথে, হঠাৎ কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা অমনি ফুটপাতের ওপরে একটি গ্যাসপোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে কবিতা পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। স্থান ও সময়ের সীমাবোধ সম্বন্ধে উদাসীন হয়েই একের পর এক কবিতা দাঁড়িয়েই আবৃত্তি করে চললেন। বাড়ীতে গেলে কবিতার খাতা কিংবা বই সামনে রেখে চোখ দুটি বন্ধ করে সুরের তালে দুলে দুলে কবিতা আবৃত্তি করতেন। বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে দেখতে দেখতে একটি সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়ে যেত—তার মধ্যে কবি আপন কাবস্বপ্নের ধ্যানে যেন আত্মসমাহিত হয়ে যেতেন, ঢাকা ও কলকাতা বেতারকেন্দ্রে আবৃত্তি করার জন্যে আমন্ত্রিত হতেন। আবৃত্তি সম্পর্কে তিনি বলতেন, "কাব্য বা সাহিত্য উত্তমরূপে আস্বাদন করিতে হইলে তাহার বাক্যধ্বনি বা ছন্দ কানে শুনিতে হইবে, এবং পাঠ করিবার সময়ে যথাসম্ভব ভাষার সেই ধ্বনিগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পড়িতে হইবে, নহিলে সাহিত্যের বারো আনা রস নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অতিশয় সত্য; মহাকবি গেটে বলিয়াছেন—'The living word may best be communicated by reading aloud.' অর্থাৎ কবিদের জীবন্তবাণী উচ্চকণ্ঠে পঠিত হইলে অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে।...ভাষার আসল রূপ তাহার ধ্বনি; এই ধ্বনির সৌন্দর্য যদি কানে না ধরা দেয় তবে প্রাণের রসে ভাষা রসায়িত হইতে পারে না—এইজন্যই বোধহয় কোন সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচক বলিয়াছিলেন, 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

সাহিত্য বিষয়ে আলাপ আরম্ভ হলে সময়ের মাত্রা হারিয়ে বসতেন।

সাহিত্যের কথা উঠলে দশজনের মধ্যে তিনি একাই মুখর হয়ে উঠতেন। তাঁর বাচনভঙ্গী 'প্রভুসম্মিত'। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁদের তিনি ছাত্র মনে করে অধ্যাপনার মনোভঙ্গী নিয়ে নিজেই কথা কয়ে যেতেন। বৈঠকী আলাপে শ্রোতারা উপলক্ষ হয়ে থাকত—ফলে শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁর আড্ডা জমত না, তিনি তাঁর নিজের কণ্ঠকেই ভালবাসতেন, আলাপ হত একতরফা। অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস-রচিত 'The Autocrat of the Breakfast Table' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের অনুবাদ তিনি করেছিলেন। ঐ 'এক-বক্তার' সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-প্রকৃতি ও সাহিত্যিক জীবনের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। 'এক-বক্তার' মত তিনিও সর্ববিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অবাধ স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। বৈঠকী আলোচনায় তাঁর এই ভঙ্গিমাটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হত।

তরুণ সাহিত্যসেবীরা মোহিতলালের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁদের রচনাদি আগ্রহ সহকারে শুনতেন, দোষত্রুটি সংশোধন করে দিতেন, প্রকাশিত রচনার খোঁজ খবর নিতেন যাঁদের মধ্যে শক্তির কণামাত্র আশ্বাস দেখতে পেতেন তাঁদের তিনি উৎসাহ দিতেন। সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে নতুনদের যে কয়টি সরল ও সুস্পষ্ট উপদেশ দিতেন তা হল এই—

"১. যাহা লিখিবে তাহার ভাব নিজস্ব কিনা এবং ভাষা বিশুদ্ধ ও যথোপযুক্ত হইয়াছে কিনা, সে বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে।

২. কাহারো মুখ চাহিয়া লিখিবে না, ফ্যাসনের অনুবর্তী হইবে না।

৩. সুলভ যশকে ঘৃণা করিবে।

৪. দিনে যতটুকু লিখিবে তাহার অনুপাতে পড়িবে অনেক বেশী। যদি এক পাতা লেখো, তবে অন্ততঃ কুড়ি পাতা (উৎকৃষ্ট গ্রন্থ) পড়িবে।

৫. সেই পড়ার ব্যাপারেও নিজের স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিবে ভাবগ্রাহী হইবে, কিন্তু অনুচিকীর্ষু হইবে না। সকলকে শ্রদ্ধা করিবে, কারণ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ হইবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রতিও শ্রদ্ধা রাখিবে।

৬. সাধনার প্রথম অবস্থায় আত্মগোপন করিবে—প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে না। কারণ আদর্শ যদি সত্য হয়, তবে সেই আদর্শে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক; এজন্য নিজের রচনা নিজেরই মনঃপূত হয় না, তাই প্রকাশ করিতে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ হয়। ইহা একটি সুলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

"তাই বলিয়া লিখিতে বিরত হইবে না – রাশি রাশি লিখিবে ও ফেলিয়া দিবে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সতীর্থগণকে দেখাইবে—তাহারা সুখ্যাতি করিলে সুখী হইবে বটে কিন্তু সেই সুখ্যাতিকে যথার্থ সমালোচনা মনে করিয়া উৎফুল্ল হইবে না।"

নতুন লেখকদের জ্যাঠামি তিনি পছন্দ করতেন না। ভূমিকা, আশীর্বাদ পরিচায়িকা ইত্যাদি লেখার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন, কারোর সার্টিফিকেট নিয়ে কোন লেখক বড় হতে পারে না, যারা করে তাদের শক্তির দীনতাই প্রমাণিত হয়। ভূমিকা বা পরিচায়িকা লেখার অর্থই হল অক্ষম লেখকের আমড়াগাছি করা। লেখক দাঁড়াবেন নিজস্ব শক্তির ওপর, ঠেকা দেওয়ার জন্যে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠিতদের দরকার কি? সাহিত্যে অহেতুক backing-গিরি তিনি পছন্দ করতেন না। খাতিরে কিংবা ভয়ে লোকপ্রিয় হবার আকুলতায় দুটো 'মিছে' কথা মিষ্টি করে বলার প্রকৃতি তাঁর নয়। যাঁরা তাঁর কাছে ভূমিকা বা প্রশংসা প্রার্থনা করতেন তাঁদের তিনি চিঠি মারফৎ নিজের অক্ষমতা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ এখানে দেয়া হল—

"আপনার পত্রে জানিলাম, আপনি আমার নিকট হইতে একটা অনুকূল অভিমত চান, বিজ্ঞাপনের সুবিধার জন্য। ইহাতে আমি একটু বিব্রত বোধ করিতেছি।"—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে লিখিত।

"লেখকের আবেগ আছে কিন্তু কবিত্বশক্তি এখনও পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই। ভাষা ও ছন্দের উপরেও অধিকার হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় সাধনা বজায় থাকিলে অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হইবে। ·· উৎসাহ দিবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, ভূমিকা লিখিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ. এ পর্যন্ত তাহা করি নাই—আমার পক্ষে তাহা শোভন নয় বলিয়াই করি নাই—কাব্য-সাহিত্যের যে আদর্শ আমি কঠিনভাবে ধরিয়া আছি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচার করিয়াছি, তাহাতে ব্যক্তিগত স্নেহ-সহানুভূতির উপায় নাই। এজন্য আপনার অনুরোধও রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে কিছু করিবেন না।"

—জীবনকালী রায়কে লিখিত।

তাই তিনি কোন লেখকের বইয়ের ভূমিকা কিংবা পরিচায়িকা পারতপক্ষে লিখে দেন নি, কিংবা ছকমাফিক প্রশংসা উচ্চারণ করেন নি। যাঁদের জন্যে তিনি লিখেছেন তা তাঁর সাহিত্যাদর্শের মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছিল বলেই

সানন্দে তাদের অভিবাদন জানিয়েছেন। যেমন—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'তরঙ্গ' নাটকটি পড়ে তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে অযাচিতভাবে চিঠি-মারফৎ দিগিনবাবুকে 'বঙ্গদর্শনে' একটি বাস্তবধর্মী নাটক লেখার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন, "'তরঙ্গ' নাটকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। আপনার বাস্তব দৃষ্টির দৃঢ়তার পরিচয় আছে নাটকে গতি আছে, তাপ আছে, স্ফুলিঙ্গ আছে।" যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন, "বইখানি পড়িয়া আমাদের মত 'বিশ্বনিন্দুক ও মুগ্ধ হইয়াছে। রচনার আরও দুইটি গুণ আছে একটি লেখকের অতিশয় সপ্রতিভ চিন্তা, আরেকটি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ রসবোধ—ইংরেজীতে যাহাকে sense of humour বলে। বইখানি পড়িতে পড়িতে আরও মনে হয়, ইহার পশ্চাতে একটি সুশিক্ষিত, সুমার্জিত ও সংস্কারমুক্ত মন রহিয়াছে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, আর্ট সমালোচনা ও সাহিত্য—সকলই অতিশয় সহজভাবে ইহার মধ্যে চলাফেরা করিতেছে—বৈঠকী আলাপের মতই সুখসেব্য হইয়াছে। হয়ত লেখক একটি বিশেষ বিদ্যার চর্চায় ঐ সকল অধিগত করিয়াছেন, কিন্তু সেই বিদ্যাকে এমন সাহিত্যিক রস-রচনায় নিযুক্ত করিতে এ পর্যন্ত কেহ পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। (কার্তিক ১৩৫০) বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত অধিকাংশ বইয়ের তিনি সমালোচনা করতেন না। বঙ্গদর্শনে স্পষ্টই লিখে দিতেন, "আমাদিগকে যাঁহারা সৌজন্যবশতঃ পুস্তক উপহার পাঠান তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবেই পাঠান, 'বঙ্গদর্শনে' সুপারিশ করিবার জন্য নহে। যে সকল পুস্তক সমালোচনা করিবার প্রয়োজন আছে, আমরা তাহা নিজেই নির্বাচন করিয়া সমালোচনা করিব—তাহাও পুস্তক-সমালোচনা নয়, সাহিত্য-সমালোচন' সাহিত্যের আদর্শের প্রতি তাঁর এরকম নিষ্ঠা থাকার জন্যে সাধারণ্যে তাকে জনপ্রিয় করে নি পক্ষান্তরে তাঁকে অপ্রিয়ই করেছে। কিন্তু তাঁর শক্তিকে অস্বীকার করতে পারে নি। এ সম্পর্কে তিনি এক পত্রে লিখেছেন—

"সত্যকে ন্যায়কে, আমি প্রাণপণে ধরিয়া রাখিয়া যাইলাম বন্ধুর বন্ধুত্ব, আত্মীয়ের মমতা, সমাজের আদর, বড়লোকের অনুগ্রহ, ভক্তের তোষামোদ—কিছুই আমাকে বিচলিত করে নাই। আমার শত্রু অনেক। আমাকে সকলে ভয় করে, কেহ স্নেহ করে না, আমাকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত ও আমার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য সকলেই উৎসুক, কিন্তু কেহ আমাকে তুচ্ছ করিতে পারিল না—আমার শক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমার জীবনের

বিশেষতঃ সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্যে কি গদ্যে কি পদ্যে আমার স্থান কি তাহা আমি জানি ও ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও তাহা জানিবে; কিন্তু আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছি—কাহারও মনোরঞ্জন করি নাই বলিয়া কেহ আমার প্রাপ্য দিল না—যাহা দেয় তাহা বাধ্য হইয়া, কিন্তু তাহাতে আমার দুঃখ নাই।"

—শ্যামসুন্দর মাইতিকে লিখিত।

সমসাময়িক সমাজের সহিত তাঁর হৃদ্যতা যে ছিল না এ চিঠিই তার প্রমাণ।

তাঁর সাহিত্যানুরাগের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর নিষ্ঠা। তিনি জানতেন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সুলভ নয়, তার জন্যে রীতিমত মূল্য দিতে হয়। সে-মূল্য তিনি পুরোমাত্রায় দিয়েছেন। তাঁর নিষ্ঠা তাঁকে তাঁর বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিল—তার বাইরে তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে তাঁর শুশ্রূষাকারীদের নিকট জানা যায় যে কঠিন রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা করতে চেষ্টা করতেন। পিতৃদত্ত নামেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি, তিনি 'সত্যসুন্দর দাস' নাম নিয়ে জীবন সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। সাহিত্যে কোনোক্রমেই অশিব ও অশুভ কিছু প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে মোহিতলালের ছিল আমৃত্যু প্রচেষ্টা। এই নিয়ে বহু ব্যক্তির সহিত তাঁর মতান্তর ঘটেছে, এমনকি সেই মতান্তর মনান্তরে পর্যবসিত হয়েছে কিন্তু সাধন-ক্ষেত্রে কোন একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি বিচলিত হয়ে নীতিভ্রষ্ট হন নি। সাহিত্যকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিকে ভালবেসেছেন। ভালবাসার অভিব্যক্তি কিছু রূঢ় হলেও তার মধ্যে কোথাও খাদ ছিল না। তিনি বলতেন, "আমি পেশাদার সাহিত্যিক নই অর্থাৎ সাহিত্য আমার জীবিকা নয়। আমি সাময়িক পত্রের যে সাহিত্য সে সাহিত্যের লেখক নই। সাহিত্যিক সামাজিকতা বা শৌখীন সাহিত্যচর্চাও আমি কখনও করি নাই। ...আমি নিভৃত নির্জনে ধর্মসাধনার মত সাহিত্য-সাধনা করিয়া থাকি।" —নলিনীকুমার ভদ্রকে লিখিত। তাই সাহিত্য তাঁর কাছে 'not so much an end in itself but as a means to a farther end, which was national, not individual,' দেশ ও জাতির জন্যে নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে এমন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আমাদের ইতিহাসে বিরল।

দশ

শেষে বড় দুঃখের সঙ্গে বলে যাই, বাংলা ও বাঙালীর দুর্দিনে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আমরা করি নি বরং তার অবমাননা করেছি অনেক ক্ষেত্রে। বাঙালী যখনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে জেগে উঠেছে তখনি সে পূর্বকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেকে চিনেছে। যাঁরা একদিন তাকে চেনাতে চেয়েছিলেন তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে লাঞ্ছনা উপহাস আর অশ্রদ্ধা, নিজেকে চেনার পর তাঁদের মহত্বকে সে সম্মান দিয়েছে। একালের আবহাওয়ায় মোহিতলালকে আমরা ভুলই বুঝে গেলাম, তাঁর মনোভাব অনুদার ও সংকীর্ণ বলে ত্যাগও করে গেলাম। জন্মভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণে যিনি জীবন উৎসর্গ করে গেলেন জাতির জীবনে তিনি স্থান পেলেন না—দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু একদিন যদি আমাদের এ পথ ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়, বাঙালীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা যদি জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে না পেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে দৃঢ়ব্রত হয় তাহলে সেদিন উত্তরপুরুষের কাছে জবাবদিহি দেয়ার জন্যে আসামীর কাঠগড়ায় মোহিতলাল এসে দাঁড়াবেন না, দাঁড়াতে হবে আমাদের, যারা বাঙালীত্বকে অস্বীকার করে একজন আদর্শবাদী বাঙালীকে পরিহাস করেছিল॥

কবি মোহিতলাল

বাঙলা দেশের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের বাইরে কবি হিসেবে মোহিতলাল খুব বেশী পরিচিত বলে মনে হয় না। পরিচিত না হবারও কারণ আছে যথেষ্ট। প্রথম ও প্রধান কারণ হল, মোহিতলাল কবি। গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তা যতটা সুলভ ও সহজলভ্য, কবির জনপ্রিয়তা আদৌ তা নয়। তাছাড়া রস-সাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা পিছিয়ে আছে তাদের মন পাবার জন্যে সাহিত্যের ঘন রসে তাদের সুর আমদানী করেন নি, তাদের কথা নিয়ে তাদেরকে উদ্দীপিত করে তোলেন নি, সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য কবিতা পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখেন নি। তাঁর কাব্য প্রধানতঃ মননধর্মী, আপাতপাঠে তা রীতিমত জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং মোহিতলাল যদি কাব্য-সাধনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে না থাকেন তাহলে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছুই নেই। তবে জনপ্রিয়তাই সাহিত্য-বিচারের একমাত্র সুনিশ্চিত কুল-লক্ষণ নয়। যদি সাময়িক সস্তা জনপ্রিয়তাই প্রতিভা যাচাই করার নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হত তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর কবি অসাহিত্যিক কারণেই মহৎ কবি হিসেবে অভিনন্দিত হতেন। শিথিল জনমত বা কালের সাময়িক বিকৃত রুচি অনুযায়ীই বর্তমানের অনেক কবি বা সাহিত্যিকরা সাহিত্য-সাধনা করে বাজীমাত করেছেন। কিন্তু এই শিথিল সাহিত্য-সাধনার দেশে মোহিতলাল ছিলেন ব্যতিক্রম। তাই তিনি জনপ্রিয় নন। না-হলেও তাঁর আত্মমুখীন, স্বাতন্ত্র্যধর্মী, অপূর্ব সুন্দর কাব্যসৃষ্টি যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে এ সত্যটি সর্বজন স্বীকৃত।

মোহিতলালের কাব্যবস্তু ও কাব্যভঙ্গী আধুনিক যুগোপযোগী কি না তা নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তাঁর কাব্যের ধারা ও পরিণতি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব। কিন্তু তা করার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। আধুনিক যুগে সাহিত্য-বিচারের একটা নতুন মাপকাঠি উঠেছে। মানব-জীবনের অন্তহীন সমস্যাকে অবলম্বন করেই কাব্যের তথা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বেদনা-বিক্ষুব্ধ জগতে ছিন্নমূল মানবতার করুণ কাহিনী, ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস, অনাহারের অব্যক্ত বেদনা, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার

যাঁতাকলে পিষ্ট গলিত সমাজ-ব্যবস্থার বীভৎস রূপ—এ সবই সাহিত্যে সজ্ঞানভাবে রূপায়িত করতে হবে। আগামী দিনের সত্যকে, জন্মের বেদনায় বিহ্বল তথ্যকে উন্মুখ করে তুলতে হবে, জনগণকে অত্যাচার ও অনাচারের জ্বালামুক্ত এক প্রশান্তিময় জগৎ-সৃষ্টির পথ-নির্দেশ দিতে হবে, তাদের জড় চেতনাকে আঘাত করে সেই রাস্তায় চলার মন্ত্র দান করতে হবে। তাই আজকের দিনে সাহিত্যের মূল্য নির্ধারিত হবে সমাজ-জীবনে তার কার্যকারিতা দিয়ে। তাই আজকের দিনে প্রেম ও প্রীতির স্বর্গীয় লালিত্য, চন্দ্র ও বসন্তের অপার্থিব সৌন্দর্য, চামেলি ও যূথিকার দেহহীন লাবণ্য-বিলাস অথবা কোকিলের কূজন ও ভ্রমরের গুঞ্জন নিয়ে কবিতা-রচনা মানস-বিলাসের নামান্তর। এই দিক দিয়ে মোহিতলালের কাব্যকে যদি বিচার করা যায় তাহলে নিঃসংশয়ে বলতে হয় কাব্যে কোথাও মোহিতলাল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝাবর্তে তিনি মাথা ঘামান নি, তাই তাঁর কাব্য যুগধর্ম-পরিপন্থী। আধুনিকতার এই মতকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু এই মত সম্পূর্ণভাবে এখনও গ্রহণ করতে পারি নে। প্রতিবাদে বলতে পারি, কবি আর সাহিত্যিক যদি রাজনীতিকের কাজ গ্রহণ করেন, তাহলে রাজনীতিকের সঙ্গে কবির পার্থক্য রইল কোথায়? মহৎ সৃষ্টি যাঁরাই করেন তারাই নির্মানব, এমার্সন বলেছেন, "Every literary man should embrace solitude as a bride." মোহিতলালের সাহিত্যিক আদর্শ ছিল সাহিত্যের আদর্শে আত্মোপলব্ধি। 'Man cannot live by bread alone'—রুটির পরও মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, কামনা আছে, স্বপ্ন আছে যা আদিযুগ হতে আজ পর্যন্ত নির্বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—সেই বাস্তবতম প্রবৃত্তিকে অনুভূতির প্রকাশ-কলায় মোহিতলাল তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত করেছেন। তবে এ কথা সত্যি, কাব্যকে যুগ থেকে রসের নির্যাস গ্রহণ করতে হবে কারণ যুগপ্রভাব হতে ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও নিস্তার নেই। যে কাব্য তা করে না সে কাব্য উত্তরকালিক বিচারে ঠাঁই পায় না কারণ সাহিত্যের যে কালোত্তীর্ণ রস আছে, সে-রস জন্মায় কালকে স্বীকার করেই—কালকে অস্বীকার করে নয়। মোহিতলালের কাব্য যুগধর্ম-পরিপন্থী হলেও যুগধর্মী। কারণ যে সময় মোহিতলালের আবির্ভাব সে সময় বৈদেশিক রাজশক্তির শাসন-ও শোষণে একদিকে সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক-বাহক মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমিক অবক্ষয় অপরদিকে শ্রমিকতন্ত্রের ক্রমিক উদয়। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিক্ষোভী

[illegible]

[illegible]

মন্দার ছায়া পড়েছে, অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে এসেছে নতুন আদর্শ—পরিবর্ত্তনের সুর সংক্রামিত হয়েছে জীবন থেকে সাহিত্যে। এর ফলে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনে একদিকে দেখা দিয়েছে আশাবাদের বাস্তবতা—আরেক দিকে দেখা দিয়েছে নৈরাশ্যের স্বপ্নালুতা। একদল কবি বস্ত্যামাটি ও ফণি-মনসার স্বপ্নে মশগুল, আর একদল সেই নেতিধর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। মধ্যবিত্ত-মানসের এই দ্বান্দ্বিক মুহূর্তে মোহিতলালের আবির্ভাব, সমকালীন যুগের আবহাওয়ায় তাঁর কাব্য নিঃশ্বাস নিয়েছে—একাধাবে স্বপ্নালুতাব রেশ, অন্যধারে বাস্তবতার আবেশ, কিন্তু তা কবির বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করে রচিত। ফলে যুগের অনুভূতি সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণুতাব পথে এগোন নি তিনি, বিপ্লব-বিলাসীও হয়ে ওঠেন নি। তাঁর কাব্য যুগের সম্পূর্ণ বাহ্য ও অপেক্ষাকৃত অগভীর লক্ষণগুলিকে নিয়ে সুর তৈরী করে নি, যুগের অন্তরের মূলকথাটিকে বৃহৎভাবে প্রকাশ করেছে। বিমলচন্দ্র সিংহ বলেছেন, "বর্ত্তমান যুগের তপ্ত ঝড় তাঁর মনেও লেগেছিল, কিন্তু তিনি তা হতে উদ্ধারের আশায় ভবিষ্যতের দিকেও মুখ ফেরান নি, মরুভূমিকেও সত্য বলে স্বীকার কবেন নি। মরূদ্যানের কাব্যও তাঁর নয়, ভবিষ্যতের আশায় মরুভূমিকে স্বীকার করাও তাঁর ধর্ম নয়। তাঁর প্রাণবত্তার প্রাচুর্য আছে এবং সেই প্রাচুযে তিনি মরুভূমিকেই সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন।" (সমাজ ও সাহিত্য)। রবীন্দ্র-সাহিত্য যে-অর্থে যুগধর্মী সেই ব্যাপকতর অর্থে মোহিতলালের কাব্যও যুগধর্মী।

দুই

'কল্লোল-যুগ'কে আমরা যদি বাংলা-সাহিত্যের যুগান্তর বলে ধরে নিই তাহলে এ কথা বলব, সে-যুগান্তর যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি, আদর্শ ও ভঙ্গীর অনুসরণে বাংলা সাহিত্য যখন গতানুগতিকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তখন 'কল্লোল'-এর লেখকেরা জানালেন এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, প্রবর্ত্তন করলেন এক উজ্জ্বল জীবনধারার। সেদিন কথা-সাহিত্যে শৈলজানন্দ, কাব্যে মোহিতলাল শরীরী প্রেমের রোমান্টিক চিত্র উপস্থিত করেছিলেন, রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁরা দীর্ঘ সাহিত্যসাধনায় এমন একটা কিছু দিয়ে গেলেন যাকে 'রবীন্দ্রোত্তর-সাহিত্য' বলা হয়—কাব্যে মোহিতলাল-নজরুল-

যতীন্দ্রনাথ-প্রেমেন্দ্র, কথা-সাহিত্যে শৈলজানন্দ-তারাশঙ্কর-অচিন্ত্যকুমার-মানিক-বুদ্ধদেব এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন ও নবতর সৃষ্টির গান এঁদের কণ্ঠেই বিভিন্ন সুরে মন্দ্রিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মোহিতলাল একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তী দিনের কবিরা নতুন পথে পা বাড়াবার সাহস পেয়েছেন। এদিক থেকে তাঁকে আধুনিক বাংলা কবিতার নেতা বলতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাংলা-কাব্যের কোনো আলোচনাতেই মোহিতলালের উপযুক্ত উল্লেখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আর তাঁর কাব্য-সাধনা মিথ্যে হবার নয় কারণ উৎকৃষ্ট প্রতিভার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যুগ ও কালকে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করে। তাই বাঙালী পাঠক-সাধারণকে একদিন না একদিন মোহিতলালের কাব্য-ধর্মের যথার্থ মূল্য দিতে হবে।

জীবন-রসিক মোহিতলাল প্রকাশ করেছেন ভোগবাসনার এক বিচিত্র তথ্য। কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান্ বলেছিলেন—

A little while we die—
Shall not life thrive as it may,
For no man under the sky
Lives twice out-living his day.

কাজেই এক জন্মের সীমাবদ্ধতাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে নারীর দেহ হতে নিঙড়ে নিতে হবে সমস্ত সম্ভোগপূর্ণ সুধা-মাধুর্য। মোহিতলাল এই কথাই বাংলা কাব্যে অসঙ্কোচে প্রকাশ করে একটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনদর্শনের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর জীবন-দর্শনের মূল তত্ত্ব হচ্ছে, পৃথিবীর যা-কিছু ভালোমন্দ তার সম্ভোগ-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জীবনকে সৎ ও সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নারীকে তিনি মনে করেছেন ভোগেরই উপকরণরূপে—তার আত্মা বা হৃদয় আছে বলে তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি মাটির পৃথিবীতে মাটির প্রতিমা ভালবাসা দিয়ে গড়েছেন। 'আমার দেবতা সুন্দর সে যে, পূজা নয়—ভালবাসি।' নিরাকার নভোচারী স্বর্গীয় প্রেমের মাহাত্ম্য বা ন্যাকামি প্রচার করে আমাদের দৃষ্টিকে তিনি ধোঁয়াটে করেন নি। দেহ-কামনা সম্পর্কে প্রাচীন বাঙালীর নাক-সিঁটকানো মনোভাব ছিল না। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ,' বৈষ্ণব-সাহিত্য, ভারতচন্দ্রের

রচনাবলীতে কামনার প্রাকৃত রূপের নজিরের অভাব নেই। মিশনারী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আদিরসের ধারা শুকোতে আরম্ভ করল। ঈশ্বর গুপ্ত যদিও-বা কিছু প্রশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু তাঁর শিষ্য নীতিবাগীশ বঙ্কিম একে একেবারে পরিহার করে চললেন। রবীন্দ্রনাথের দেহ-কামনা শেলীর সৌন্দর্য-পিপাসার রূপান্তর। দেবেন্দ্রনাথ সেন আত্মবিভোর কবি, গোবিন্দ দাসের রূপতৃষ্ণা ঘরোয়া ও স্থূল—তার মধ্যে কল্পনার ঐশ্বর্য কম। এঁদের দু'জনের কণ্ঠ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী আওয়াজ তুলতে পারল না। এঁরা মিইয়ে গেলেন বর্ষাকালের মুড়ির মত। বাঙালীর লুপ্ত ঐতিহ্যকে সবলে ফিরিয়ে আনলেন মোহিতলাল। প্রাচীন কবিরা যেখানে রূপতৃষ্ণাকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে চালিত করেছেন সেই রূপের বেদীতে তিনি ভোগের শিখা জ্বালিয়ে দিলেন। যেখানে শুচিবায়ুগ্রস্তদের কাছে মুখ ছাড়া নারীদেহের বর্ণনা বা প্রেমের ব্যাপারে কেন্দ্রস্থল শরীর হলেও প্রেমের শারীরিক ক্রিয়ার বর্ণনার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল সেখানে মোহিতলাল পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে দেহ-কামনার আরাধনা করলেন। এদিক দিয়ে তাঁর কাব্য বিদ্রোহ-লক্ষণাত্মক। নারীবিদ্বেষী দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের উদ্দেশে তিনি বললেন—

> সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার!
> যূপবদ্ধ পশু আমি!—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
> তপ্ত শোণিতের ধারে?—না, না, সে যে মধু'র উৎসার!
> দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার!
>
> —পান্থ : বিস্মরণী

মোহিতলাল প্রেমের ভোগ-প্রবৃত্তিকে দমন করে বাসনাকে জয় করতে চান, দেহাশ্রয়ী কল্পনাতে অধ্যাত্ম-সাধনাকে সরিয়ে রাখতে চান। যেমন, দেবতার পায়ে মন-প্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করে সমাগত ভক্তবৃন্দের সামনে নৃত্যের দ্বারা লীলা-রস পরিবেশন করে যে সব দেবদাসী ব্যাবহারিক জীবনে সেই রস আস্বাদন করার অধিকার তাদের নেই—এই প্রেমহীন শিল্পচর্চা মোহিত-লালের কাছে ধর্মীয় সত্য হতে পারে কিন্তু জীবনের সত্য নয়। আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকে স্বাদের দ্বারা গ্রহণ করতে হয়, নিজেকে বাদ দিয়ে দূর থেকে ভক্তির দ্বারা গ্রহণ করার মধ্যে সত্য নেই। 'দেবদাসী' কবিতার মত সুগভীর মর্মবেদনার অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রকাশময় কবিতা বাংলা

সাহিত্যে খুব কমই আছে। তাই তাঁর কবিতা প্রকাশ হবামাত্রই রসিকমহলে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে।

মোহিতলালের এই দেহাত্মবাদ কাব্য-সৃষ্টির বিচারে যেমন অনেকাংশে রবি-প্রভাবমুক্ত, ভাষা-বিন্যাসের দিক থেকেও তেমনি অনেকখানি নিজস্বতার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ হচ্ছে ওইখানে, যেখানে রবীন্দ্র-কাব্য প্রেমের ক্ষেত্রে দেহবাদের বিরোধিতা করেছে। প্রেম ও সৌন্দর্য-সম্ভোগের ক্ষেত্রে স্থূল দেহকেন্দ্রিকতা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নি, এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের সন্ন্যাসী-কবি। রবীন্দ্রনাথ 'উজ্জীবন' কবিতায় ভোগপিপাসু কামনা যা আছে তা ধ্বংস হোক, দেহের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রান্ত হয়ে ত্যাগে, বীর্যে, মহিমায় ও শিল্প-রূপায়ণে সমুজ্জ্বল যে প্রেম তা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক—এই কথাই বলতে চেয়েছেন।—

ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্র-বহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি-তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা মূঢ়, যাহা রূঢ় তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু বাবের তনুতে লহ তনু।

—মহুয়া

নিছক সৌন্দর্য-ধ্যান একেই বলে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-জীবনে এই আদর্শের বিচিত্র প্রকাশ আমরা দেখেছি। মোহিতলাল বললেন—

—মানবী-অধর সীধু যে রসনা করিয়াছে পান,
অমৃত-পায়স তার মনে হ'ল ক্ষারকটু প্রলেহ-সমান।

—নাগার্জুন : হেমন্ত-গোধূলি

রূপের এই পার্থিবতা মোহিতলাল মনে-প্রাণে বরণ করে নিয়েছেন। তিনি তাই সৌন্দর্যের সংসারী-কবি। রবীন্দ্রনাথের নারী অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা আর মোহিতলালের নারী সম্পূর্ণ রক্তমাংসের নারী—

নও গৃহিণী, নও ঘরণী—সেইটি যে গো সকল ভুলের ভুল!
সংসার ত' তারেই বলে—নিত্য-ঝরা পলকা বোঁটার ফুল!

একটু আছে গন্ধ-মধু, তাতেই করে অমর—
পরশ-মণির পরশ সে যে—বধূ-বরের অধর !

—মৃত-প্রিয়া : বিস্মরণী

এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মুরতি !
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি আর আছে সতী—
দম্পতি নাহিক কোথা !

রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু মোহিতলালের কাছে ইহকালই সর্বস্ব। একালের পর আর কোন কালের ওপর তাঁর চাওয়া বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার দাবী নেই, তিনি এক জন্মেই লুটে নিতে চান পৃথিবীর আনন্দ-বেদনাকে—

আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে জ্বলুক অসীম রাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি।

—কামনা · স্বপন-পসারী

রবীন্দ্রনাথের মত বা বেদান্ত-সাংখ্য-দর্শনের নিয়মানুযায়ী রূপকে তিনি দূর থেকে আরতি করেন নি, অরূপকে তিনি কামনা করেন নি, বুদ্ধের মত নির্বাণ তিনি চান নি, মানুষ জীবনে যা ভোগ করে তাকেই মোহিতলাল কামনা করেছেন। তাই তাঁর রচনায় একটি সতেজ সুন্দর যৌবনের চিত্র পেয়েছি। বুদ্ধদেব বসুর কথায় বলা যায়, "আমাদের আধুনিক কাব্যে মোহিতলাল একটি শাক্ত সুর লাগিয়েছিলেন, তাঁর শক্তি-সাধনা দর্পিত পেশীতে-পেশীতে প্রকট, পরিস্ফীত শিরায়-শিরায় দৃশ্যমান।" (—কালের পুতুল)। অবশ্য মোহিতলালের জৈবিক বাস্তবতা ও যৌন আত্মরতির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় গোবিন্দদাস ও বিদেশী কবিদের রচনায়। নারী সম্পর্কে গোবিন্দদাস স্পষ্টই বলেছেন—

আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস-সহ
অমৃত সকলি তার— মিলন-বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।
... ...

তোমাদের রীতি-নীতি
বুঝি না পবিত্র প্রীতি

তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ ?
আমি তাই ভালবাসি অস্থি-মাংস-সহ।

—আমার ভালবাসা : গোবিন্দ-চয়নিকা

বিদেশী লরেন্সীয় জীবনদর্শন—If we can exchange our ideas, why can't we exchange our feelings ? এ সব কবিদের প্রভাব তাঁর ওপর পড়া সত্ত্বেও এমন একটি নিজস্ব সুর তিনি আমদানী করেছেন যাতে মনে হয় ওসব প্রভাব যেন তাঁর ওপর দক্ষিণ মেরুর ওপর উত্তর মেরুর প্রভাব। আর প্রভাবের দিক থেকে বিচার করলে জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির ওপর অন্য কোন কবির প্রভাব কিছু না কিছু পড়েছেই। এমার্সন যেমন বলেছেন, 'সব ভাবই প্লেটোর কাছে ধার করা', সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেছেন, 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'; রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশ' কবিতায় বলেছেন, সব কবিতাই আদিকবির উচ্ছিষ্ট। কবিদের কার ওপর কোন্ কবির প্রভাব পড়েছে সেইটিই বড় কথা নয়, বড়ো কথা হল সে সব প্রভাবকে ছাপিয়ে কবি কোনো স্বকীয়তা দিতে পেরেছেন কি না। সে-স্বকীয়তা-রূপায়ণে শিল্পানুভূতি কতখানি চরিতার্থতা লাভ করল, সে-রচনা কতদূর রসোত্তীর্ণ হল সেটিই সাহিত্যের জাতবিচারের উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে মোহিতলাল মৌলিকত্ব দেখিয়ে কবি আখ্যা অর্জন করে নিয়েছেন।

সে মৌলিকত্বটি কি ? সেটি হলো, নারীসৌন্দর্য-সম্ভোগের সঙ্গে মর্ত-সৌন্দর্য-উপভোগ, রূপের সঙ্গে রসের অপূর্ব সংযোগ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না, কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতা মাত্রেই রসাত্মক ও বস্তুতান্ত্রিক।" মোহিতলালের কাব্য এই দু'য়ের সংমিশ্রণে রচিত।

অনেকেই মোহিতলালের কবিতাকে 'ইম্‌ম্যরাল', 'ভালগার' বলে থাকেন। তাঁদের মতে, তাঁর কাব্যে শুধু কামনার ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। এ অভিযোগের উত্তর দিতে হলে অধ্যাপক হর্টনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "বিলাস ও দেহাত্মবাদ প্রবল হলে সে সাহিত্যের অবনতি ঘটে। দেহাত্মবাদ প্রবল হলে সে জাতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্য-সৃষ্টি হয় না। দেহাত্মবাদের প্রভাব অতিক্রম না করতে পারলে খাঁটি কবিও নিম্নস্তরের কাব্য লিখে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন—উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-রচনার কাজ তখন আপনা

হতেই বন্ধ হয়ে যায়।" (The Elements of Literature)। মোহিতলাল যদি শুধু দেহজ-কামনার ছবিই আঁকতেন, উলঙ্গতার লাম্পট্যেই যদি বিভোর হয়ে থাকতেন তাহলে তিনি 'ছন্দ-চতুর্দশী'র মত ভাবপিনদ্ধ সনেট বা 'স্বপন-পসারী', 'অঘোরপন্থী', 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'মৃত্যু ও নচিকেতা' প্রভৃতির মতো সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ কবিতা বলিষ্ঠ মনোভঙ্গীতে আঁকতে পারতেন না। নিছক স্থূল, যৌন-আবেদনের কোনো কবিতা হলে মোহিতলালের কাব্য দুদিনেই একটু সোরগোল তুলেই শেষ হয়ে যেত। নিতান্ত বিকৃতরুচির পাঠক ছাড়া আর কেউ তাঁর কাব্যের খোঁজ রাখত না। নৈয়ায়িকদের ভূয়ো অনুশাসনের বেড়াজাল পেরিয়ে তাঁর কাব্য বাংলা সাহিত্যে আজও যে জীবন্ত হয়ে আছে, তার কারণ হোলো, মোহিতলালের বহ্নিদীপ্ত প্রকাশ তাঁর কাব্যের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে অভিব্যক্ত।

পরশ-হরষে মজি নাই—তাই গেয়েছি দেহের গান,
জেগে র'ব বলি' করি নাই তা'র অধরের মধু পান!
রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করেছি একাসনে,
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে!

—গঙ্গাতীরে : হেমন্ত-গোধূলি

প্রাণবান জীবনের বহুবিধ রূপই তাঁর কাম্য, জীবনের বহুবিধ সম্ভোগের বাণীই মোহিত-কাব্যের 'লাইফ ফোর্স'। মোহিতলালকে যে যাই বলে বলুক কিন্তু তাঁর কাব্যে ইন্দ্রিয়-অনুভূতির এই আকৃতিকে ফ্রয়েডীয় সংজ্ঞায় 'লিবিডো' (Libido) বা 'মনের যৌন-বিকার' যাঁরা বলেন তাঁদের রুচির মধ্যে কোথায় যেন একটা বড়ো রকমের খুঁত রয়ে গেছে। বরং কবি-মনের এই আকৃতিকে 'elan vital' বা জীবনের গতিবেগ বলাই সমীচীন। যৌন-অনুভূতির প্রচলিত সংজ্ঞা ছাড়িয়ে তাঁর কাব্যে নারীর কাম ও কামনা এক অপূর্ব বাণী-ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে—বহু বাসনার মধ্যে যেন বিশ্বরমার উপাসনা। কবি কীট্‌স্ যেমন দেহকেন্দ্রিক sensations-এর কবি তেমনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল। Sensation ও emotion—ইন্দ্রিয় ও হৃদয়, এই দুয়ের মিলনে কীট্‌সের রচনায় যে কাব্যশিল্পের বিকাশ দেখতে পাই তাতে morbid কল্পনার অবকাশ অসম্ভব। মোহিতলালের কাব্যেও তাই। উভয়ের কাব্যেই একটা প্রবল sensuousness (রূপতৃষ্ণা)-এর লক্ষণ আছে। কীট্‌সের সৌন্দর্যপিপাসা অতি প্রখর বস্তুজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত—প্রাকৃতিক

বস্তুসকলের রূপ, রস, রেখা, গতি ও স্থিতির ভঙ্গী—এ সকলই আশ্চর্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করবার শক্তি তাঁর ছিল, তাঁর ইন্দ্রিয়-চেতনায় কেবল ভোগ-বিলাস বা ভাব-স্বপ্ন ছিল না, তার সঙ্গে অতি-নিপুণ জ্ঞান-ক্রিয়াও ছিল। তাঁর কল্পনায় যে সুন্দর মূর্তি ফুটে উঠত তার মূলে সাক্ষাৎ ও নিবিড় ইন্দ্রিয়-পরিচয় ছিল তা শুধু প্রাণের অন্ধ আবেগ নয় তাই তাঁব কল্পনা সুস্থ, সবল ও প্রকৃতিস্থ। তাঁর বাণী চিত্রবৎ, তিনি রূপকে বাঙ্ময় করেছেন। সেজন্যে তাঁর sensuousness অতিশয় স্বাভাবিক ও সজ্ঞান। এজন্যে কীট্‌স সম্বন্ধে বলা হয় 'poetry for him was as same as sunlight,' মোহিতলাল সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। কীট্‌সের মতই মোহিতলালের ভোগ-বিভোরতা বাস্তবকে বরণ করেছে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মসাৎ করেছে। কীট্‌স্‌-এর 'The Eve of St. Agnes'-এ দেহের নগ্নতার বর্ণনা আছে কিন্তু তা-ই প্রধান নয়, কীট্‌স্‌-এব sensuousness-ই ফুটে উঠেছে, মোহিতলালের 'অঘোরপন্থী', 'মানসলক্ষ্মী', 'স্পর্শবসিক, 'মোহমুদ্গর, 'বাঁধন', মিলনোৎকণ্ঠা', 'স্মরগরল' প্রভৃতি কবিতায় তেমনি দেহ সম্ভোগেব কথা আছে কিন্তু সেটাই মুখ্য নয়। নগ্নতা ছাড়িয়ে যেমন একটা প্রগাঢ় ও গম্ভীর সৌন্দয আছে তেমনি ভোগ-লালসার মধ্যেও সৌন্দয আছে। যেমন কীট্‌স-এর 'The Eve of St. Agnes'-এব মধ্যে পরফিবো ও মেড্‌লিনেব আলিঙ্গনের মধ্যে একটি আনন্দলোকে বিহারের প্রেরণা আছে তেমনি দেহতান্ত্রিকতার মধ্যেও দেহাতীত সৌন্দর্য-ধ্যানের পরিচয় 'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' কাব্যগুলির মধ্যে সঞ্চারিত। তাই সাহিত্যের চিরন্তন রস হল, যেখানে কামের মধ্যে আনন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটে সেখানেই সৌন্দর্য ফুটে উঠে অর্থাৎ সেখানেই 'A thing of beauty is a joy for ever', খাঁটি aesthetic pleasure যেখানে আছে সেখানে বিষও অমৃত হয়ে ওঠে। প্রায়ই বলা হয়, চিন্তাধারায মোহিতলাল গোবিন্দ দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে গোবিন্দ দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় সৌন্দয-বিধুরতা মোহিতলালের মত ফুটে উঠে নি। আর মোহিতলাল অন্য কোন কবির অনুকরণ বা অনুসৃতি বরাবরই সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। এর ফলে তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাঙ্গিমাটি আরও দৃঢ় হয়েছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনদর্শন আরও যুক্তিনিষ্ঠ হয়েছে। দেবেন্দ্রনথে সেন যে সৌন্দর্যকে আদর্শায়িত করতে চেয়েছেন;

মোহিতলাল তাকেই বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন। মোহিত-কাব্যের এটি একটি মৌলিক লক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথ সেন যেমন ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের মধ্যে নিজের অনুভূতিকে অচেতন করে ফেলেছেন, কিন্তু মোহিতলাল অচেতনকে সৌন্দর্য-সম্ভোগের প্রতিকূল বলে মনে করেছেন; ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত রেখে বাস্তব-চেতনা-প্রসূত রসবোধের সঙ্গে তিনি নারীর রক্তমাংসের দেহকে ভোগ করেছেন।—

রূপ নহে সেই রস, রতি নয়—সে শুধু আরতি,
মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি!
সে তো নহে ভোগ-প্রয়োজন,
সে নয় প্রাণের ক্ষুধা—প্রেম নয়, নয় সে তো দেহ-পদ্মে
মধু-আস্বাদন!
দুঁহু দোঁহা ভুঞ্জে শুধু, তুই-আমি এক-আমি হয়,
আত্মরস-রসাতলে স্বর্গ-মর্ত্য-নিখিলের লয়!
আঁখির অমৃত-বর্তি বলি যারে, চাহি' তার মুখে সেইক্ষণে
আঁখি যে মুদিয়া আসে, চেতনা হারায়ে যায় প্রাণের গহনে—
তাই তার রূপে কিবা কাজ?
'কালা কিম্বা গোরা' ভুলি—তনু-মন সমর্পিতে নাহি পাই লাজ।
—রতি ও আরতি : স্মর-গরল

জীবন ও জগৎকে একটি সুস্থির ও সুনিয়ন্ত্রিত, বুদ্ধি ও বিবেকসম্মত আদর্শে অনুভাবনা করে তাকেই তিনি কাব্যে শব্দে-অর্থে হৃদয়গ্রাহী করতে চেয়েছেন। ছন্দের কারুকলায়, ভাষার বুনোনিতে, উপমার সৌকর্যে প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যে মোহিতলাল তাঁদের চেয়ে সিদ্ধহস্ত। মহাকাব্যসুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে গীতি-কবিতার রেশ মোহিত-কাব্যে পরিব্যাপ্ত—দেবেন্দ্রনাথ সেন বা গোবিন্দ দাসের রচনায় যা দুর্লভ। সর্বোপরি তাঁদের চেয়ে মোহিতলালের রসবোধের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের গভীরতা ছিল ঢের বেশী। নানা দেশ-বিদেশের কবিদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। গভীরতার সঙ্গে উজ্জ্বল স্পষ্টতাই মোহিতলালের কাব্যকে সার্থকতায় মণ্ডিত করেছে। শিল্পের প্রেরণায় তিনি বিশ্বাসী নন, শিল্পে বিচারবোধকে তিনি সর্বাগ্রে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

আজকাল রিয়ালিটির দোহাই দিয়ে আধুনিক কবিরা কামতন্ত্রের তীব্রতায়

সংযম ও শ্লীলতার সীমা হারিয়ে এমন কবিতার সৃষ্টি করছেন যাতে বস্তুতান্ত্রিকের কড়াপাক আছে, কিন্তু স্নিগ্ধতা নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায় এসব হল 'সাহিত্যিক অপথ্য'। এবং এই ভালগারিটির জন্যই তিনি 'কল্লোল'-গোষ্ঠী ত্যাগ করেছিলেন, আধুনিকদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। 'কল্লোলে'র 'বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসাহিত্য' তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল—এ কারণেই তিনি একদিন 'কল্লোলে' এসেছিলেন এবং আধুনিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন 'আধুনিকোত্তম'। সংযমহীন-যৌনসর্বস্ব সাহিত্যই যখন 'কল্লোল'গোষ্ঠীর দ্বারা চূড়ান্তভাবে উৎসাহ পেল তখন তিনি সরে দাঁড়ালেন। রোমান্টিসিজমের নামে ভালগারিটি মোহিত-কাব্যে নেই। কাব্য কামতন্ত্রের বিরোধী নয়। কালিদাসের 'মেঘদূত'-এ স্থূল দেহ-সম্ভোগের দৃশ্য বা আভাস আছে যথেষ্ট, আদিকবি বাল্মীকি কাব্য সৃষ্টি করেছেন ক্রৌঞ্চ যুগলের যৌন-সম্ভোগকে উপলক্ষ করে। কিন্তু তাতে তো কবিতার ধর্ম ক্ষুন্ন হয় নি। কারণ হল, এই রতিরসকে বিশ্বজীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন যেটি একটি আনন্দময় সত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরই মধ্যে রয়েছে চারুত্ব, শ্রেয়ত্ব, এইখানেই রয়েছে শিল্প-রসের উদবোধ। এইভাবেই আমাদের স্থূলবৃত্তিগুলির রূপান্তর ঘটে। এই পথেই মোহিতলাল নিজস্ব সম্ভোগকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি জানতেন, শুধু দেহজ কামনা নিয়েই যদি কবিতা লেখা হয় আর তাতে কাব্যরস না থাকে তাহলে হাওয়া- বেরিয়ে-যাওয়া বেলুনের মত চুপসে যেতে হবে। তাই তিনি ইন্দ্রিয়সর্বস্ব নন, দেহাত্মিক—দেহ ও আত্মার প্রভেদ ঘোচানোর পক্ষপাতী। তিনি ভোগলালসাকে পৃথিবীর জল-বাতাসের মত সহজ স্বভাব-ধর্মরূপে গ্রহণ করেছেন। পরিপার্শ্ব কিংবা পৃথিবী থেকে দেহকে কখনও ভিন্ন চোখে দেখেন নি, বিশ্বব্যাপী একটি সমগ্রতার সৌন্দর্যের মধ্যে কামিনাকে উপলব্ধি করেছেন। কামনা ও বাসনাকে দেহের ক্ষেত্রেই আত্মার সেবায় নিযুক্ত করার সাধক তিনি, ভোগ ও মোক্ষকে পুরুষার্থ বলে মনে করেছেন; দেহের রস উপভোগ করেই দেহাতীতের সন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মোহিতলাল সম্পর্কে বলেছেন, "মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তালঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জাবোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা

আছে ; সাহস আছে, বাহাদুরী নেই।"—সাহিত্যে নবত্ব।

এই পৌরুষ-সুলভ স্বাভাবিক প্রেমই কবির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-ধ্যানের সহায় হয়েছে ; বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের এই যে মিলনতীর্থ কবি আবিষ্কার করেছেন, এইটি তাঁর কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র। বার্নাড শ তাঁর 'Sanity of Art." গ্রন্থে ফরাসী মনীষী মনতাইন (Montaign) সম্বন্ধে বলেছিলেন, "He was the greatest artist of all—he knew the art of living." মনতাইনের মত মোহিতলাল সাহিত্যের বেঁচে থাকার চিরন্তন মন্ত্র জেনেছিলেন। যৌনতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করেছেন এবং এখনও ফ্রয়েডীয় ভঙ্গীতে সাহিত্যের নীতিকে বিসর্জন দিয়ে কবিতা লিখছেন তাঁদের সঙ্গে মোহিতলালের পার্থক্য এইখানে। কামের নামে তাঁর কাব্যে অশ্লীলতা নেই—মোহিতলাল এখানেই জাত-কবি, এখানেই তিনি সার্থক। তাঁর কবিতার উদাহরণ দিয়ে কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করা যাক।

তিন

'স্পর্শ-রসিক' কবিতা রুচিভেদে ভালো হয়ত কারো কারো না লাগতে পারে, কারণ এতে দেহ-সম্ভোগ প্রবলভাবে প্রতিভাসিত কিন্তু একে উপেক্ষা করা অসম্ভব, কারণ তার মধ্যে সৌন্দর্য অনুরণিত। যেমন কবি বলছেন—

অন্ধ আমি—জাগি তাই সারারাত পরশ-পিয়াসে,
শয়ন-শিয়রে মোর জ্বলে না প্রদীপ,
হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে,
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে লক্ষ নীপ!
মিলন-রজনী মোর আঁধার শ্রাবণ—
দুই দেহ-তটে সে কি দুরন্ত প্লাবন!
অন্ধ হয় অন্ধকার!—অন্ধ আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে!
সে মুহূর্তে আমি যে গো মরণ-অধিপ! —বিস্মরণী

'মিলনোৎকণ্ঠা' কবিতার শেষের দিকে—

বধূরে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ—চোখের চাহনি চমৎকার!
আর কত দেরি গোধূলি-লগন?
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,

শুধু সেই চেলী উজলি' তুলিবে অন্ধকার—
সেই আঁখি-তারা চমৎকার! —স্মর-গরল

আবার এই তৃষ্ণার্ত আলিঙ্গন থেকেও তো ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নের উদাহরণ আছে একাধিক কবিতায়। যখন জনপদ-যুবজন মাতিয়াছে মদন-উৎসবে' তখন কবির কাছে 'সে শব্দতরঙ্গ যেন দূর হতে হানিছে হিল্লোল'। —প্রেম ও জীবন: স্মর-গরল।—

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলা-রভসে নহি আমি উৎসুক।
মোর কামকলা—কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস
আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ!
—স্মর-গরল: স্মর-গরল

পূর্ণিমাবি প্লাবন—তবু জ্যোৎস্না-শ্রাবণ রাতি
আকাশ-শেষে জলছে হোথায় বিপুল বাসর-বাতি!
আমার যে আর নেই পিপাসা,
নেই যে আশা, নেই নিরাশা—
চাই নে আলো, চাই নে আঁধার, চাই নে সুখের সাথী—
—নতুন আলো: স্মর-গরল

আমারও মিটেছে সাধ,
চিত্তে মেবে নামিয়াছে বহুজন-তৃপ্তি-অবসাদ!
তাই, যবে চাই তোমা পানে—
দেখি, ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে
প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সদ্য-বলিদান!
—চুম্বনের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান!
যবে তোমা বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে
অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়ামূর্তি ভাসে!
—প্রেতপুরী: হেমন্ত-গোধূলি

দেহের কামনাকে সত্য বলে স্বীকার করেও তাঁর অন্তর চরম শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়েছে, বৈরাগ্যের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অথচ দুর্দম মোহ অনুভব

করেছে। তাই তাঁর কাব্যে চিন্তার দ্বন্দ্ব আছে। একদিকে যেমন তিনি ভোগ-বাসনাকে ব্যক্ত করেছেন আর এক দিকে ভারতের সনাতন রূপটি ধ্যান করেছেন। ভোগের মধ্যে ত্যাগ—ভারতের এই সনাতন মন্ত্র মোহিতলালকে আকৃষ্ট করেছে, কারণ যখন শোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদ ও বৈরাগ্যের মন্ত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছে তখন তার মধ্যে সনাতন ভারতের সনাতন বাণীই ফুটে উঠেছে। কেন তিনি ভোগের মধ্যে ভোগ-বিরতির ব্যাকুলতা অনুভব করেন? লীলাচঞ্চলা প্রকৃতি দেহের যোগস্থ পুরুষের বারবার যোগ-ভঙ্গ করে, প্রকৃতির মৌল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সৃষ্টির প্রয়োজনে তাকে নামিয়ে আনে। এই অনিবার্যকে পুরুষের যোগীসত্তা মেনে নিলেও তার মনের কোণে একটা ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জমা হয়েই থাকে। মোহিতলালও এই বেদনা অনুভব করেছেন। কিন্তু ভারতীয় মোহিতলাল একেই সমাপ্তি-সিদ্ধান্তরূপে মানেন নি, দেহ-কামনার অনিবার্য জৈব নিয়মকে তান্ত্রিকতার মধ্যে আরোপ করেছেন। শক্তি-সাধনায় তান্ত্রিককে যেমন পঞ্চ-মকারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তেমনি মোহিতলালও নারী এবং কামনাকে জীবন-সাধনার উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন। উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার লক্ষণ হল, তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্ব বা বিরোধের মধ্যে একটা harmony ফুটে উঠে। মোহিতলালের কবি-প্রতিভা ছিল উচ্চশ্রেণীর তাই তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্ব একটা অভিনব যোগসূত্রে নির্দ্বন্দ্ব হতে চেয়েছে।

নিজের কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি নিজেই বলেছেন—

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না!
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!

—স্মর-গরল : 'স্মর-গরল'

তাই সহজেই বলা যায় নিছক দেহ-তান্ত্রিকতাই মোহিত-কাব্যের মূল কথা নয়। মদন-দেবতাকে কবি নতুন তনু ধারণ করে বর বেশেও আসতে দেখেছেন, তখন প্রিয়ার চোখে কবি দেখেন—'অধরে বাসন্তী উষা, সিন্দূরে বালার্ক-ভাতি, নেত্রে তার নীলাকাশ দেখিবারে পাই'। —রতি ও আরতি : 'স্মর-গরল'

এর থেকেই জানতে পারি দেহাতীতের সৌন্দর্যধ্যানও কবির আছে। 'সাহিত্য-বিতানে' তিনি বলেছেন, "মানুষের ভোগ-পিপাসার অসীমতা

ও দুর্দমনীয়তা এবং যাহাতেই তাহার সে শক্তি প্রকাশ পায়—তাহাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, অন্য পরিচয়ও আছে। ঐ কামনা-বাসনাই মনুষ্যত্বের নিদান বটে, কিন্তু উহারও একটা উল্টা মুখ আছে। তাহাও সেই শক্তিরই আর এক দিক।" সুতরাং দেহজ ও দেহাতীত এই দুই দিকেরই পরিচয় সম্বন্ধে মোহিতলালের সচেতনতা আছে এবং তাঁর কাব্যেও দেহজ কামনা থেকে ছাড়িয়ে কাব্য-সঙ্গীত শিল্প-রসায়নে জীবনের আনন্দঘন রূপলোকের সঙ্গীত সমীরিত। তবে কেউ যদি তাঁর কবিতা থেকে খণ্ড খণ্ড ভাবে যৌন-সম্ভোগের পঙ্‌ক্তিগুলি বাছাই করে কবিকে 'যৌন-কবি' বলে আখ্যা দেন তাহলে তা কবির ওপর নেহাতই অবিচার করা হবে, কারণ খণ্ড পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে কবির জীবনদর্শনের স্পর্শ থাকলেও তাতে কবির জীবনের সমগ্রতা-বোধ নেই।

মোহিতলালের দেহ থেকে দেহাতীত, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত যে প্রেম তা জীবন-বহির্ভূত প্রেম নয়। এই জীবনকে বাদ দিয়ে জীবনাতীত কোন-কিছুর আকাঙ্ক্ষা কবি করেন নি—মোহমুক্ত সবল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দুরন্ত জীবন-পিপাসাই তাঁর কাব্যের প্রধান প্রেরণা। তাই তিনি কাব্যকে শুধু রসের সম্ভাররূপে গ্রহণ করেন নি, কাব্যকে জীবনের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছেন। 'জীবন-জিজ্ঞাসা'য় তিনি বলেছেন, "রূপের বাহিরে নয়, জীবনকে অতিক্রম করিয়া নয়, ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া নয়—তাহাকে স্বীকার করিয়া এবং তাহারই মর্মস্থলে আত্মার পদ্মাসন পাতিয়া সৃষ্টির জয় ঘোষণা—জীবনের স্তোত্রপাঠ—ইহাই কবি-ধর্ম।" যাঁরা জীবনকে অস্বীকার করে মানুষের স্বাভাবিক কামনা ও বাসনাকে চেপে 'চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী' হতে চান তাঁদের প্রতি মোহিতলালের অন্তরের ঘৃণা ঋজুভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

রজনী তিমির-ঘেরা, কুহূ-অমানিশি যাপি' প্রহরে প্রহরে,
মন্ত্র জপি' শবাসন 'পরে,—
ভরিয়া কপাল-পাত্রে অবিরল অনল তরল,
অট্টহাস্যে নিবারিয়া মমতার গলদশ্রুজল,
প্রেয়সী-নারীর মুখে হেরি' বিভীষিকা,
আপনারি বক্ষ-রক্তে পরি' জয়-টিকা,
কি লভিলে, ওহে বীর, বামমার্গী কাপালিক, নাস্তিক তান্ত্রিক?
—ধিক্ তোমা ধিক্!

—মোহমুদ্গর : বিস্মরণী

যাঁরা পরজীবনের সুখের আশায় ইহজীবনের সকল সুখ বিসর্জন দেন তাঁরা দুঃখ ছাড়া আনন্দ পান না— সীমাকে ছেড়ে অসীমকে পাওয়া যায় না। জন্মান্তরবাদে তিনি বিশ্বাসী নন—ইহকালই তাঁর কাছে সত্য। কবির কথা হল কবিতায়—

জন্ম যদি হ'য়ে থাকে অন্ধকার শূন্য হ'তে লভি' কায়া,
ব্যর্থ কর অদৃষ্টের মায়া!

... ...

দণ্ড দুই দেহ ধরি' পূর্ণ অবতার,
সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপে মহা অধিকার!
—তৃপ্তি নাই তবু তাহে? হা অভাগ্য আত্মঘাতী কাল-ক্রীড়নক
—মূর্খ মানবক!

—মোহমুদ্গর: বিস্মরণী

এই কথাকেই 'জীবন-জিজ্ঞাসা'য় আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমি মানুষের ভাগ্যকে কোন কিছুর দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পারি না; এই জীবনের যতকিছু আধি-ব্যাধিকে মানবাত্মার পরীক্ষায় জগৎকে একটা পাপ মোচনের যন্ত্র অথবা ক্রমোন্নতির আরোহিণী বলিয়া স্বীকার করিতে আমার বাধে। যদি কিছু সৎ বা সত্য কোথাও থাকে, তবে সে এই জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যেই আছে। যদি না থাকে, তবে তাহা কোথাও নাই—এই বুদ্ধি আমার চিত্তে দৃঢ়মূল হইয়াছে। পাপ-তাপ, দুঃখ-দৈন্য দূর হইবার নয়—উহারাই সৎ, উহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি অনাবশ্যক; আন্তরিক দুঃখ-নিবৃত্তির কামনা বা ভাবনা জীবন-বিকার মাত্র।" সুতরাং যে কটা দিন আমাদের আয়ু সে কটা দিন আমরা হেসে খেলে জীবনকে উপভোগ করে নিই—

জানিতে চাহিনা আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি' কামানল!—
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ!—...
মুহূর্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি' হৃদ্‌পদ্ম-দল!...
চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি',...
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস!—জানি তাহা জানি।

... ...

তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জালো।

—পাছ : বিস্মরণী

এদিক থেকে মোহিতলাল ওমর খৈয়ামের সমধর্মী—স্বল্পবৃত্ত জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ আস্বাদনই তাঁর কাম্য। ওমর খৈয়ামও বলেছেন—

দেহের লালসা সখি পাপ বলে গণ্য করে যারা,
এ কথা কি ভুলে যায় তারা
সে-লালসা স্বজিয়াছে নিজে ভগবান
জগতের সাধিতে কল্যাণ।

—নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ

অতএব—

ওগো মম জীবনের আলো,
সেই মোর ভাল।
প্রতিদিন দ্বিধাহীন যদি এ দু'বাহু প্রসারি,
তোমারি ও তনুখানি বক্ষে মোর ধরিবারে পারি।
সুধাস্নিগ্ধ সে পরশ শান্ত সুমধুর
হৃদয়ের সব তাপ করে দেবে দূর।

—ঐ

মোহিতলালের 'বুদ্ধ' কবিতায় ওমর খৈয়ামের এই কথা আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দেহের এক কোটিতে যোগস্থ পুরুষ অন্য কোটিতে পরমা প্রকৃতি। এই লীলাচঞ্চলা প্রকৃতিকে অস্বীকার করার অর্থ অর্ধেক জীবনকে বাদ দেওয়া। খণ্ডতাপন্থীদের তিনি তীব্রভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন এই 'বুদ্ধ' কবিতায়। তাই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, বুদ্ধির দীপ্তি, প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ, বলিষ্ঠ জীবনবাদ, বন্ধনহীন প্রাণশক্তি এই কবিতায় মূর্ত হয়েছে। কবি মোহিতলালকে যদি কেউ এককথায় বুঝতে চান তাহলে 'বুদ্ধ' কবিতাটি পড়লেই তাঁর সমগ্ররূপ দেখতে পাবেন। বুদ্ধ কাম ও বাসনা থেকে মুক্ত হবার জন্যে প্রেম-প্রীতির, যৌবনের তাড়নাকে অস্বীকার করে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। কবি তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন—

দেহ মিথ্যা প্রাণ মিথ্যা, একমাত্র দুঃখ সত্য হবে ?
বাসনায় আছে বিষ ?

—স্মর-গরল

এ কিছুতেই হতে পারে না ; নিখিল বিশ্বের আনন্দ-যজ্ঞে যিনি সাড়া দিলেন না জীবধর্মের সঙ্গতি তিনি হারিয়ে ফেললেন—

আছে সাথে বিষয় ওষধি !
অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা !—
কামেরই সে ভিন্নরূপ—নাম তার জানে বটে সবে ;
প্রাণের রহস্য তবু এক সেই ! জন্মান্ত অবধি
তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা !

—স্মর-গরল

এ সত্য যেদিন কঠোর নীতিবাগীশের দল জানবে তখন—

ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ মৃত্যুভয় রবে না যে আর !
বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি' রবে না সদাই ; —স্মর-গরল

'বিস্মরণী'র 'মানসলক্ষ্মী'র মোহগ্রস্ত 'স্মর-গরলে'র 'রূপ-মোহে' অবসান হয়েছে। এখানে তাঁর মানস লক্ষ্মী বৈরাগ্যসাজে সজ্জিতা। কবির কাছে প্রেম দেখা দিয়েছিল প্রথমে রতি হিসেবে তারপর দেখা গেল আরতি হিসেবে। তাই তিনি 'শেষ আরতি' কবিতায় প্রিয়াকে মিনতি করে বলছেন—

মুকুতার সিঁথি খুলে রাখ, আজ বাঁধিও না কুন্তল,
কাজ নাই সখি, আঁখির কিনারে কুহকের কজ্জল !
সম্বরি' বেশ, বক্ষের বাস
ঘুচাও মনের মহা মোহ-পাশ—
আজ রাখ সখি, মুকুলে মুদিয়া কমলের শতদল,
ত্যজ মঞ্জীর, মেখলা নীবির—মৃগমদ, কজ্জল।

—স্মর-গরল

পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, বাসনাকে বাদ দিয়ে কবি অতীন্দ্রিয়ের সাধনা করেন নি, আবার বাসনার মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে অতীন্দ্রিয়কে ভোলেন নি। বৈষ্ণবদের মত ইন্দ্রিয়জ রূপতৃষ্ণার চেয়ে অতীন্দ্রিয় রূপতৃষ্ণার প্রবলতাকে মোহিতলাল স্বীকার করেন নি। তিনি আগে সংসারী পরে 'বিবাগী'। তিনি হচ্ছেন 'রক্ত-মাংস-শিরা-শোণিতের মধ্য দিয়া যে উপলব্ধি' সেই তান্ত্রিক সাধনার তান্ত্রিক।—

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি', যেই জন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ!
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।

—পাপ : স্বপন-পসারী

কিংবা—

আমারে করেছে অন্ধ গন্ধরূপে দেহ ধূপাধার
মাদক সৌরভে তার চেতনা হারায়
বিষপান করি' আমি স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার
চিরবন্দী আছি তাই স্বপন-কারায়।

তিনি সর্বদা মনে রেখেছেন, "অত্যুগ্র কামনায় সৌন্দর্য-সৃষ্টিও যেমন কাব্যের গৌরবহানি করে, তেমনি কামনাকে অতীন্দ্রিয়-লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিছক সৌন্দর্যের সাধনাও মানুষের আত্মাকে আশ্বস্ত করে না, বরং বাস্তব হৃদয়-বেদনা যখন সুখময় হইয়া উঠে, তখন যে রসের উদ্রেক হয়, তাহাতে জীবনের সহিত তথা নিজ গূঢ়তম সত্তার সহিত, গভীরতর পরিচয়ে একটা আনন্দ আছে।" (—আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ পৃ. ৪৯)। ফলে ইন্দ্রিয়বাসনা মহিমান্বিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। সম্ভোগ ও ভালবাসার মধ্য দিয়েই কবি সব কিছু পেয়েছেন। আজ তাই তিনি সকল সত্যের সার সত্য জেনেছেন—মানুষ যদি ভাল না বাসে, তবে সৌন্দর্য যেমনই হোক তাকে উপলব্ধি করবে কোন্ বুদ্ধির দ্বারা? কোনি সৌন্দর্যই সৌন্দর্য নয় যদি না মানুষ ভালবাসার দৃষ্টিতে তা দেখে। 'ভাল যে বাসেনি কারে তার চেয়ে দুঃখী আর নাই'। (—শেষ শিক্ষা : স্মর-গরল)—এই মন্ত্রের দ্বারাই মোহিতলালের ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-পিপাসা একই রসচেতনায় নির্বিরোধ নির্দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে। এই ভালবাসার মন্ত্র তাঁর অভিনব যোগসূত্র। তাই মোহিতলালকে আমি সৌন্দর্যের 'সংসারী-কবি' বলি। তাঁকে 'সংসারী-কবি' বলার আরও একটি কারণ আছে। দুঃখকে বাদ দিয়ে মোহিতলাল শুধু সুখের সন্ধান করেন নি। তিনি 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র'-তে বলেছেন, "দুঃখকে একেবারে বহিষ্কার করিতে পারাই সুখী হইবার উপায় নয়—তাহাকে জয় করিবার বা হাসিমুখে সহ্য করিবার শক্তিই সুখের কারণ হইয়া থাকে; সেই শক্তি যার নাই সে দুঃখী হইবেই। যেখানে সত্যকার সুখ আছে সেখানে প্রেম আছে; প্রেমে বিষও অমৃত হইয়া উঠে, সেই প্রেম নরনারীর আত্মাকে প্রতিমুহূর্তে শুচিস্নানে উজ্জ্বল করিয়া

তোলে।" জীবন-রসিক কবি বললেন—

যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা!
... ...
যত সে কাঁদায় তত বুকে বাঁধি, তত তারে ভালবাসি—
ধরণীর এই শ্যাম মুখখানি, আঁধার অলকরাশি।

—ব্যথার আরতি : বিস্মরণী

এ বেদনা তাঁর কণ্ঠে 'গীত হয়ে বাজে, ব্যথায় বৃহৎ হয়ে সে ফুল বিরাজে।' এরই ফলে তাঁর কাব্যে সুখসর্বস্বনীতি-র (pleasure principle) সঙ্গে বাস্তব-নীতি-র (reality principle) সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই তাঁর রোমান্টিসিজম বাস্তব বুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এদিক দিয়ে মোহিতলাল একজন বস্তুতান্ত্রিক কবি।

চার

সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ মোহিতলালের একমাত্র ওরিজিন্যালিটি নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নারীর দেহগতরূপের সঙ্গে তুলনা করে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রকৃতি-প্রেম আমদানী করেছেন তিনি। এখানে 'কাল-বৈশাখী', 'কন্যা-শরৎ', 'বাদল-রাতের গান', বসন্ত-বিদায়', 'শ্রাবণ শর্বরী', 'শিউলির বিয়ে' প্রভৃতি কবিতার কথাই বলছি। বিশেষ করে শেষোক্ত কবিতার অনির্বচনীয়তা আমার কর্ণেন্দ্রিয়কে প্রচুর আনন্দ দান করে আর এ কবিতা কবির সুগভীর নিসর্গানুভূতির বাঙ্ময় রূপায়ণ। এতে কবির কল্পনার বর্ণচ্ছটা প্রতি পঙ্‌ক্তিতে বিচ্ছুরিত। কবির সুতীব্র প্রেমানুভূতি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতির অপূর্ব সম্মিলনে এই কবিতা অভিসিঞ্চিত। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে মোহিতলাল তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন। ভাষা, ছন্দ ও বাগ্‌ভঙ্গীর কারু-সুবলিত প্রসাধন-কলায় কবিতাটি আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ। এই কবিতায় কাহিনীর একটি টানা-পোড়েন আছে বলে উদ্ধৃতি দিয়ে রসভঙ্গ করতে চাই না। 'ঘুঘুর ডাক', 'নিশি-ভোর', 'দিনশেষে', 'স্বপ্নসঙ্গিনী' এ সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে কবির কল্পনায়।

মোহিতলালের কাব্যে যে রূপ-চর্যার ছড়াছড়ি দেখি সেই রূপ-সুষমার বৈশিষ্ট্যও প্রথম থেকেই সুপরিস্ফুট। ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতির বাইরে কাব্যের

উপাদান সংগ্রহে সহজে তিনি রাজি হন নি বলে উপমায় ও ইঙ্গিতে যা তিনি প্রকাশ করেছেন সেগুলি ভাবাত্মক কিংবা চিন্তাপ্রসূত হয় নি—আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তাই আমাদের কবিদের মধ্যে মোহিতলাল (ও জীবনানন্দ দাশ) অনাধ্যাত্মিক জীবন-প্রেমে বিশ্বাসী কবি। অনুভূতিশক্তি তাঁর তীব্র হয়েছে বলে তাঁর বহির্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে, ধ্যান স্বপ্নময় হয়েছে, চিন্তা চিত্রময় হয়েছে। তাঁর কাব্যে যে ধরনের চিত্রাঙ্কণ দেখতে পাই তা ইংরেজ কবিদের picturesque-প্রিয়তারই অনুরূপ। তাঁর কাব্য-লোক থেকে কয়েকটি ছবি সংগ্রহ করা যাক—

লাল হয়ে ওই নীল নভ-তল সোনালী হয় যে শেষে—
যেন নেবু-রঙ ওড়্না খসিছে রজনীর কালো কেশে !

—দিনশেষে : স্বপ্ন-পসারী

নদী-বুকে হোথা পড়িয়াছে চর—চাষীরা দেখে না চেয়ে,
তাই কাশফুলে বিধবা-বেশিনী যেন সে কুমারী-মেয়ে !

—গঙ্গাতীরে : হেমন্ত-গোধূলি

হেরি যে হোথায় আকাশ-কটাহে ধূম্র-মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীম-কুণ্ডল জটা !

—কাল-বৈশাখী : হেমন্ত-গোধূলি

নটকনা-রং শাড়ীটির ভাঁজে দেহের সকল রেখা
নত-উন্নত তনুটির তটে ছবিটির মত লেখা !
মুখটি আড়াল, খোঁপাটি আতুল—দোপাটির ফুল তায়,
গণ্ড, চিবুক, একটু সে গ্রীবা, হাতখানি—দেখা যায়।
আলোকের শিখা বেড়িয়াছে যেন শুভ্র সে ফুলতনু—
সবটুকু তার দেখা নাহি যায়—শরতের রামধনু ॥

—মাধবী : বিস্মরণী

এখানে মৃত্তিকাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্র তপ্ত গাঢ় বিচিত্র স্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচ

পূর্বেই বলেছি জীবনকে মোহিতলাল অস্বীকার করেন নি, তত্ত্ববিলাসী হৃদয় নয় তথ্যসন্ধী দৃষ্টি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে প্রেমের রোমান্টিসিজমের

পরও মানুষের ওপর অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার ইত্যাদিকে ভুলতে পারেন নি। এর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন। 'কালাপাহাড়' কবিতায় তারই আবাহন-গীতি ধ্বনিত হয়েছে।' অবশ্য এ ঘাটে কবি বেশীক্ষণ থাকেন নি। এখানে 'কালাপাহাড়' কবিতার উল্লেখ করছি এজন্যে যে কবি মোহিতলালের দৃষ্টি যে সব দিকে ছিল শুধু নিছক রোমান্টিসিজমের ওপরই নিবদ্ধ ছিল না যা তাঁর বীতরাগী বন্ধুরা অনুযোগ করে থাকেন; তাঁর বহুমুখীন দৃষ্টিভঙ্গীর এটি একটি মস্তবড় প্রমাণ। এ কবিতায় তিনি মানুষকে সকলের চেয়ে বড় বলে ঘোষণা করেছেন দৃপ্তকণ্ঠে, কিন্তু মানুষের ওপর কেন যে এত অত্যাচার অবিচার করা হয় তার প্রতিকারের কোন পথ কবি দেখান নি। কারণ তাঁর বিদ্রোহ-সুরের কোন পরিপূর্ণ রূপ ছিল না। আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-বুর্জোয়াধর্মী যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফলে আমাদের সামাজিক জীবনের অসঙ্গতি, মোহিতলালের মনে সে-বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। তার ফলে কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কিসের জন্য বিদ্রোহ, বিদ্রোহের লক্ষ্য কী—মোহিতলালের কবিতায় এসব প্রশ্ন স্পষ্ট করে দেখা দেয় নি। 'কালাপাহাড়' ছাড়া 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ' কবিতা দুটিতেও দানবীয় তাণ্ডবলীলার ভেতর পৌরুষধর্মের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষণীয়। এসব কবিতায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের উৎস খুঁজে পাই।

ভারতীয় সাধনার প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল গভীর। 'মৃত্যু ও নচিকেতা', 'রুদ্র-বোধন', 'অগ্নি-বৈশ্বানর', 'পুরূরবা' প্রভৃতি কবিতায় লক্ষ্য করবার বিষয় হল, তিনি ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে অগ্রসর হয়েছেন নতুনের প্রবর্তনায়। প্রগাঢ় রসাবেশে, প্রখর অনুভাবনায়, ব্যঞ্জনার অভিনবত্বে তাঁর এসব কবিতা অনুরঞ্জিত। 'নারীস্তোত্র' কবিতায় স্থানে স্থানে প্রেম সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও গভীর কবিত্ব প্রকাশ পেলেও বৈষ্ণব কবির মত ভাবগভীর আধ্যাত্মিকতা অথবা পাশ্চাত্য কবিদের মত অপূর্ব হৃদয়-বেদনার অসীম রহস্যের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন নি। যা অতি সাধারণ, প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষিত সত্য, প্রেমকে তিনি তার দ্বারাই যাচাই করে তার মূল্য প্রমাণ করেছেন। 'নাগার্জুন', 'উচ্চৈঃশ্রবা', 'প্রেতপুরী', 'বেদুইন' প্রভৃতি কবিতার সুরে ধরা পড়েছে এক একটা ঝোঁক; এবং সেই সুর একটা বিশেষ জিনিস কেননা সে-সুর মোহিতলালের নিজস্ব সৃষ্টি। 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' কবিতাটি তাঁর একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ধ্বনি-গাম্ভীর্যে, শব্দ-যোজনায়, ছন্দের লীলায়িত নৃত্যে

কবিতাটি অনুপম। নূরজাহানের বেদনা-মধুর ভাবাকুলতা এই কবিতাটিকে আশ্চর্য সৌন্দর্যে পরিমণ্ডিত করেছে। যেমন—

খেয়ালি-ফানুসে কত রঙ ধরে যৌবন-যাদুকর!—
লজ্জা কি তায়? কুৎসিতও হয় মনোহর সুন্দর!
একদিন যারে ভালো লেগেছিল, বেসেছিলে তায় ভালো,
হয়ত তারেই মনে হয়েছিল—এই 'জগতের আলো'!
আজ যদি তার রূপের প্রদীপে পলিতায় পড়ে কালি,
রংমহলের দুধের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি—
নিবাইয়া দাও আপনার হাতে! —বিস্মরণী

অথবা—

রূপের রূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সেরা দৌলত?—
তোমার তাজের কোহিনূর নয়—হৃদয়ের সেলামত!
রূপের কদর জানি খুব জানি!—তসবীরে হয় আঁকা,
রূপ সে বিকায় কানা-কড়িতেই, তস্‌বীর লাখ-টাকা। —ঐ

'শেষ-শয্যায় নূরজাহান', 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ', 'মৃত্যু ও নচিকেতা', 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব'—এই কয়টি হল তাঁর কাব্য-নাট্য। কাব্য-নাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরেই মোহিতলাল স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। এসব কাব্য-নাট্যে কাহিনী কিংবা ঘটনা-সংঘাতের চমকপ্রদ বিবরণ দেওয়া হয় নি—চরিত্রের ভাবসংঘাতই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তাঁর কাব্য-নাট্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়—Dramatic lyric ও Dramatic monologue। Dramatic lyric-এর পর্যায়ে পড়ে 'শেষ শয্যায় নূরজাহান' 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', 'মৃত্যু ও নচিকেতা'। প্রথম তিনটির কাহিনী নেওয়া হয়েছে মুঘল যুগ থেকে আর শেষেরটি উপনিষদ থেকে। তবে কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতা সব সময় রক্ষিত হয় নি, অনেক ক্ষেত্রে বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন, কাহিনী মনোমত গড়ে নিয়েছেন। 'শেষ শয্যায় নূরজাহান' তাঁর প্রথম কাব্য-নাট্য—এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি একথা উল্লেখ করে বলেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'শেষ-শয্যায় নূরজাহান' পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—নিজের 'কবর-ই-নূরজাহান' ছিঁড়িয়া

ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।" (পত্রগুচ্ছ পৃ. ৫১)। এই কাব্য-নাট্যের বিবরণ ঐতিহাসিক নয় তবে ইতিহাসের বাতাবরণে এটি আবৃত। মনেই হয় না যে এটি একটি অনৈতিহাসিক ঘটনা—এমনই বাতাবরণ রচনায় তাঁর শৈল্পিক গুণ। নূরজাহান ও জোহরা দুটি চরিত্র। যে নূরজাহান একদিন ছিলেন দিল্লীশ্বরী, যাঁর অঙ্গুলিহেলনে সবকিছু কাজ চলত আজ তিনি ক্ষমতা হারিয়ে অতি দীনভাবে রোগ-শয্যায় শায়িত। তাঁর কাছে আজ আর কেউ আসে না, হাতে ক্ষমতা নেই বলে কেউ তাঁকে পুছে না। একজন পরিচারিকাকে নিয়েই তাঁর দিন কাটে। যে রূপসুষমা একদিন মেহেরউন্নিসাকে নূরজাহানে রূপান্তরিত করেছিল সেই রূপের পলিতায় কালি পড়েছে আজ, সেখানে মৃত্যুর পাণ্ডুর রেখা ফুটে উঠেছে। নূরজাহান যখন নিঃসঙ্গ অবহেলায় শেষ-শয্যায় শায়িত তখন অন্যধারে চলছে উৎসবমুখর নওরোজ রাত্রির রঙীন আনন্দস্রোত। এরই পটভূমিকায় নূরজাহান চরিত্র বড় ট্র্যাজিক আকারে ফুটে উঠেছে। নওরোজ উৎসবে শরীক হবার জন্য জোহরা নূরজাহানকে ডাকছে, কিন্তু সেই উৎসবে যোগদান করার ক্ষমতা তাঁর নেই, শারীরিক ক্ষমতার থেকে হাতে ক্ষমতা না থাকায় নূরজাহান বড় বেশী অবসন্ন। একদিন যে ক্ষমতার বলে নওরোজ উৎসবের কেন্দ্রমণি ছিলেন, ক্ষমতা হারিয়ে তিনি সেখানে যেতে চান না। তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত হিসেব-নিকেশ করে নিচ্ছেন কী পেয়েছেন আর কী পান নি। হতাশা-নৈরাশ্যে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত। এখানে নূরজাহানের হৃদয়-বেদনাকে কবি নিদারুণ মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। শেষ-শয্যায় নূরজাহানের অন্তিম হাহাকার আমাদের যেমন বিহ্বল করে তোলে 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর'-এ নূরজাহান তেমনই আমাদের উদ্দীপ্ত করে তোলে। জাহাঙ্গীরের কাবুল যাত্রাকালে মহবৎ খাঁ জাহাঙ্গীরকে বন্দী করেন এবং কৌশলে নূরজাহানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়ে নেন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশপ্রদান নিয়ে নূরজাহান দৃপ্তভঙ্গীতে সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে সম্রাটের অপদার্থতাকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কটাক্ষ করে সম্রাটরূপে তাঁর মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

এত কাপুরুষ ছিল না সেলিম—মেহেরের মনোচোর!
হায় নারী, একি জীবনের ভ্রম!—এই কি পুরুষ তোর!
অপরাধ মোর যত বড় হোক, তারো চেয়ে অপরাধী
দাঁড়ায়ে সমুখে,—রাজ-বিদ্রোহী!—রাজাকে রেখেছে বাঁধি'!

অন্নাদ কোথা? শূল পোঁতে নাই? মরা-মহিষের খালে
সিলাই করিয়ে, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতকালে।
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি—
ভুলিতে পারি না—যে জন নফর তুমি যে গোলাম তারি!

—বিস্মরণী

এই কাব্য-নাট্যের নূরজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট চরিত্র নূরজাহানের চেয়ে অনেক বেশী তেজস্বিনী এবং কবির নাটকীয় বর্ণনার গুণে এই তেজস্বিতা আরও বেশী স্বাভাবিক হয়েছে। 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' কাব্য-নাট্যে তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আরংজীব চরিত্র অঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ আরংজীব চরিত্র এঁকেছেন। মুনীর চৌধুরীর কথায় বলা যায় আরংজীব চরিত্র 'বঙ্কিমে শঠ, ডি. এল. রায়ে অসংবদ্ধ, ক্ষীরোদপ্রসাদে মহানেতা। এর মধ্যে বঙ্কিমের অতি-বিদ্বেষ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের অতিপ্রীতি সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও অগ্রাহ্য।' (ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়: তুলনামূলক সমালোচনা, পৃ. ৫৩-৫৪, ১৯৬৯)। মোহিতলালের সৃষ্ট আরংজীব অতি স্বাভাবিক মানুষরূপে চিত্রিত। দারার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ তিনি দিয়েছেন; ঘাতক নাজির খাঁ যখন দারার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে হাজির হল তখন তার আগে থেকেই তিনি নিজের মনের মধ্যে বোঝাপড়া করে চলেছেন। দারাকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে তিনি ভুল করেছেন, না, ঠিক করেছেন তারই হিসেব-নিকেশ করছেন। এই হিসেব-নিকেশ ভ্রাতা হিসেবে আল্লার বান্দা হিসেবে সম্রাট হিসেবে তিনি মনে মনে বিচার করছেন। তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব মোহিতলাল অতি নিপুণভাবে তুলে ধরে আরংজীবের সামগ্রিক চরিত্রকেই পাঠকের কাছে উন্মোচন করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মীয় চেতনাই জয়ী হয়েছে—

আমি করিয়াছি জীবনের সার-মন্ত্র, 'লা-ইলাহা',
সে যে 'লা-শরীক'—আর কিছু তরে করি যদি 'আহা, আহা'!
তবে সেই 'এক'—সেই আহদের খেলাপ হবে যে তায়,—
নিষ্ফল হবে মক্কা হইতে ছুটে আসা মদিনায়!
হোক ভাই, হোক পুত্র কি পিতা, তোমা চেয়ে কেহ প্রিয়?
ছুরি দিয়ে তুমি কলিজায় মোর এই কথা লিখে দিও!
খোদার বান্দা নহে যেই জন, এনসান তারে কহে?

সে যে জানোয়ার, বৃথাই যে জন মানুষের দেহ বহে ?
সাপ, বাঘ, আর ক্ষ্যাপা শিয়ালেরে মারিতে কে করে শোক ?
মানুষের রূপ ধরে যদি তারা, আরো সে যে ভয়ানক।
দারা বেইমান, কাফেরের রাজা!—হিন্দু, কেরেস্তান!
আমি মারি নাই, তোমারি গজবে হারায়াছে তার প্রাণ।

এই কাব্য-নাট্যটি মোহিতলালের মৃত্যুর পর প্রকাশিত—কিছু অংশ লিখে দীর্ঘদিন ফেলে রেখেছিলেন পরে কোন ছাত্রকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটক পড়াতে গিয়ে আরংজীব চরিত্র ভালভাবে ফুটে ওঠে নি বলে মনে হওয়ায় তিনি কাব্য-নাট্যটি নিয়ে আবার বসেন এবং এভাবে সেটি শেষ করেন। প্রথমে এই কাব্য-নাট্যটি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়, পরে 'মোহিতলাল কাব্য-সম্ভারে' অন্তর্ভুক্ত হয়। 'মৃত্যু ও নচিকেতা'-র কাহিনী অতি পরিচিত। ঋষি উদ্দালক সর্বস্ব দান করার ব্রত গ্রহণ করে'ছিলেন—তাঁর পুত্র নচিকেতা পিতাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল কার হাতে তাকে দান করা হবে। পিতা বিরক্তি সহকারে বলেছিলেন যমকে দান করা হবে। পিতৃসত্য পালনের জন্য নচিকেতা যমপুরীতে গিয়ে যমকে না পেয়ে তিন রাত্রি অনশনে থাকেন। যম ফিরে এসে অতিথি-সৎকারে বিলম্ব হওয়ায় নচিকেতাকে বর দিতে চাইলেন—মোহিতলালের কাহিনী এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর অতি গূঢ় রহস্য যম ও নচিকেতার সংলাপের মধ্য দিয়ে এক অপরূপ আশ্চর্য কারু-কলায় তিনি উপস্থাপিত করেছেন।

Dramatic monologue-এর পর্যায়ে পড়ে 'নাদির শাহের জাগরণ' 'নাদির শাহের শেষ' 'বেদুঈন'। এই শ্রেণীর কাব্য-নাট্য একক অভিনয়ের মত, একক বক্তব্যের মধ্যেই নাটকীয় রস আরোপিত হয়েছে। এগুলিতে যেন এক একটি মহা-কাব্যের খণ্ডাংশে (Epic in miniature) মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য (Epic Gran-deur) দান করা হয়েছে। এইসব কাব্য-নাট্য নির্মাণে কোন ঘটনা কোন কবিতার প্রক্ষিপ্ত ছায়া তাঁকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে সে-সম্পর্ক তিনি নিজে বলেছেন এক পত্রে, "'বেদুঈন' 'নূরজাহান' ও 'নাদির শাহ' প্রভৃতি কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম—কাব্য ও ইতিহাস উভয়বিধ আকর হইতে। 'বেদুঈন'-এর জীবন ও মরুভূমির চিত্র আমি নানাস্থান হইতে প্রায় বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়াছি। তবে ইহার প্রধান কল্পনা-উৎস ছিল—Monier William Jones-কৃত কয়েকটি আরবী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ। ঐ কবিতাগুলি খাঁটি

বেদুঈন-কবির রচিত—মক্কার 'কাবা'র মন্দিরগাত্রে সেগুলি এখনো নাকি ঝুলানো আছে। সেগুলি কবিতার আম-মাংস বিশেষ; আমি তাহাকে সিদ্ধ করিয়া কিছু মসলা যোগ করিয়াছি এবং মাংসের কাথটুকু আবশ্যক পরিমাণে আমার কবিতায় মিশাইয়াছি। 'মরুভূমি'কে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে আমি এক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থের 'The Terrible Sahara'র চিত্র কাজে লাগাইয়াছি—দুই একটি ইংরাজী কবিতার সাহায্য লইয়াছি। কিন্তু এই সকলের উপরে আমার 'বেদুঈন-জীবন' বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়াছে। আমি একসময় পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বালুচরে বৈশাখের রৌদ্রে অশ্বপৃষ্ঠে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।" —তারাচরণ বসুকে লিখিত পত্র: মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৪৫।

মোহিতলাল কতকগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করেছেন। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে তাঁর চল্লিশটি অনুবাদ-কবিতা রয়েছে। 'স্বপন-পসারী'র অন্তর্গত 'উচ্চৈঃশ্রবা' ভিকটর হুগোর অনুসরণে, 'বিস্মরণী'র 'সুইনবার্নের অনুসরণে' যেটি 'স্মৃতি ও বিস্মৃতি' নামে ১৩৩১-এর প্রবাসী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল, 'রূপকথা'র 'জাগো' 'ঘুমভাঙানি' 'ঘুমপাড়ানি' কবিতা তিনটি ডি. লা মেয়ারের কবিতার অনুবাদ, 'ছন্দচতুর্দশী'র 'বন্ধু' এডওয়ার্ড ডাওসন রচিত কবিতার অনুবাদ। এছাড়া কিছু অনুবাদ গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয় নি। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ছড়ানো এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদ কবিতাগুলিকে একত্র করে 'বিদেশী কাব্যসঞ্চয়ন' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মৃত্যুর আগে প্রস্তুত করে গেছেন। অনেকেই মনে করেন যে শেষের দিকে মোহিতলালের সাহিত্য সম্বন্ধে কোন নতুন বক্তব্য ছিল না বলে মোহিতলাল অনুবাদ ও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি প্রত্যক্ষ কোন রাজনীতি করেন নি, সাহিত্য ও স্বদেশ তাঁর কাছে একাত্ম ছিল। সাহিত্যের কথা বলতে দেশের কথা এসেছে আবার দেশের কথা বলতে গিয়ে সাহিত্যের কথা এসেছে। আর শেষের দিকে সাহিত্য-সেবার অঙ্গ হিসেবে তিনি কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের অনুবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তিনি বলতেন, "অন্যান্য ভাষায় যে সব উৎকৃষ্ট লেখা আছে, সেগুলোর অনুবাদ অন্তত সন্ধান দেওয়াও সাহিত্যসেবা।" (চল্লিশ বছরের বন্ধু: কালিদাস রায়, শনিবারের চিঠি ১৩৫৯ ভাদ্র)। তাঁর নিজ কবি-প্রাণের অর্থাৎ ভোগবাদ, স্বপ্ন-বাসনা, মৃত্যু-ভাবনা, প্রকৃতি-চেতনা, রোমান্টিক কবি কল্পনার ক্লাসিক বুনোনী ইত্যাদির সহিত সহৃদয় সংবেদ্য যে সব দেশী-বিদেশী কবিদের মধ্যে

পেয়েছেন তাঁরা খ্যাত বা অখ্যাত যাই হোন তাঁদের কবিতা তিনি অনুবাদ করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন। 'নমস্কার' কবিতায় তাঁর এই অভীপ্সা ব্যক্ত হয়েছে—

যেখানে যত আছে কবি ও গীতিকার—
যারা বা ছিল আগে, আসিবে যারা আর ;
মানব-কলভাষে বেদনা মধুময়
উথলি' তোলে যারা মরণে করি' জয় ;
চয়ন করে যারা নিজেরা নিশি জাগি'
স্বপন-ফুলশোভা নিমীল-আঁখি লাগি' ;
যাদের গীতিরাগে ধূলিরে ভালো লাগে—
তাদেরে নমি আমি নীরবে অনিবার। —হেমন্ত-গোধূলি

তাঁর অনূদিত কবিতার তালিকা দেখলে দেখা যায় যে উনিশ শতকের ইংরেজ কবিদের প্রতিই মোহিতলালের আসক্তি যেন বেশী। খ্যাতনামাদের ভিড়ে যাঁরা হারিয়ে গেছেন দুটি একটি কবিতায় নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন অথচ বিস্মৃত, তাদের অনুবাদ করে সাহিত্যসেবীর দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন তেমনি তার মধ্যে তাঁর অভিমানক্ষুব্ধ কবি-হৃদয়ের পরিচয়ও যেন ফুটে উঠেছে। বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যে তাঁর মতো কবিরও যে আদর হয় নি এই অভিমান তাঁর মনে ক্রিয়া করেছে—নানা চিঠিপত্রে এই অভিমানের প্রকাশ আছে। অখ্যাত অজ্ঞাতজনের কবিতা অনুবাদের মধ্যে পরোক্ষে সেটি কাজ করেছে বলে মনে হয়।

অনুবাদকে অনেকেই এখনও স্বাধীন শিল্পকর্ম বলে স্বীকার করতে চান না। অনুবাদ যে স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের মর্যাদা পেতে পারে তা মোহিতলালের অনূদিত কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায়। কবিতার অনুবাদ সবচেয়ে শক্ত কাজ—অনুবাদে রস-সঞ্চার করা কঠিন ব্যাপার সেজন্যে অনেকেই মনে করেন কবিতার সত্যিকার অনুবাদ হতে পারে না। সার্থক অনুবাদকর্ম খুব বেশী দেখা যায় না। বুদ্ধদেব বসু অনুবাদকে অন্যতম শিল্পকর্ম বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন, "কবিতার অনুবাদ সম্ভব কি সম্ভব নয় এই মস্ত বড়ো অর্থহীন তর্কটাকে টপকে পার হয়ে আমি অবিলম্বে বলতে চাই যে কবিতার অনুবাদও একটি সপ্রাণ সংক্রামক ও মূল্যবান সাহিত্যকর্ম এবং কখনো কখনো অনুবাদক আপন ভাষার কবি হলে—তা সৃষ্টিকর্মেরও মর্যাদা পায়।" মোহিতলালের অনূদিত কবিতাগুলি এই পর্যায়ের। তাঁর অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে এক একটি

নতুন কবিতা—শব্দগত তর্জমা নয় ভাবগত অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন প্রতিরূপ বা অনুরূপ। তিনি নিজের অনুবাদ সম্পর্কে কবিতাকারে যা বলেছেন সেটিই হচ্ছে তাঁর অনুবাদকর্মের প্রকৃত ভাষ্য—

কত সে কবির মানসী বিথারি' বরণ-মায়া
মোর মানসের রূপার মুকুরে রচিল যে নব-কায়া—
সে কি আসলের নিখুঁত নকল? কতটুকু রঙ কার?
ভাবনা সে মিছে—এ যে নদীবুকে আকাশের আবছায়া!

—হেমন্ত-গোধূলি

শ্রেণী হিসেবে অনুবাদকে দুভাগে ভাগ করা যায়—আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। মোহিতলাল যে পদ্ধতিতে অনুবাদ করেছেন তা আক্ষরিক নয়, ভাবানুবাদ। তা বলে মূল কবিতার রূপ ও রস তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। নিজের অনুবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "আমার অনুবাদ যেমন মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ নয়, তেমনই, ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়। অর্থ অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্ত দিলেও, আমি মূলের বাণীচ্ছন্দকে যতদূর সম্ভব বাংলায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা আমারই, এবং তাহা বাংলা বলিয়া যেটুকু রূপান্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্ত এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনা হিসাবেই অধিক—এরূপ দাবী আমি করি না; পাঠকগণকে কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে বলি—এগুলি বাংলা এবং কবিতা হইয়াছে কি না; তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে ইহাদের কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস, সবগুলি সমান না হইলেও, কতকগুলি—অনুবাদ এবং কবিতা, দুই-ই হইয়াছে।"

কবিতার অনুবাদ করার আগ্রহ মোহিতলালের প্রথম থেকেই ছিল, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তার আভাষ পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের মত তিনি খুব বেশী অনুবাদ করেন নি—অনুবাদের অজস্রতায় সত্যেন্দ্রনাথের নাম শিরোভাগে। সহধর্মিতা বা সহমর্মিতা কতখানি নিবিড় ও গভীর হলে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ভাষান্তর সম্ভব হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পর মোহিতলালের কবিতাগুলো তার প্রমাণ রেখে গেল। অনুবাদের কাজে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশী সতর্ক, অনেক বেশী সার্থক।

মোহিতলাল ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা জানতেন না সত্যেন্দ্রনাথও তাই। তিনি ইংরেজি কবিতাই বেশী অনুবাদ করেছেন, যেগুলি

অন্যভাষায় রচিত সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ থেকেই অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদ কর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) মূল ইংরেজি থেকে, সরাসরি ভাবানুবাদ; (খ) অনুবাদের অনুবাদ অর্থাৎ মূল জার্মান বা ফরাসী কিংবা ফারসী কবিতার ইংরেজি থেকে ভাবানুবাদ; (গ) কোন বিদেশী কবিতার অনুসরণে মৌলিক কবিতা রচনা। প্রথম শ্রেণীর কবিতার উদাহরণ কীটসের La Belle Dame Sans Merci (নিঠুরা রূপসী), টেনিসনের The Lady of Shalott (শ্যালটবাসিনী), Summer Night (নিশীথ-রাতে), ক্রিষ্টিনা রসেটির Song (গান), Remember (মনে রেখো), Uphill (দুর্গম), A birth day (জন্মদিন) প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার উদাহরণ বদলেয়ার (সন্ধ্যার-সুর), স্তোফান মালার্মে (অন্তর দাহ), হাইনে (আমার প্রিয়তমা, এমন রবে না, দ্বিতীয়বার, চরম-দুঃখ, জীবন-মরণ, ঘোষণা, প্রেমের স্বরূপ, গুপ্তকথা, কৈফিয়ৎ, জালালুদ্দিন রুমির গজল) প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীর কবিতার উদাহরণ ভিকটর হুগোর অনুসরণে 'উচ্চৈঃশ্রবা', সুইনবার্নের Lines from Anactoria-র অনুসরণে 'সুইনবার্নের অনুসরণে' জর্জ সিলভিষ্টার ভিরেকের 'নাগার্জ্জুন', 'প্রেতপুরী' প্রভৃতি কবিতা।

ছয়

মোহিতলালের কবিতার প্রায় সব কটি বৈশিষ্ট্য দেখাতে চেষ্টা করলাম। এবার সংক্ষেপে কবি-মানসের ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করতে পাঠকের খুব বেশী অসুবিধে হবে না।

প্রথম পর্যায়ের 'স্বপন-পসারী' (১৩২৮), 'বিস্মরণী' (১৩৩৩), 'স্মর-গরল' (১৩৪৩) কাব্য প্রধানতঃ নারীর সৌন্দর্যতত্ত্বের কাব্য। এ তিনকাব্য পরস্পর ক্রমানুবর্ত্তী—একই ধারার প্রসাধনকলায় সংযম ও শুচিতার চরম পরিণতি। 'স্বপন-পসারী' যৌবনের রোমান্টিক স্বপ্নে অধীর—একদিকে সংস্কারকে পদদলিত করে চলা (যেমন 'পাপ') অপরদিকে জীবনের গভীরতম ব্যথা-বেদনায় উদ্‌বেলিত চিত্তকে শাক্তমন্ত্রে প্রকাশ করা (যেমন 'অঘোর-পন্থী')। এই কাব্যের ওপর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন নয়, বিশেষতঃ আরবী-ফারসী প্রভাবিত কবিতাগুলিতে (যেমন 'চোখের দেখা', 'দিলদার', শ্রাবণ রজনী', 'চুড়ির আওয়াজ', 'রূপতান্ত্রিক', 'গজল-গান' প্রভৃতি)। প্রথম জীবনের অসংযত রোমাণ্টিসিজম স্থানে স্থানে ফেনিল হয়ে

উঠেছে। এ কাব্যকে একটা নতুন ভাবের experiment বলা যেতে পারে, ভাব থেকে ভাবালুতাই বেশী, তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানে দানা বেঁধে ওঠে নি। 'স্বপন-পসারী'র ছন্দের চটুলতা ও ভাষার উচ্ছলতা 'বিস্মরণী'তেই সংযত গাম্ভীর্যে উদাত্ত হয়ে উঠেছে। ক্রোচের কথায় 'আবেগের যন্ত্রণা থেকে ধ্যানের স্থৈর্যমুখে অভিযান' কবির এখান থেকেই শুরু। ভাবের দিক দিয়ে 'স্মর গরল' 'বিস্মরণী'র ক্রমানুবন্ধী হলেও পরিণত বয়সের মননশীলতা ও পরিপক্বতার জন্যে রসিকের চেয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এখানে গড়ে উঠেছে—দেহানুভূতির ধূপ কখন্ ছাই হয়ে গেছে, সুরভিত স্মৃতির ধোঁয়াটুকু চেতনায় ছেয়ে আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের যৌবন-বৈশাখের উজ্জ্বল দীপ্তি 'হেমন্ত গোধূলি'তে (১৩৪৮) প্রকৃতি-প্রণয়ের প্রসাধন-পারিপাট্যে নারীর বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করাই কবির লক্ষ্য। প্রথম যৌবনে প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মেই হয়ত তাঁর রচনায় তথাকথিত মর‍্যালিটিদের মতে আদিরসের প্রাখর্য ছিল 'কস্তু 'হেমন্ত-গোধূলি' এবং তৃতীয় পর্যায়ের একমাত্র অথচ সর্বশেষ রচনা 'ছন্দ-চতুর্দশী' (১৩৫৮)-তে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবীণতায় তাঁর এই সৌন্দর্যজ্ঞান সমস্ত প্রয়োজনীয়তার সঙ্কীর্ণ সীমা হতে দূরে তার বিশুদ্ধতার মধ্যে—তার অখণ্ডতার উপলব্ধি করবার তত্ত্ব প্রকাশ করেছে। তাঁর কল্পনা এ স্তরে আশ্রয় করল তত্ত্বকে; মনে হয় প্রাণ এখন সেই পূর্বের মত আনন্দ পেতে চায় না, সে চায় এমন একটা কিছু যাকে নিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। যখন থেকে ভালোবাসার মন্ত্র অর্থাৎ প্রীতির সহজ আত্মসন্তোষ বিঘ্নিত হয়েছে তখন থেকেই তিনি যেন আপন ধর্মে সংশয়ান্বিত হয়ে তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসাকে একটা উচ্চমার্গের তত্ত্বে উপনীত করতে চেয়েছেন—'স্মর-গরল' থেকেই তার সূত্রপাত। তাই 'হেমন্ত-গোধূলি' 'ছন্দ-চতুর্দশী'র মোহিতলাল আর পূর্বতন কাব্যের মোহিতলালের সঙ্গে প্রভেদ অনেক: বয়সে, প্রবীণতায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে। তাঁর কাব্য পড়ে এই কথাই এখন বুঝতে পেরেছি, একদা যে লেখনী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনবার জন্যে দর্পিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল আজ 'হেমন্ত-গোধূলি' ও 'ছন্দ-চতুর্দশী'তে তা হয়ে উঠেছে আরও স্নিগ্ধ, আরও সংযত। নারীর দেহের রূপময়তা নিখিল সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

> ভালবাসা? হাসির কথা!—উড়িয়ে দিছি অনেক দিন,
> বালুর উপর ঝাউ-এর ছায়া তার চেয়ে যে ঢের রঙীন।
>
> —বালুকা-বাসর: হেমন্ত-গোধূলি

ছোটদের জন্য এককালে তিনি কতকগুলি কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি একত্র করে 'রূপকথা' (১৩৫২) নামক এক কবিতার বই বের করেন। কবিতাগুলো ঠিক শিশুপাঠ্য নয়, এমন কি কিশোরদের হাতে তুলে দিলেও অনেক ক্ষেত্রে অর্থ তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে, যেমন 'শিউলির বিয়ে', 'পুষ্পজীবন'। বালক ও কিশোরদের কথা মনে রেখে ভাব-অনুভূতিকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করলেই তা শিশু তথা কিশোর সাহিত্য হয় না—বয়সের প্রবীণতাকেও অনেকটা নবীনতার সাজে সাজাতে হয়। মোহিতলাল কোনদিন কিশোর ভোক্তার অনুরূপ মন নিয়ে কোন কিছু ভাবতে পারেন নি—ভাবকে হাল্‌কা করে নিয়ে ভাবা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ তিনি সহজ আনন্দের সুরকে ধ্রুপদী করে তুলেছেন। 'রূপকথা'র মধ্যে সহজ হবার চেষ্টা আছে, কিন্তু সর্বত্র সে চেষ্টার যথার্থ প্রতিশ্রুতি নেই।

সাত

মোহিতলাল মজুমদারের কবি-স্বভাব ও কবি-ধর্মের মর্মকথা বলা হল। এবার তাঁর কবিত্ব-কলার ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে দুটো কথা বলতে ইচ্ছা করি।

কবিদের মধ্যে দুটো জাত আছে—এক হল, যাঁরা প্রেরণার বশবর্তী হয়ে লেখেন যাঁদের কাছে আবেগই প্রধান, আর এক হল যাঁরা ভেবে-চিন্তে লেখেন অর্থাৎ যাঁরা বুদ্ধিচর্চার প্রতি নির্ভরশীল। প্রথম জাতের কবি হলেন শেলী, বার্নস, নজরুল। আর দ্বিতীয় জাতের হলেন মিল্টন, মধুসূদন, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ। সৃষ্টিকে বিদ্যা ও বুদ্ধিমার্জিত চিত্তফলকে প্রতিফলিত করে কবিতা লেখেন বলে মোহিতলালের কবিতার ভাব এবং বিন্যাস গাঢ়বদ্ধ। কথাকে তিনি ব্যবহার করেছেন মণিকারের মত; অতি সাবধানে কেটে কেটে ধ্বনিকল্লোলিত সাংস্কৃতিক পদবিন্যাসে, বিচিত্র উপমা ও অলঙ্কারাদির সাহায্যে ভাষার মধ্যে অধিকতর অর্থময়তা সৃষ্টি করে নিজের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন যাকে বলা যায় like a jeweller but finishes like a Titan. মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা তাঁর নিজের কাব্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য, "শব্দের মার্জিত মুকুরে বস্তুর বস্তুরূপ এবং ভাবের অর্থশ্রী উজ্জ্বল ও স্ফুটতর হইয়া উঠে। তবে ইহা কেবল শব্দ লইয়া নিছক কারিগরীও নহে। ইহার পশ্চাতে মনের দীপ্তিকে কারুকলায় ভূষিত করিয়া কবিতায় রূপ দিতে পারিতেন। এইখানেই তাঁর

অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব।" (আধুনিক বাংলা সাহিত্য)। তাই তাঁর কবিতাগুলো নিবিড় সংযমী সুরের কবিতা হিসেবে বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয় গৌরব হয়ে রইল।

মাথা খাটিয়ে কবিতা লেখেন বলে রচনা-বিন্যাসে তাঁর সতর্ক উজ্জ্বলতা আমার ভাল লাগলেও তাঁর কোন কোন কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি নি। অবশ্য নানা ধরনের বইপত্র অভিধান খুলে দুর্বোধ্য ভাব, দুরূহ শব্দ বা উল্লেখগুলোর অর্থ খুঁজলে হয়ত এ জাতের কবিতার মর্ম উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ঐভাবে অর্থোদ্ধারের প্রতি আমার অনীহা অপরিসীম। কারণ, ভালো কবিতা সম্বন্ধে কোলরিজ বলেছেন, "Poetry gives most pleasure when only generally and not perfectly understood" অর্থাৎ কবিতার চরম আনন্দ দান তখনই ঘটে যখন তার সবটা বুঝি না। যখন সবটাই বুঝতে পারি তখন কবিতা দাঁড়ায় পদ্যের পর্যায়ে, যা নিতান্ত ছন্দের মিল। যেমন 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' অথবা 'কী কারণ ভীরু তব মলিন বদন'। পড়ে বুঝতে হবে এমন ধারণা নিয়ে কবিতা পাঠে মন দেবার প্রয়োজন নেই। কবিতা অনেকটা গানের মত—শোনার আনন্দটাও যথেষ্ট। ছন্দের তালে চিত্ত দুলে ওঠা, সুরের মিষ্টতায় ভাল লাগা, মধুর শব্দে চমক লাগা—এও অনেক। এই জাতের কবিতা মোহিতলালের, বোধগম্য হবার আগেই তাঁর কবিতা মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু এখানে একটু ত্রুটির কথা উল্লেখ না করলে এই প্রবন্ধকে মোহিত-লালের কবি-প্রতিভার সমালোচনা অপেক্ষা অন্ধ প্রশস্তি বলে ধরা হবে। মোহিতলালের সব কবিতা পড়েই যে আমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাই তা বলতে পারব না। যথাবিহিত দ্বিধা নিয়েই বলছি, হৃদয়াবেগকে বুদ্ধির বর্ম পরিয়ে প্রকাশ করতেন বলে মাঝে মাঝে ভাব, ভাষা ও ছন্দোগত কৃত্রিমতা এসে গিয়েছে। তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে আত্ম-সচেতনতার প্রকটতা রসাস্বাদনের প্রধান অন্তরায় ঘটায়। কাব্যের মর্মস্থলে মোহিতলাল নিজস্ব ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যখনই প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছেন তখনই কবি-কল্পনার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের সংঘাত দেখা দেবার ফলে কাব্যের ভাবপ্রকাশধারা আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। 'স্মর-গরল'-এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যাবে—কাব্য-পাঠক সে স্থলে ক্ষুব্ধ। মুসলমানী ঐতিহ্য তাঁকে প্রত্যক্ষ প্রেরণা দেয় নি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে আরবী-ফার্সী সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য

জন্মেছিল। একজন্তে তাঁর কবিতায় আরবী-ফার্সী শব্দ সর্বক্ষেত্রে গভীরতার দ্যোতক হিসেবে প্রস্ফুটিত হয় নি। গুণের তুলনায় তাঁর ত্রুটি খুবই সামান্ত এবং এতই উপেক্ষণীয় যে আমি তা নিয়ে আক্ষেপ করতে রাজী নই।

আট

কবি মোহিতলালের আলোচনা আমি ইচ্ছা করেই দীর্ঘ করলুম কেন না কবি-প্রতিভার এতখানি মৌলিকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাব্য স্বল্পালোচিত রয়ে গেছে। যশ সম্বন্ধে যদিও তাঁর মোহ ছিল না তাহলেও তাঁর চিরদিনের আক্ষেপ এবং অভিমান ছিল, তাঁর কবিতা বা সমালোচনার পাঠক খুব অল্প; তাঁকে কেউ চিনলো না, তাঁর কথা কেউ শুনলো না। 'বিস্মরণী'র দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা'য় বলেছেন, "আমি যে কখনও কবিতা লিখিয়াছিলাম তাহা এতদিনে পাঠকসমাজ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন, আমারও মাঝে মাঝে সে-বিষয়ে সন্দেহ হয়।...এখন দেখিতেছি...যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই ভবিষ্যদ্‌বাণীর মত সত্য হইয়া উঠিয়াছে—

আমারে তোমরা ভুলে' যেয়ো ভাই!
এসেছিনু পথ ভুলে'—
পান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্তিনাশার কূলে!"

'কীর্তিনাশার কূলে' মোহিতলাল যে স্মরণীয় কীর্তি রেখে গেলেন যার মূলে রয়েছে নিছক কাব্য-সাধনা নয় একটি বিশিষ্ট জীবন-সাধনা, যত দিন যাবে ততই ফুটবে তাঁর কাব্যের দীপ্তি, ভবিষ্যতের বাঙালী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-নাথের পর তিনি হবেন অন্যতম প্রধান কবি, কারণ তাঁর কবিতা নির্মাণের কলা-কৌশল, তার বিশুদ্ধ সংযত কঠিন ক্লাসিক্যাল রূপ আমাদের দেশের তরলায়িত কাব্যভূমিতে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই পরিগণিত হবে॥

মোহিতলালের সনেট

রোদ্দুর-ঝরা ফুটন্ত সকালে এ প্রবন্ধটা লিখতে বসে মনে মনে ভাবছি আরম্ভটা কীভাবে করা যায়! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনের দরজায় এসে পৌছল দূর-অতীতের এক কবির কণ্ঠস্বর। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রদীপ্ত সূর্যের উদ্দীপ্ত উক্তি—"কে বলে বাংলাভাষায় চমৎকার সনেট লেখা যায় না? এমন একদিন আসবে আমাদের ভাষার সনেট ইটালীয়ান সনেটের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে।" সত্যিই সেদিন এসেছে কিনা সে-বিচারের স্পর্ধা আমার নেই, তবে বিশ্বাস করি, তাকে এবং তাঁর পরবর্তীকালের সনেট রচয়িতাদের নিয়ে গর্ববোধ করার দিন হয়ত এসেছে।

বলা বাহুল্য উক্তিটি করেছিলেন দত্তকুলোদ্ভব কবি মধুসূদন, যিনি আমাদের সাহিত্যে বাংলা-সনেটের উদ্বোধক। তাঁর রাজপথে যাঁরা এগিয়ে বাংলা-সনেটকে রত্নভাণ্ডার করে তুলেছেন সেইসব বিগতদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার অন্যতম। এঁদের সমসাময়িক কিংবা পরবর্তীদের মধ্যে সুশীলকুমার দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, ফররুখ আহমদ সনেট রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সনেট রচনায় মোহিতলালের কৃতিত্ব কোন্‌খানে তা নির্দেশ করতে গেলে এদেশী ও বিদেশী সনেটের গঠনভঙ্গী আলোচনা ক'রে সেই পটভূমিকায় তাঁকে দাঁড় করিয়ে তাঁর সনেটের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হবে।

সনেটের জন্ম ইটালীতে। ইটালীয়ান 'সনেটো' (মৃদুধ্বনি) শব্দ হতে 'সনেট' কথাটির উৎপত্তি। কবি গীত্তোনি প্রথম সনেট রচনার প্রবর্তন করলেও চতুর্দশ শতকে ইটালীর রেনেসাঁস যুগের কবি পেত্রার্কই প্রথম সার্থক সনেট রচয়িতা—তাঁর সনেটের গঠনাকৃতি থেকেই সনেটের নিয়মগুলি উদ্ভূত হয়েছে। ইতালী হতে ইউরোপের নানা দেশে সনেট রচনার রীতি ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে দ্যুবেলারি, মারো, ইংলণ্ডে টমাস ওয়াট, সারে সর্বপ্রথম সনেট রচনা আরম্ভ করেন। এলিজাবেথীয় যুগের মহাকবি শেক্সপীয়ারের হাতে সনেট গতানুগতিকতা পরিহার করে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং একক অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পরূপ

পরিগ্রহ করে। পেত্রার্ক-রীতির পর শেক্‌সপীরীয় রীতি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এলিজাবেথীয় যুগকে অতিক্রম করে সনেট রচয়িতা হিসেবে যাঁদের সাক্ষাৎ লাভ করি তার মধ্যে বেন জনসন, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, এলিজাবেথ ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ, রসেটি, রুপার্ট ব্রুক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা পেত্রার্ক ও শেকস্‌পীরীয় দুটি রীতি থেকে কিছু কিছু নিয়ে মিশ্ররীতিতে সনেট রচনা করেন। কাব্যজগতে অধিক সংখ্যক সনেট-রচনা এই মিশ্ররীতিতেই হয়েছে।

এই তো গেল সনেটের মোটামুটি ইতিহাস। এবার আসা যাক কোন্ কোন্ কবিতাকে সনেট বলা হয়, সাধারণ কবিতা থেকে সনেটের ভাবমূর্তির বৈশিষ্ট্য কোথায় সে কথায়, তার গঠনাকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাও এ প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক।

মধুসূদন সনেটের বাংলা করেছিলেন 'চতুর্দশপদী'। তিনি একশ'টি সনেট লিখে ১৮৬৬ সালে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এ প্রতিশব্দ দিয়ে ইংরেজিতে সনেট বলতে যে ভাবময় ছন্দ বোঝায় তা বাংলায় অনুবাদ করলে তার কোন ব্যঞ্জনাই ফুটিয়ে তোলা যায় না। মোহিতলাল তাঁর সনেটের বইয়ের নাম দিয়েছেন 'ছন্দ-চতুর্দশী'—চতুর্দশপদীর চেয়ে কিছুটা perfect কিন্তু কবিতার বাইরে তিনি সে নাম নিয়ে সনেটের আলোচনা করেন নি, তাকে 'সনেট' বলেই উল্লেখ করেছেন।

সনেটের সঙ্গে গীতি-কবিতার ভাবগত তফাৎ নেই, রয়েছে শুধু প্রকারগত প্রভেদ। গীতিকবিতার মধ্যে যেরূপ ব্যক্তিক অনুভূতি ধ্বনিত হয় তেমনি সনেটেও একটি হৃদয়াবেগ সমগ্র অখণ্ডরূপে প্রকাশ পায়। একটি আবেগ বা কল্পনা চোদ্দটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পযন্ত ভাবের সংহতি সাধনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হয়। তা বলে চোদ্দ ছত্রের কবিতামাত্রেই সনেট হয় না, যদিও চোদ্দ লাইন নিয়ে তার কারবার। সঙ্গীত-তরঙ্গ সৃষ্টি করার জন্যে তার ভেতরে ও বাইরে এমন কতকগুলো লক্ষণ থাকা চাই যার জন্যে সব চতুর্দশপদীকে সনেট আখ্যা দেওয়া যায় না আর ঐ কারণের জন্যে সবাই উৎকৃষ্ট সনেটও লিখতে পারেন না।

সনেটের গঠনাকৃতি নিয়ে খুব বেশী কথার মধ্যে না গিয়ে থিওডোর ওয়াটস ডানটন সনেটের ছন্দবন্ধন ও ভাবব্যঞ্জনা সম্বন্ধে যে বিখ্যাত সনেটটি লিখেছেন সেটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই সবকিছু বলা হবে—

A sonnet is a wave of melody :
From heaving water of the impassioned soul,
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "Octave", then returning free
Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of life's tumultous sea.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সনেটকে 'অষ্টক' ও 'ষটক' দু'ভাগে ভাবে ও রূপে স্পষ্ট হতে হবে ; অষ্টকে ভাবের উত্থান ও ষটকে সে ভাবেরই ঘনবিন্যস্ত পতন থাকবে অথচ সমগ্র কবিতাটি 'one and whole' হওয়া চাই যাতে গভীর অর্থপূর্ণ ভাব থাকবে, থাকবে না কেবল হেঁয়ালী বা ধোঁকার কারসাজি। ভাবের 'dignity' ও 'repose' থাকার জন্যে ইংরেজি ভাষার মত বাংলাতেও দ্বৈমাত্রিক বা যুক্তাক্ষরমূলক মিল ব্যবহার করা নিয়মবিরুদ্ধ। নিয়মের বন্ধন এতখানি কঠোর বলে প্রথম শ্রেণীর কবিরা সনেট রচনায় তেমন সফলকাম হতে পারেন নি। সনেটের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনেকে সনেট লিখতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চতুর্দশপদী কবিতা করে তোলেন। সবাই রবীন্দ্রনাথ আর শেক্সপীয়ার নন যে নিজস্ব কবি-কল্পনা ও রসানুভূতির জোরে সনেটের মধ্যেই এক নতুনধারা এনে ফেলবেন। তাঁরা মানিয়ে নিয়েছিলেন বলে অন্যান্য কবিরাও যদি অত স্বাধীনতা দাবী করে বসেন তবে তাঁদের রচনায় 'একো হি দোষো গুণ-সন্নিপাতে' শেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথের মত অদৃশ্য হয়ে থাকবে না। সনেট-রচনা যার-তার কর্ম নয়। রচয়িতার বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন কারণ গলা ছেড়ে প্রাণ খুলে তাল ধরতে গেলে সনেট হবে না—প্রাণের আকুতিকে সংযমের বন্ধনে বাঁধতে হবে। তাই সিডনী লী বলেছেন, "A perfect sonnet is one of the most difficult forms of poetry, only the fullest command of the harmonies of language and the ripest power of the mental concentration ensure success."

মধুসূদন পেত্রার্ক ও শেক্সপীরীয় সনেটের গঠনভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলির নিয়ম রাখতে গিয়ে রসমূর্তির অখণ্ডতা রাখতে পারেন নি—কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছে। এজন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ মধুসূদন যখন সনেট রচনায় হাত দিয়েছিলেন তখন তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে, তাঁর প্রতিভা পশ্চিম গগনে অস্তমিতপ্রায়। তবু একথা স্বীকার না

করলে ইতিহাসকে অমর্যাদা করা হবে—সে সঙ্গে কবিকেও—যে তাঁর কাছ থেকেই আমরা সনেটের একটা সুস্পষ্টরূপ ও ছন্দোবিন্যাস প্রথম পেয়েছিলাম। দোষ-ত্রুটির মধ্যেও তাঁর সনেটের কাব্যগত মূল্য রয়েছে অনেক কিন্তু তার চেয়েও বেশী রয়েছে দোষ-গুণ জড়িয়ে তার ঐতিহাসিক মূল্য। এরপর দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছে' যে ভাবগভীর সংহত সনেট পাওয়া যায় তার জুড়ী খুব বেশী নেই। কিন্তু যথার্থ সনেট বলতে অর্থাৎ পেত্রাকীয় রীতির সনেট সেগুলি নয়। সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসের রীতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবিরা যেমন নিজের সুবিধানুযায়ী পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করে নিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ সেনও তাই করেছেন। তবে কবিগুরুর মত সনেটকে চতুর্দশপদী লিরিক করে তোলেন নি, গঠনে ও ভাবে সনেটিক গাম্ভীর্য এনেছেন। অক্ষয়কুমার বড়ালও সনেটের ভাব-শাসন স্বীকার করেছেন কিন্তু আদি সনেটের ছন্দশাসন মানেন নি। তাঁর সনেটগুলি ভাবে ও ভাষায় যেমন সুসমৃদ্ধ, গীতরসে তেমন সমুজ্জ্বল নয়। তাহলেও এ'দুজনের রচনায় সনেটের কাব্যরস পূর্ণরূপে বিদ্যমান। প্রমথ চৌধুরী বিদেশজাত সনেটকে আপন করে নেবার জন্যে বলেছিলেন—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।
ইতালীর ছাঁচে ফেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ,—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।—সনেট : সনেট-পঞ্চাশৎ

সনেটকে বাংলায় আনতে গিয়ে তিনি পূর্বোক্তদের চেয়ে অনেক বেশী নিয়ম-ভঙ্গ করেছেন। তিনি পেত্রার্ক ও শেক্সপীরীয় সনেটে না গিয়ে ফরাসী কবির শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর গদ্যে যেমন তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গিমাটি পাওয়া যায় সনেট লিখতে গিয়েও সেই হৃদয়কে বর্জন করে বুদ্ধিকে গ্রহণ করেছেন—সেটা যেন বীরবলী গদ্যরীতির কাব্যরূপায়ণ। তাঁর কাছে বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাক্যের মর্যাদা ভাবরস-সমন্বিত বাক্যের চেয়েও বেশী—পরিহাস-রসিকতা, শ্লেষাত্মকরীতি তাঁর সনেটের প্রধান বাহন। বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমন্বয়ে সনেট হল 'a moment's monument'. শুধু ভাবকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছেন বলে ভাববস্তু concrete হয়েছে, abstract হয় নি অর্থাৎ 'high

seriousness'-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর মত একূল ওকূল হারান নি, নিয়ম ভাঙতে গিয়ে ভাবের মধ্যে বুদ্ধির চাবুক মারেন নি। তিনি সনেটের নিয়মভঙ্গ করেছেন তার গঠনের দিক দিয়ে কিন্তু তার internal movement-কে ক্ষুন্ন করেন নি। তাঁর 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যে যে সমিল পয়ার চতুর্দশপদী কবিতা আছে সেগুলি 'সনেট' বলে অনেকেই মানেন না। না মানুন ক্ষতি নেই। রবীন্দ্রনাথ নিয়ম ভেঙে অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, অন্যান্যদের মত ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে ভাবের গলা টিপে মারেন নি।

এঁদের পরেই আসছেন মোহিতলাল। তাঁর কবি-চেতনায় 'রোমান্টিক' ও 'ক্ল্যাসিক্যল' ভঙ্গী দুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাঁর হৃদয়ের গভীরে বোধির রাজ্য ছিল বলে রোমান্টিক বিষয়কে তিনি ক্লাসিক ভঙ্গীতে গড়ে তুলতেন এবং এরই সঙ্গে তাঁর ক্রিটিক মনটি তাঁর সমগ্র কবিপ্রাণকে ঘিরে রাখত। সেজন্যে দেখি, কবিতা বা সাহিত্য-সৃষ্টির যে-রূপটি যেখানে যেমন হওয়া উচিত তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের অভিব্যক্তির মধ্যেও সেইরূপটির যথাযথ প্রতিফলন পাওয়া যায়। মন ও কলমের এরকম সমন্বয়ের উদাহরণ আমাদের বাংলা সাহিত্যে তেমন সুলভ নয়, ইংরেজি সাহিত্যে ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। তাই সনেটের সংহতরূপকর্ম ও ছন্দোবন্ধের শাসন তাঁর কবি-প্রতিভার প্রতিকূল হয় নি, অনুকূলই হয়েছে।

ইটালীয় সনেটের প্রসার করতে গিয়ে মধুসূদন বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি; দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ঐ রীতির আনুগত্য স্বীকার করে চলেন নি। যেখানে তাঁরা আদি-সনেটের আকৃতি (পেত্রার্কীয়) রাখতে গিয়ে পারেন নি, ভাবপ্রকাশের জন্যে নিয়মের শিথিলতা করেছেন, সেখানেই হল মোহিতলালের কাজ করার পালা। তিনি যদিও প্রথমের দিকে সনেটের মিলবিন্যাসে শেক্‌সপীরীয় রীতি গ্রহণ করেছিলেন, রূপ নির্মাণে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল, পরে তা কাটিয়ে উঠে পেত্রার্কীয় রীতিতেই নিজের স্বকীয়তা প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি মনে করতেন যে সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসের রীতি আদি সনেটের মতই হওয়া দরকার, বিশেষ আকৃতিটি না হলে সনেটের নিজস্ব সঙ্গীত-ধ্বনিটি ধরা দেয় না, কারণ ভাবনার সহিত ভাবের গভীরতা ও সংযম রক্ষা করতে হলে মুক্তবন্ধ সনেট অপেক্ষা আদি সনেটের রূপই প্রশস্ত। কাজেই সেই বিশ্বাস অনুসারে পরবর্তী কালে পেত্রার্কীয় রীতিতে গোড়াওপর

সনেট লিখেছেন—বাংলা সনেটের ইতিহাসে মোহিতলালের শ্রেষ্ঠত্ব ওইখানে। তাঁর কথার মধ্যেই আমার এ-কথার সমর্থন রয়েছে। তিনি 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইতে বলেছেন, "এইরূপ সনেটের (পেত্রার্কীয় রীতি) অভিপ্রায়—ভাবকে একটি বিশেষ গঠনে বা ছাঁচে ফেলিয়া, তাহার রূপ ও সৌষ্ঠব, দীপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি করা; সেই বিশেষ গঠনটিই ইহার সর্বস্ব। এই গঠন এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার লঙ্ঘন কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর,—যেন ঠিক ওই ছাঁদে বিন্যস্ত না করিলে তাহার রস উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। · বাংলা সনেটের এইরূপ বিবর্তন রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে ঘটিবার কথা নয়—পূর্বে হইবারই কথা; অতিশয় উচ্ছল গীতিকবিতার যুগে সেরূপ 'ক্ল্যাসিক্যাল' সংযম কোন কবিকেই শোভা পায় না; এজন্য একজন অর্বাচীন অ-কবির হাতেই সনেটের এই কঠোর বন্ধনদশা ঘটিয়াছে,—আমি নিজে, পদবন্ধের মতই সনেটের এই গঠন লইয়া এককালে কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিলাম।" (বাংলা সনেট) তাই বলা যেতে পারে ছন্দচতুর্দশী'র সগোত্র সনেট বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না।

গানের ব্যাকরণ জানলেই যেমন গায়ক হওয়া যায় না, গানের গলাও থাকা চাই, তেমনি মোহিতলাল পেত্রার্কীয় রীতির ব্যাকরণটিই নেন নি তাঁর গলার সুরও নিজের গলায় তুলে নিয়েছেন। আদি সনেটের বাংলা রূপের উদাহরণ নিয়ে দিলাম—

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী।
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরু-ধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী ?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে—
যে-বাণী আকাশে উঠে, শিখা যায় হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম-নিবাসিনী !
করি উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ;
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে !

এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা ?—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে !

—পয়ার : ছন্দ-চতুর্দশী

পেত্রার্কীয় সনেটের মতো এ সনেটটি প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে (অষ্টক) প্রত্যেকটি চার চরণ করে আট চরণে দুটি শ্লোক গঠিত। এর মিল ক খ খ ক ; ক খ খ ক। দ্বিতীয় ভাগ ষটকের মিল-বিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা থাকে গ ঘ গ, গ ঘ গ বা গ ঘ, গ ঘ, গ ঘ, কিংবা গ ঘ গ, ঘ গ ঘ। এই সনেটে ষটকের মিল-বিন্যাস রয়েছে গ ঘ, গ ঘ, গ ঘ। ষটকে তিনি সবরকমের মিলই গ্রহণ করেছেন। কিছু sonet sequence-ও রচনা করেছেন যেমন 'শরৎচন্দ্র' 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'স্বপ্নসঙ্গিনী' 'নির্বেদ' প্রভৃতি। অষ্টকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে ভাবস্রোত সম্পূর্ণ মোড় ফিরেছে, ষটকে ভিন্নমুখে ফিরে আবার সেই অষ্টকের ভাবে এসে মিলেছে। দুটি ভাবকে একভাবে মিলিয়ে দেবার শক্তি শুধু সনেটের ছকের জন্যে সম্ভব হয় না, প্রধানতঃ নির্ভর করে কবির বিশিষ্ট প্রাণশক্তি ও নিপুণতার ওপর। ফরমূলামাফিক সাজিয়ে গেলে সনেটটি নিখুঁত হবে কিন্তু ভাবের সঙ্গে প্রাণের যোগসাধন না করলে স্বানুভূত আনন্দ-বেদনা কাব্য-বিচারের দিক দিয়ে কৃত্রিম হয়ে পড়বে। তাই উৎকৃষ্ট সনেট রচনার জন্যে চাই অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ, অটল গাম্ভীর্য ও অপরিমিত সংযম। মোহিতলালের মধ্যে এই সকল গুণ পুরোমাত্রায় ছিল। কবিতায় ও গদ্যে মোহিতলালের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা যায় যেমন স্বতঃস্ফূর্তির অভাব, বাঙালীয়ানার উচ্ছ্বাস, নৈরাশ্যবাদিতা ইত্যাদি. এগুলি থেকে তাঁর সনেট আশ্চর্য রকমের মুক্ত। সকল উৎকৃষ্ট সনেট-কবির ন্যায় মোহিতলালের সনেটও গঠন ও উপকরণের সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল। শেক্‌সপীয়ারের সনেটের রোমান্টিক উন্মাদনা, মিলটন-ওয়ার্ড-সওয়ার্থের উদাত্ততা মোহিতলালের সনেটের মধ্যে ভাবপ্রগাঢ়তার এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। ভাবের উজ্জ্বলতা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এখানে সংযমসুলভ গাম্ভীর্য লাভ করেছে, মননকে precise করে ভাষণে concise করে এনেছেন, মিতবাকের সঙ্গে ঋতবাক হয়েছেন। তাই তাঁর সনেটের হাত অতুলনীয়। অতুলনীয় অর্থে ঘন অথচ সুস্পষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর এদিককার পরিচয় কবিতা-গল্প-উপন্যাস-রম্যগদ্য পরিতৃপ্ত পাঠকের চেনামহলের বাইরে প্রতীক্ষা করছে।

গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর সনেটের মোট সংখ্যা ১০৩

আর সনেটের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম যে প্রশস্তিমূলক কাব্য পুস্তিকা 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' বেরোয় সেটি ছিল ১৬টি সনেটের সমষ্টি। এই পুস্তিকায় সনেটগুলি প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ও শেক্‌সপীয়রীয় রীতির দ্বারা প্রভাবিত। এই পর্বে সনেটের আঙ্গিরূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণা, স্বকীয়তা ও অভিব্যক্তি পাকা হয় নি বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তীকালে তিনি এই পুস্তিকা আর মুদ্রণ করেন নি। শুধু দ্বাদশ সংখ্যক সনেটকে 'ছন্দচতুর্দশী'র উৎসর্গ কবিতারূপে গ্রহণ করেছেন। এরপর তাঁর চারিটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থে তাঁর কিছু কিছু সনেট ছিল। সবশেষে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহের সনেটগুলি বাছাই করে নয়টি নতুন সনেট (প্রণয়ভীরু, বিবাহমঙ্গল, দুর্গোৎসব ১-২, নট-কবি শিশির-কুমার, প্রেম, কবির প্রেম, স্মরণ ও মরণ) যোগ করে ১৩৫১ সালে 'ছন্দচতুর্দশী' বইটি বের করেন। উৎসর্গ কবিতাসহ ৫৯টি শিরোনামে ৮৬টি সনেট আছে। মার্লামে, রুপার্ট ব্রুক, রসেটি, সিমণ্ডস, বুকানন, ডাওডেন, ওয়াইট কবিদের রচিত আটটি সনেটের অনুবাদও রয়েছে। মধুসূদন তাঁর সনেটে অষ্টক ও ষটকের বিভাগ সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারেন নি। মোহিতলাল এই দুটি বিভাগ স্পষ্টভাবে রক্ষা করলেও, স্তবক গঠনে কিছু কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'অমৃতের পুত্র' ৫+৭+২, 'প্রণয়-ভীরু' ১০+২, 'দ্রৌপদী ১' ৪+৬+৪, 'বঙ্গলক্ষ্মী ২' 'বঙ্কিমচন্দ্র ৫' ৪+৪+৬, 'বঙ্কিমচন্দ্র ৩' ৪+৪+৩+৩, 'মুক্তি' ৮+৪+২—স্তবক গঠনে তাঁর এই অভিনবত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কল্পনা' 'বুদ্ধিমান' 'দুর্গোৎসব ১-২' 'প্রেম ও কর্মফল' 'কবির প্রেম' সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে চতুর্দশী মাত্র। 'প্রণয়ভীরু' ও 'স্মরণ' বাদে বাকী সনেট-গুলির মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয় পদ্ধতিতে। ষটকের মিলবিন্যাসেও তাঁর বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন 'পয়ার', 'ত্রিস্রোতা', 'অন্তিম', 'বিবাহমহল', 'শ্রাবণ-শর্বরী' 'বনভোজন', 'নিশান্ত', 'প্রকাশ', 'দ্রৌপদী ১-২', 'বঙ্গলক্ষ্মী ১', 'বঙ্কিমচন্দ্র ৬', 'রবির প্রতি', 'শরৎচন্দ্র ২-৩', 'সত্যেন্দ্রনাথ', 'নট-কবি শিশিরকুমার', 'রুপার্ট ব্রুক ১/৬', 'কবিধাত্রী ১', 'মরণ', 'যাত্রাশেষে ২-৩' 'বিদায়' মিলবিন্যাস গ ঘ, গ ঘ, গ ঘ। 'উপমা', 'স্বপ্ন নহে' 'স্মরগরল', 'ফুল ও পাখী ১-৩', 'স্বপ্নসঙ্গিনী ১-২', 'নির্বেদ ১-৩', মিলবিন্যাস গ ঘ ঘ, গ গ ঘ। 'পৌর্ণমাসী', 'বঙ্কিমচন্দ্র ২' 'কবিধাত্রী ২-৩', 'মুক্তি', 'যৌবন-যমুনা', 'স্বপ্নসঙ্গিনী ৩' 'যাত্রাশেষে ১' মিল-বিন্যাস গ ঘ গ, ঘ ঘ গ। 'নিশুতি' 'ঊষা' 'বঙ্গলক্ষ্মী ২', 'বঙ্কিমচন্দ্র ৩/৫'

'শরৎচন্দ্র ১' মিলবিন্যাস গ ঘ ঘ, গ ঘ গ। 'চৈত্ররাতে' 'জন্মাষ্টমী', 'বঙ্কিমচন্দ্র ৪' 'বিবেকানন্দ' 'রুপার্ট ব্রুক ২/৫' 'তীর্থ পথিক' 'প্রেম' 'দীপান্বিতা' মিলবিন্যাস গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ। 'আহ্বান' 'এক আশা ১-৬' মিলবিন্যাস গ ঘ ঙ ঙ ঘ গ। 'বঙ্কিমচন্দ্র ১' মিলবিন্যাস গ ঘ ঙ ঙ গ ঘ। মোহিতলালের ষটকের মিল-বিন্যাসের বৈচিত্র্য সম্পর্ক ড উত্তমকুমার দাশ বলেছেন "'ইতালীয়' ক্লাসিকাল সনেটের ষটকের মিল সংখ্যা দুই বা তিন, মিলবিন্যাস একান্তভাবেই বিবৃত-ধর্মী। সংবৃত মিল তেমন ব্যবহৃত হয় নি—পেত্রার্কার সনেটে তো নয়ই। কারণ ষটকের সংবৃতধর্মী মিল যোজনায় অষ্টকের অনুরণনই চলতে থাকে এবং ষটক বন্ধের মিল যোজনায় এই সত্যটি মনে রেখেছিলেন। সনেটের অষ্টক ও ষটকে ভিন্ন প্রকৃতির মিল ব্যবহার করে তিনি দুই পর্বে ভিন্নধর্মী ছন্দ সঙ্গীত রচনা করে ক্লাসিক্যাল সনেটের মূল প্রকৃতির প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছেন।" (বাংলা সাহিত্যে সনেট, পৃ ২৮৫, ২৮৭)। বিষয়বস্তু হিসেবে 'ছন্দ-চতুর্দশী'র সনেটগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) প্রকৃতিকল্পনা বিষয়ক সনেট, (খ) দেশী-বিদেশী কয়েকজন কবি সাহিত্যিক সম্পর্কিত সনেট, (গ) প্রেম ও আদর্শ বিষয়ক সনেট, (ঘ) জীবন সমালোচনা ও আত্মপরিচয়মূলক সনেট।

মোহিতলালের প্রকৃতি বিষয়ক সনেট নিছক বর্ণনাত্মক না হয়ে রূপকল্প হয়ে উঠেছে। 'শ্রাবণ-শবরী', 'চৈত্ররাতে', 'পৌর্ণমাসী', 'নিশুতি', 'নিশান্তে', 'উষা' প্রভৃতি সনেট চিত্রগুণে সমৃদ্ধ—দূরায়মান সৌন্দর্যপিপাসায় আতুর।

দেশী বিদেশী কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কিত তাঁর সনেট বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য এইজন্যে যে এগুলিতে তিনি মধুসূদনের মত গতানুগতিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নি, ভাবে গদগদ হয়ে প্রণাম জানান নি। 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'বিবেকানন্দ', 'শরৎচন্দ্র', 'সত্যেন্দ্রনাথ, 'রুপার্ট ব্রুক' প্রভৃতি সনেটে মোহিতলাল অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের সঙ্গে তিনি সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন তাঁদের রচনাবলী সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমতও। আন্তরিকতার সঙ্গে মননশীলতার এরূপ আশ্চর্য উদাহরণ খুবই বিরল।

মোহিতলাল দেহাত্মবাদী কবি। প্রেম ও আদর্শ বিষয়ক সনেটের মধ্যেও রয়েছে ইন্দ্রিয় রূপতৃষ্ণার অভিব্যক্তি। ভাষার সরলতায়, উপমার কারু-কার্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রকাশ যে কত উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পর মোহিতলালই তার অন্যতর দৃষ্টান্ত। 'প্রণয়-ভীরু', 'প্রেম ও কর্মফল', 'মুক্তি', 'কবির প্রেম', 'স্বপ্ন-সঙ্গিনী', 'স্মরণ', 'নির্বেদ', 'বিদায়' প্রভৃতি

কবিতা রূপদক্ষতা বা বাগবৈদগ্ধ্যের সঙ্গে কবি-কল্পনার অন্তরাভিমুখী ইন্দ্রিয়োল্লাস প্রকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে।

'কল্পনা', 'একআশা', 'ফুল ও পাখী', 'মরণ', 'তীর্থপথিক', 'যাত্রাশেষে' প্রভৃতি ভাবনাসমৃদ্ধ ও আত্মবিষয়ক সনেটগুলিতে স্বভাবসিদ্ধ রোমান্টিক কল্পনা-বিস্তারের পরিবর্তে কবির গভীরতর উপলব্ধি, আত্মরুদ্ধ একটি প্রবল ভাবানুভূতি পরিস্ফুট হয়েছে। এসব কবিতায় সুন্দরের সান্নিধ্য কল্পনায় তাঁর মন থেকে সমস্ত খেদ অপসৃত হয়ে কবি এক নির্লিপ্ত প্রসন্নতায় অনাবিল শান্তিলাভ করেছেন—অবশ্য জীবনে নয় কবিতায়।

সনেটের অলঙ্কার ও রূপকল্প নির্মাণে মোহিতলালের ওপর মধুসূদন ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন নয়। তাঁর সনেটের ভাষায় মধুসূদনের মত ধ্বনি গাম্ভীর্যময় তৎসম শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করা গেলেও মোহিতলালের ভাস্কর্যধর্মী নিজস্ব কলাকৃতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সনেট রচনায় রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক সহজিয়া রীতিকে ত্যাগ করে তিনি ক্লাসিক ঠাটে পেত্রার্কীয় রীতিতে সনেট রচনা করে বাংলা সনেট সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এটি তাঁর একটি অনন্য কীর্তি।

সনেট রচনায় মোহিতলালের কৃতিত্ব থেকেই তাঁর সনেটের ত্রুটির জন্ম হয়েছে। ক্লাসিকাল সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সনেটের শেষ দুই বা এক পঙ্‌ক্তিতে ভাবের পূর্বতন অভিব্যক্তি হওয়া চাই।" (বাংলা সনেট : বাংলা কবিতায় ছন্দ) এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি সনেট রচনা করেছেন, সেজন্যে তাঁর ধারণানুযায়ী লিখিত সনেটে ত্রুটি পাওয়া যাবে না। কিন্তু মোহিতলালের ধারণাকে অভ্রান্ত বলে মানা যায় না। কারণ সনেটের শেষের দিকে পূর্ববর্তী ভাবের অভিব্যক্তি থাকলে সনেটের গঠন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এটিকে যদি ত্রুটি বলে ধরা হয় তাহলে এটি তাঁর অধিকাংশ সনেটেরই ত্রুটি। তিনি আদি নিয়মের বাইরে সনেট লেখেন নি এবং কোনক্রমে সে নিয়ম ভাঙবেন না এই প্রেরণায় ভাবকে বেঁকিয়ে দুমড়িয়ে ঐ ছকে যখন ফেলতে গেছেন তখন উপমা-অলঙ্কারের কৌশলকে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে কাব্যের পর্যায়ে তুললেও উৎকৃষ্ট কাব্য করতে পারে নি। গূঢ় অন্তর্দৃষ্টির যে অভাব রয়েছে তা নয়, কবি মোহিতলাল অপেক্ষা বিদগ্ধ মোহিতলালই সেখানে আসর জাঁকিয়েছেন। এ সমস্ত কবিতায় অলঙ্কারের সমাবেশ করেছেন, অভ্রান্তভাবে ঐ চালে লিখতে গিয়ে ভাবের কৃত্রিমতা এসে গিয়েছে, ভাবের স্বতঃস্ফূর্ততাই যে কবিতার প্রাণ

তাও ব্যাহত হয়েছে। সনেট রচনায় শেক্‌সপীয়ার-রবীন্দ্রনাথের মতন অত স্বাধীনতা না নিয়েও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক দিয়ে তিনি যদি একটু স্বাধীনতা অবলম্বন করতেন তাহলে ঐ ছকের মন বিশ্রাম পেত এবং বিশ্রামের ফলে monotonyটা ভেঙে যেত। মিল-বিন্যাসে ষটকের নিয়মে মাঝে মাঝে একটু স্বাধীনতা নিলেও মনের কাঁটাকে তিনি সর্বদা কম্পাসের উত্তরাভিমুখী কাঁটার মত ঐ আদি সনেটের দিকেই নিবদ্ধ করে রেখেছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে লেবুকে বেশী কচলালে যেমন তিতো হয় তেমনি সাহিত্যের নির্দিষ্ট ফরমুলাতে ভাবকে বসিয়ে ভাবোৎকর্ষের চেয়ে নিয়মতন্ত্রের ওপর ঝুঁকি দিয়ে অনবরত রচনা করতে লাগলে পরিণামে সেটা যান্ত্রিক উৎপাদনে দাঁড়িয়ে যায় তা সর্বক্ষেত্রে fine excess হয় না। মোহিতলালের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। তথাপি এমন কথা বলবার সাহস কারুরই নেই যে তাঁর সব সনেটগুলি কাব্য হিসেবে রসোত্তীর্ণ হয় নি। যেগুলি হয়েছে যেমন, 'উপমা', 'প্রণয়-ভীরু', 'শ্রাবণ-শর্বরী', 'স্বপ্ন-সঙ্গিনী', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'সত্যেন্দ্রনাথ', 'বিদায়' প্রভৃতি সেগুলি গভীর চিন্তাশক্তিপ্রসূত, ক্লাসিক সাহিত্যের সৌন্দর্য ও সংযমে পরিমণ্ডিত। শেক্‌স্‌পীয়ার যাকে 'deep brained' বলেছেন ভাব ও রসের একাগ্রতা ও সমগ্রতাই সেগুলির জীবন এবং এগুলির প্রতিই আজকের সনেট-প্রিয় পাঠক ও সচেতন শিল্পকর্মে বিশ্বাসী লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই ॥

মানুষের প্রাণের প্রাচুর্য ও স্ফূর্তির বিকাশ যে art তা reflective নয় প্রধানতঃ intuitive। আপনার অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে সাহিত্যের জন্ম হলেও সব আনন্দ সৃষ্টিই যে সকলের উপভোগ্য হবে এমন কোন কথা নেই। তাই সমালোচনা মনের বিশ্লেষণকারিণী বৃত্তি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সেই সাহিত্যের নিগূঢ়তম সত্য, সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত, রূপাতীতের ব্যঞ্জনা এক কথায় যাকে বলা যায় 'a snatch beyond the reach of art'টিকে বোঝাবার জন্যে। আমাদের মধ্যে এখনও এমন একটা অপুষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে যে সামান্য সৃষ্টির মূল্য একগাদা সমালোচনার চাইতেও বেশী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়—সমালোচনা যে সৃজনধর্মী রচনার চাইতেও কঠোরতম সাধনা একথা অস্কার ওয়াইল্ডের উক্তি থেকেই উপলব্ধি হবে। তিনি বলেছেন, "Indeed I would call criticism a creation within creation...Nay more, I would say that the highest criticism, being the purest form of personal impression is in its own way more creative than creation, as it has least reference to any standard external to itself, and is, in fact, in itself, and to itself an end···one may appeal from fiction unto fact. But from the soul there is no appeal.···That is what the highest criticism really is, the record of one's soul." সমালোচনা জিনিসটা হচ্ছে সম্যক্ আলোচনা, যার জন্যে চাই সমগ্র দৃষ্টি যা সৃষ্টির অন্তরে প্রবেশ করে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দুই-ই তুলে ধরতে পারে। তাই জ্ঞানের গভীরতা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি না থাকলে সমালোচক হওয়া যায় না। শিল্পী নিজের প্রাণের আনন্দ ও উপলব্ধি হতেই শিল্প সৃষ্টি করেন—কবি আপন জীবনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা হতেই প্রাণের প্রেরণায় গান গেয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোক অনেক সময়েই নিজেদের জীবন-সংগ্রামে এত ব্যতিব্যস্ত থাকে যে চতুষ্পার্শ্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টিপাত করার অবসর পায় না। তাছাড়া লেখকের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এমন সূক্ষ্ম অনুভূতির ওপর নির্ভর করতে হয় যা হৃদয়ের প্রসার ও শিক্ষার অভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকৃত রসানুভূতি শক্তি

অনেক সময় অপরিণত থাকে। সমালোচক সৃষ্টির মূল্য উপলব্ধি করে পাঠককে রসাস্বাদনে সাহায্য করেন, সুসাহিত্যের প্রতি তার রুচি ও শ্রদ্ধাবোধকে জাগ্রত করান, লেখার মান ও মানসিকতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটান। কার্লাইলের কথায় বলা যেতে পারে, "Criticism stands like an interpreter between the inspired and the uninspired." পাঠকদেরই পথনির্দেশক শুধু তিনি নন, তিনি লেখকদেরও অন্তরঙ্গ বন্ধু। শিল্পী নিজের প্রাণের ভাবকেই বাইরে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। মানুষের ভাষার এমনই দীনতা যে সে প্রাণের সকল প্রকার 'shades of feeling' বাইরে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয় না। প্রকাশের এই বেদনাকে সমালোচক আপন গভীর সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে ভাবকে উপলব্ধি করে লেখকের প্রাণের কথাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। আবার সমালোচনার নিয়ন্ত্রণী শক্তি দিয়ে অনেক পথভ্রষ্ট লেখককে পথের সন্ধানও দেন তাঁরা। সুতরাং যিনি সমালোচনা করেন তাঁর দায়িত্ব বেশী, সম্মান ঈর্ষাযোগ্য, কেন না দায়িত্বসম্পন্ন সমালোচকের ওপর পাঠকই নির্ভরশীল হন না, সৎলেখকও নিজের ত্রুটি শুধরিয়ে নেন। এজন্তে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকরা সমালোচনাকে 'সাহিত্যের দর্শনশাস্ত্র' বলেছেন। সমালোচনা যে সাহিত্য-পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে একথা আজ সংশয়হীনভাবে বলা চলে।

দুই

জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা স্থাপনই হল যেমন কবির সৌন্দর্য-সাধনা, সমালোচকেরও সত্যসাধনা হল তাই। একই ব্যক্তির ভিতর এ দুটি শক্তির পূর্ণ বিকাশ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। কবি আর সমালোচকের বিচার প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়ট তাই বলেছেন, "The two directions of sensibility are complementary; and so sensibility is rare, unpopular and desirable, it is to be expected that the critic and the creative artist should frequently be the same person." আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদারের চেতনায় এ দুটি শক্তি একই বৃন্তে বিধৃত। তিনি একজন শক্তিশালী কবি ও সমালোচক রূপে সুপরিচিত। সৃষ্টির আনন্দে কবি হিসেবে যেমন তিনি পূর্ণ তেমনি সমালোচক হিসেবে অনুভাবকে (feeling) রুদ্ধ না করে মনকে (mind) স্ববশে

রাখার কঠোর আত্মশাসনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এই যে একধারে আত্মপ্রসার আর একধারে আত্মসংকোচ একেই আর এক অর্থে বলতে পারি একধারে সুন্দর আর একধারে সত্য, সেই 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং'কে পেতে হলে সমালোচকরূপে যেমন এই সৌন্দর্যের আনন্দকে পরম-তত্ত্বরূপে জেনে নিতে হবে, তেমনি কবি হিসেবে আত্মানুভূতির সঙ্গে তাকে এক করে পেতে হবে, দীপ হয়ে জ্বলতে জ্বলতে জগতের লীলাখেলার প্রদীপ হতে হবে। মোহিতলাল ছিলেন সত্য-সুন্দরের তীর্থে এমনি এক অখণ্ড সত্তার তীর্থংকর। তাই তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'সত্যসুন্দর দাস' আর সত্য ও সুন্দরের উপাসনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র তপস্যা।

রবীন্দ্র-যুগের প্রোজ্জ্বল ভাবপরিমণ্ডলে অবস্থান করে কবি হিসেবে তিনি আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যালোচনার রীতি প্রবর্তিত করে তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথের প্রদর্শক হয়েছেন। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে যেমন তিনি জহ্নুমুনির মত নিঃশেষে পান করেছেন তেমনি ভারতীয় ভাবধারা বিশেষ করে বাঙালী মানসকে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের জারক রসে বিশোধিত করে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। সমালোচক মোহিতলালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হলে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটু ইতিহাস বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সমালোচনা-সাহিত্য শুরু হয়েছিল, মাঝে রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এসে সমালোচনা যুক্তিপ্রধান সাহিত্য হয়ে উঠল, সত্যিকার সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হল। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সমকালের সমালোচকদের (যেমন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি) রচনা উল্লেখযোগ্য হলেও বঙ্কিমের মতো বহু বিষয়-সম্বলিত পরিধি-বিস্তৃতি তাঁদের রচনায় নেই। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সমালোচনা দর্শনে প্রভাবিত হয়ে শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭৩-১৯২৮) 'বঙ্গবাণী', 'বাণীমন্দির' গ্রন্থে এই ধারায় অগ্রসর হয়েছেন; কিন্তু তাঁর সমালোচনার প্রধান ত্রুটি ছিল যে সমালোচনার মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের (personality) প্রয়োজন তার অত্যন্ত অভাব তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। মোহিতলালের রচনার মধ্যে তাঁর

পুরুষসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উত্তাপ অনুভব করি। আর তাঁর সমসাময়িক সমালোচকদের মধ্যে যেমন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কবিশেখর কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতির রচনার সঙ্গে মোহিতলালের আলোচনা তুলনা করলে যে কথা প্রথমেই মনে আসে সেটি হল যে শ্রীকুমারবাবুর রচনা যেন পাণ্ডিত্যের চাপে নিষ্প্রাণ সেজন্যে রচনা ভঙ্গীটাও যেন কতকটা mechanical ; সুবোধবাবুর সমালোচনা মোহিতলালের তুলনায় less profound ; কালিদাস রায়ের সমালোচনা যেন পরীক্ষায় পাস করার উপযোগী করে ছাত্রদের সামনে রেখে বড্ড বেশী বিদ্যায়তনী (academic) ; গোপাল হালদার প্রমুখরা একটি রাজনৈতিক মতবাদের ফরমুলা-ঘেঁষা সমালোচক, ফলে যুক্তির স্বাধীনতা তাঁদের নিকট মুখ্য নয়—সবটাই মতবাদের মাপকাঠিতে ছককষা ; আর প্রমথ বিশীর সমালোচনায় মোহিতলালের মতন মতপ্রকাশের প্রত্যয়শীলতায় ভঙ্গিম বলিষ্ঠতার উপাদান তেমন নেই, রবীন্দ্র-ভাবে ভাবিত হওয়ায় মতামতগুলো বাঁধা পথের অনুবৃত্তি হিসেবে কেমন যেন একটু নেতিয়ে চলে—এ'দিক দিয়ে অবশ্য আমার কাছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় ও গোপাল হালদার (মতবাদ ঘেঁষা হলেও) প্রমুখ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তায় ও চিন্তার মৌলিকত্বে অভিনবত্বের দাবী রাখেন। আর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা চিন্তাসমৃদ্ধ রস-বিশ্লেষণ—আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তারে রচনা করেছেন। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ভাববাদী এবং মূলতঃ সৌন্দর্যবাদী, বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা সেখানে গাঢ়তাই প্রবল। তাই তাঁর সমালোচনা একটি অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সর্বগ্রাসী কবি-প্রতিভা এ ক্ষেত্রেও তাঁর প্রধান সহায়। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা খুবই ঘরোয়া—তিনি সমালোচনায় ফরাসী দেশসুলভ লঘু চপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা এনেছেন। তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

তিন

কবি মোহিতলাল কেন সমালোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তার কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "আমি আজীবন কাব্যচর্চাই করিয়াছি ; কাব্যরসের স্বাদ-বৈচিত্র্য, সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, কবি-প্রেরণার গূঢ়রহস্য প্রভৃতির ভাবনা ও জিজ্ঞাসা আমাকে চিরদিন আকৃষ্ট করিয়াছে। ১৩২৬ সনের 'ভারতী' পত্রিকায় আমি এ বিষয়ে লিখিয়া ভাবিতে

আরম্ভ করি। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম, এরূপ নির্বিশেষ তত্ত্ব-আলোচনার দিন আমাদের সাহিত্যে এখনও আসে নাই; বাংলা ভাষায় আধুনিক সাহিত্য যেটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সম্বন্ধেই আধুনিক রীতিসম্মত কোন সমালোচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এককালে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বসাহিত্য ও বাংলাসাহিত্য উভয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনা ছিল; কিন্তু সেগুলির মধ্যেও ব্যস্ততার লক্ষণ আছে; এবং আলোচনার প্রণালীও সুষ্ঠু নহে। তথাপি তাহাতে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার একটা ভিত্তি-স্থাপনা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর বিশেষ কিছুই হয় নাই; যাহা কিছু হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহা সাহিত্য অথবা বাংলা সাহিত্যের আলোচনা নয়—রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা শরৎ-প্রশস্তির কলোচ্ছ্বাস।" (মুখবন্ধ)। বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতা। এজন্যে বাংলা সমালোচনায় সমালোচ্য গ্রন্থে কবিকে ধর্মগুরু সাজিয়ে কাব্যকে ধর্মমন্ত্র করে তোলার দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। সেজন্যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে কবি-সত্তার চেয়ে কবির ব্যক্তি-সত্তার ওপর জোর দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশী, সমালোচনার নামে কবির ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীকেই ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়। তাই মোহিতলাল বলতে বাধ্য হয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথের মত কবি ও তাঁহার কাব্যকে এই যে বিশিষ্ট ভাববাদের বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছে এবং সেই কাব্যের রস-আস্বাদন নয় (সে পিপাসা কাহারও নাই) অথবা জীবনের সঙ্গে কোথাও তাঁহার যোগ হৃদয়ঙ্গম করাও নয়, কেবল তাহার অন্তর্গত ঐ একটা আদর্শকে ধর্মমন্ত্রের মত সকল বিচারের অতীত করিয়া রাখা—ইহাতে যেমন রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় ব্যাহত হইয়াছে এবং সমাজের এক অংশে একটা মিথ্যা অভিমানের সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই বাঙলা সাহিত্যেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, বাঙলা-সাহিত্য পঙ্গু হইয়াছে।"—(কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য)। কিন্তু কবিতার ভাব হতেই যে কবি-মানস কবি-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কবিতার রস-বিচার যে তারই ওপর নির্ভর করে এ পন্থায় আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা খুবই কম হয়েছে। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি মানুষের হল সাধারণ হৃদয়বৃত্তি আর সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যপিপাসা হল স্বতন্ত্র বৃত্তি। সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বই হল—'ঘটে যা তা সব সত্য নয়।' এই সৌন্দর্যানুভূতি মানব-মনের এমনি একটা বৃত্তি যে ক্রিয়াশীল অবস্থায় emotion বা intellect কোনটাই সক্রিয় থাকে না। তাই কবি

কবিতায় যা বলেন তাঁদের জীবনে সে অনুভূতি জলন্ত হয়ে উঠেছে কি না, তাঁদের জীবনযাত্রায় তা পূর্ণ বা আংশিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছে কি না, তার প্রমাণ চাইতে গেলে নিরাশ হতে হবে এবং ঘটে থাকলেও সেটি প্রমাণিত করলেই সাহিত্য-বিচারের ল্যাঠা সব চুকে গেল বলে যদি মনে করি তাও ভুল করা হবে। তাই প্রকৃত সমালোচনার উদ্দেশ্য লেখকের ব্যক্তিজীবনের ঘটনার বিচার নয়, লেখার বিচার করে কবি-মানস পরিস্ফুট করা। বহুদিন আগে হুগো বলেছিলেন, "Examine how the work is done, not on what or why. Beyond this the critic has no right to enquiry, the poet has no account to render." সমালোচক হ্যাজলিটও এরই সমর্থনে বলেছেন, "A genuine criticism should, as I take it, reflect the colours, the light and shade, the soul and body of a work." মোহিতলাল কবিতার বিচারে কবি-জীবনী খুঁজতে যান নি। তিনি বলেছেন, "ব্যক্তি-পুরুষই কবি-পুরুষে রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সেই কাব্যগত ব্যক্তিকে অর্থাৎ কবিতায় যাহাকে পাইতেছি—তাহাকেই লইব; কবিতার বাইরে যিনি আছেন—কাব্যরসের আবেশবর্জিত ভাবুক মতবাদী ব্যক্তিকে আমাদের প্রয়োজন নাই। কবির ব্যক্তিধর্ম যেমনই হোক তাঁহার সেই ব্যক্তিজীবনের ভাবনা-চিন্তা সংশয়-বিশ্বাস যেমনই হোক, সেই সকলের ভাষ্যরূপে কবিতা পাঠ করিব না।"—(কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য)। তাই সাহিত্যকারের কবি-মানসের ও ভাবাদর্শের ব্যাখ্যানই ছিল মোহিতলালের প্রধান অবলম্বন। এই কবি-মানস ও ভাবাদর্শকে বোঝাবার জন্যে তাঁর রচিত সাহিত্যের অংশবিশেষগুলি দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহার করতেন। অনেক সমালোচ্য গ্রন্থাদির কোন বাক্যেই যদি মূলভাবটি ব্যক্ত হয়ে পড়ে তখন তার আলোচনাই হয়েছে তাঁর সমালোচনার বিষয়বস্তু। কিংবা সমালোচ্য গ্রন্থে কি আছে তা তাঁর কাছে বড় হয়ে না উঠে, সেটি তাঁর মনে কি কি চিন্তার উদ্রেক করেছে সেটির ব্যাখ্যানই হয়েছে তাঁর আলোচ্য বিষয়। নিজের ভাব ও ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে গ্রন্থগত বস্তুতে মন-প্রাণ কোনদিনই ঢেলে দেন নি। আবার অনেক সময় তাঁর মতে যা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ভাবাদর্শ তা সমালোচ্য বস্তুতে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তা যাচাই করে নিতেন। তাঁর যুক্তির সমর্থনে ও স্বমতের পোষকতায় তিনি বিভিন্ন কবির রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। সেই সমুদয় উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় তিনি কিরূপ অভিনিবেশ সহকারে

তাঁদের রচনা পাঠ করতেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা কতকগুলি গালভরা বুলি তিনি আওড়ান নি।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে রসতত্ত্বগত এমন কোন সমস্যা বোধ হয় নেই মোহিতলাল যার চরিত্রানুধাবন ও সমাধানের চেষ্টা করেন নি। বস্তুতঃপক্ষে বাংলায় সত্যিকারের সাহিত্য-বিচারের ধারাবাহিক চেষ্টাই হল তাঁর জীবন-সাধনা। ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যে A. C. Bradley, Middleton, Murray প্রভৃতি যা করেছেন আমাদের সাহিত্যে একা মোহিতলাল তাই করতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির দেখবার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছিল। নিজ মতবাদে তিনি এমনই প্রত্যয়বান ছিলেন যে কখনো কোন অবস্থাতেই অন্য কোন একটি মত পোষণ করে তা থেকে বিচ্যুত হন নি কিংবা সাহিত্য-পথ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে তিনি অন্য পথে আত্মোন্নয়নের সন্ধান করেন নি। নিজের মতের সপক্ষে তিনি সারাজীবন একা লড়েছেন। 'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' এই নীতিবাক্য তিনি চিরকাল লঙ্ঘন করেছেন—ফলে কত বান্ধব হয়েছেন বিমুখ। তিনি বলতেন, "যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার জন্য নির্মমভাবে নিজের সকল স্বার্থ, আত্মপ্রীতি ও মমতা সকলই বর্জন করিয়াছি।" সত্যের অখণ্ডরূপটির ধ্যান কিংবা কাব্যবিচারে সর্বত্র নৈরপেক্ষ-নীতি তিনি পালন করেছেন কি না এ নিয়ে তর্কের ঝড় উঠতে পারে কিন্তু একথা বোধ করি নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে তাঁর মনের সঙ্গে লেখনীর বিরোধ ছিল না, ভিতরের সঙ্গে বাইরের দ্বন্দ্ব ছিল না, রূঢ়তা থাকলেও কপটতা ছিল না, আত্মাভিমান থাকলেও বিনয়ের ন্যাকামি ছিল না। সাহিত্যের নামে সর্বপ্রকার ভণ্ডামী ধাপ্পাবাজী রসবর্জিত অশ্লীলতা যাতে বর্ধিত হতে না পারে সেজন্যে আজীবন তিনি বেত্রহস্তে সাহিত্যের যজ্ঞশালায় প্রহরীর কাজ করেছেন। কিংবা সাহিত্যাদর্শে যাঁদের নিষ্ঠা নেই, যাঁরা ফাঁকি দিয়ে সাহিত্যে নাম কিনতে চান তাঁদের তিনি ঘৃণা করেছেন আন্তরিকভাবে; যাঁরা Bread artist তাঁদের পরিচয়ও তিনি দেন নি; সাহিত্যের কমলবনে মত্তহস্তীর প্রবেশ কিংবা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কর্তাগিরি আদৌ তিনি সহ্য করেন নি, লেখনীমুখে তীক্ষ্ণযুক্তির দ্বারা তাঁকে শাসন করেছেন। তবে উপযুক্ত ব্যক্তির আনীত অর্ঘ্যকে তিনি পুরোহিতের মত উপযুক্ত স্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

সমালোচক মোহিতলালের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যালোচনার পরামর্শ বা standard নির্দিষ্ট করা। এই বস্তুটির অভাবে বাংলা সাহিত্য-

সমালোচনা বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোঝাত, হয় নিছক গুণকীর্তন না-হয় স্রেফ নিন্দা। চিত্তদৌর্বল্য বর্তমানে এতদূর প্রসারিত হয়েছে যে আমরা একরকম মানসিক আলস্যে ভুগছি—সমালোচনার ক্ষেত্রে মুখোমুখি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই, পরস্পরের পিঠ-চুলকানো নীতি যেন আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যেখানে প্রশংসা করার কিছুই নেই সেখানে অযৌক্তিক প্রশংসা করে লেখককে উৎসাহিত করার মধ্যে সাধারণ পাঠককেও যে সেই সঙ্গে প্রতারিত করা হয় তা আমাদের দেশের সমালোচকরা ভেবে দেখেন না। এক কপি পুস্তকের বিনিময়ে সাধারণ পাঠকের বৃহত্তর স্বার্থকে তাঁরা জলাঞ্জলি দেন। আর্থিক মন্দার দিনে একে ভাল বই কেনার ক্রেতা খুবই কম, তার ওপর বাজে বইয়ের মাথামুণ্ডহীন নির্জলা প্রশংসা করে ক্রেতাকে ঠকালে ভালো বাংলা বইয়ের বাজার যে একেবারে পড়ে যাবে—আমাদের দেশের সমালোচকরা একথাও ভেবে দেখেন না। এইভাবে তাঁরা শুধু পাঠক-সমাজেরই আস্থা হারাচ্ছেন না, সুস্থ শিল্পকর্মের মান সম্পর্কে তাঁদের মনেও সংশয়ের সৃষ্টি করছেন। আর এই চোরা পথে অনেক অসুস্থ অপাঠ্য লেখা সাহিত্য-কর্মের নামে সমাজে স্থান করে নিচ্ছে। এজন্যে বাংলা-সাহিত্যে বিচার-সঙ্গত সমালোচনার অত্যন্ত অভাব। প্রমথ চৌধুরী তাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, "বাংলা-সাহিত্যে আজকাল যেরূপ নির্লজ্জ অতি প্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তার মূল উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস দুই-ই আছে। এক একটি ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র পুস্তকের যে সকল বিশেষণে স্তুতিগান করা হয়ে থাকে, সেগুলি বোধহয় শেক্সপীয়ার বা কালিদাসের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও একটু বেশী হয়ে পড়ে। সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্তি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে যাতে বাজারে ভালোরকম কাটতি হয় সেই উদ্দেশ্যে আজকাল সমালোচনা লেখা হয়ে থাকে। যে উপায়ে পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রি করা হয়, সেই উপায়েই সাহিত্যও বাজারে বিক্রি করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরস্পরে এক কারবারের অংশীদার। আমার মাল তুমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দাও, তোমার মাল আমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দেব, এইরকম একটা বন্দোবস্ত পেশাদার লেখকদের মধ্যে যে আছে, একথা সহজেই মনে উদয় হয়।" আবার এর বিপরীতও অশোভন—গলাবাজি করে লেখককে নস্যাৎ করা কিংবা তীক্ষ্ণ লেখনীর সূঁচ ফুটিয়ে অহেতুক কটূক্তি করা সমালোচনার উদ্দেশ্য হতে পারে

না। যিনি ভাল লেখেন এবং বই যাঁর ভালো কাটে আর্থিক ঈর্ষাবশতঃ তাঁকে গালাগাল দিতে আমাদের সমালোচকরা লজ্জাবোধ করেন না। এর ওপর লেখক যদি কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন তাহলে বিরুদ্ধ দলের সমালোচক তাঁর বইয়ের রস বিচার না করে লেখকের ব্যক্তিগত আদর্শ-বাদকে কেন্দ্র করে বইয়ের সমালোচনা করে থাকেন। 'Book of Job'-এর প্রণেতা Job মশাই সমালোচকদের ভাবগতিক দেখে শত্রুকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, "ব্যাটা তুই লেখক হ।" তাই সমালোচকদের কর্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সমালোচকের কাজটা এমনি যে তাহাকে পদে পদে আপন উচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া চলিতে হয়—যখন কৃতজ্ঞচিত্তে নুন খাইতেছি তখনও এই কথা মনে রাখিতে হয়,কেবলই গুণ গাহিলে চলিবে না, যদি দোষ থাকে তাহাও গাহিতে হইবে।" Art of Criticism বিদ্যার সূক্ষ্মতত্ত্ব মোহিতলালের করায়ত্ত ছিল বলেই নিছক গুণকীর্তন এবং অবিমিশ্র নিন্দা পরিহার করে বাংলা সাহিত্যে নির্ভীক তেজোগর্ভ সৃজনশীল সমালোচনা শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন। প্রতিষ্ঠা, যশ অর্জন কিংবা বন্ধু-বিচ্ছেদের তোয়াক্কা না করে অবারিত সাহসিক ভঙ্গিমায় সমালোচনার বলিষ্ঠ পৌরুষ ও নির্মম দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে নির্ভীকতার এই নীতি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বৎসর। তিনি ছিলেন Dumount Wildon-এর মত কঠোর সমালোচক, বঙ্কিমচন্দ্রের মতন স্পষ্টবাদী সাহিত্য সাধক। কারও খাতির করে কথা কইতেন না, তা সে যতবড় লেখকই হোক, রবীন্দ্রনাথেরও না, কেননা যে স্তুতিবাদ চিন্তা-বিমুখতার প্রশ্রয় দেয় তার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম। বিলেতের কয়েকজন (কোলরিজ প্রমুখ) রসজ্ঞ সমালোচকরা যেমন শেক্‌সপীয়ার পাঠ করে এমনই গদগদ হয়েছিলেন যে তাঁরা তার প্রতি ছত্রেই অপূর্ব কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং যা স্বভাবতঃই সরল ও বিশিষ্টতা-বর্জিত, সাধারণ ভাবের মধ্যেও একটা বড় রকমের সৌন্দর্য বা তত্ত্ব বের করতে আরম্ভ করেছিলেন, তেমনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে প্রশস্তির ঢক্কা-নিনাদ খুব বেশীভাবেই চলছে। মোহিতলালই প্রথম সমালোচক যিনি অন্ধ-আনুগত্য না দেখিয়ে রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যের কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি তা সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। অবশ্য তার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে সেকথা বর্তমান প্রবন্ধের শেষের দিকে আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যদি লাবণ্যময়ী বৈষ্ণবী হয় তবে মোহিতলালের

সমালোচনা বীরাচারী তান্ত্রিক-ভূষিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষা যদি প্রকাশ করে নারীসুলভ লাস্য, তাহলে মোহিতলালের ভাষা প্রকাশ করেছে পুরুষ-সুলভ ঋজুতা। তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়শীল সমালোচক কাজেই তাঁর সমালোচনা মূলতঃ Synthetic, Subjective ও Deductive। তাহলেও সাহিত্য সৃষ্টির মূল্যায়নে তিনি ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগার মানদণ্ড যেমন প্রয়োগ করেছেন তেমনি সকল দেশে ও কালে পরীক্ষিত হাজার বছরের অনুশীলনের ফলে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার যে একটি সর্বসম্মত মান দাঁড়িয়ে গেছে, সে ভিত্তিতেও সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। Perception (জ্ঞানবৃত্তি), emotion (চিত্তবৃত্তি), sensation (ইন্দ্রিয়বৃত্তি)-র সহযোগে যে একটি অখণ্ড বোধশক্তি জন্মে সেই শক্তিকেও তিনি সেই প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে আসতেন। সমালোচনার নামে সাহিত্যে শৌখিন মজদুরি অর্থাৎ ওপর টপ্‌কা আলোচনা থেকে একটা সিদ্ধান্ত টানা কিংবা লাগ্‌সই কতকগুলো কথা বসিয়ে দায়িত্ব শেষ করা তাঁর স্বভাব ছিল না, কেননা দেশী-বিদেশী নতুন-পুরাতন সাহিত্যের রসে তিনি ছিলেন পারঙ্গম। 'সাহিত্য', 'স্ব' ও 'সমাজ' এই তিন দিকে সমান দৃষ্টি রেখে সমগ্রভাবে জীবনের একটা সংহত সার্থকতার সন্ধান দিতে চেয়েছেন। সমালোচকের সত্যের প্রতি যতই অবিচলিত নিষ্ঠা থাক, লেখকের ভাবের, বক্তব্যের কিংবা উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে প্রকৃত সমালোচনা হতেই পারে না, সমালোচককেও লেখকের স্থানে এসে সত্যকে দেখতে হবে—ব্রাউনিংয়ের কথায়, 'where the heart lies let the mind lie also.' গ্যেটে বলেছেন, "লেখক ও সমালোচকের ভাবের সমতা যদি না থাকে তাহলে খাঁটি সমালোচনা হতেই পারে না, মর্মে মর্মে লেখকের ভাবকে অনুভব করা চাই।" মোহিতলালের প্রধান গুণ ছিল এই সহমর্মিতা। 'শ্রীমধুসূদন', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্পর্কীয় আলোচনাগুলি এই পদ্ধতির কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

সমালোচক যদি প্রথম শ্রেণীর রসবোদ্ধা হন, সমালোচনার ভিতর তাঁর যদি রসান্বিত প্রজ্ঞার গূঢ় পরিচয় থাকে তাহলে তাঁর সাহিত্য-ব্যাখ্যান সহজেই সৃষ্টিধর্মী রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। উইলিয়ম হেনরি হাডসন বলেছেন, "True criticism also draws its matter and inspiration from life and in its own way, it likewise is creative." সাহিত্য সম্পর্কে, নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে, কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে মোহিতলালের

আলোচনাগুলি এই জাতেরই রচনা—সম্পূর্ণ স্বাধীন মনন ও রসসৃষ্টির পরিচয়ে সন্দীপ্ত। সূক্ষ্ম বিবেচনাকে যদি আমরা একটি গুণ বলে স্বীকার করি তাহলে আমরা সানন্দে মেনে নেব মোহিতলাল সেই গুণের অধিকারী। আর যদি তাকে বিদ্যাবত্তার প্রচেষ্টাজনিত প্রকাশরূপে পরিগণিত করা হয় তবে তাও তাঁর সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। তাই বুদ্ধির প্রাখর্যের সঙ্গে পরিশীলিত মন এবং সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের সঙ্গে তীক্ষ্ণতম বিচার—এ দুটি গুণের জন্যে তিনি একালের সমালোচকদের আচার্যস্থানীয় হয়ে থাকবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশকে, বাঙালীর জীবনকে বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অন্যান্য বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হলেও মোহিতলালের সৃষ্ট সমালোচনা সাহিত্যের ভিতর দিয়েও আমাদের অনুগমন করতে হবে কেননা সমালোচকরূপে তিনি আবিষ্কারকও ছিলেন। অতীতের যে সকল ভাল লেখা ও লেখক সাধারণের অগোচরে থেকে গেছে কিংবা কোন দিকপাল সাহিত্যিকের আওতায় পড়ে নিজস্ব প্রভা বিকিরণ করতে পারেন নি অথচ এঁদের পরিশ্রমেই সাহিত্যের আয়তন বেড়ে উঠেছে, ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন নি ঐতিহ্য রচনায় সাহায্য করেছেন বলে এঁরা মূল্যবান—মোহিতলাল বিস্মৃতির সমাধি থেকে এঁদের উদ্ধার করে সমকালীনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নতুন জীবনদান করেছেন। যেমন রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা এবং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' বইটির টীকা ও ভূমিকা সহ সম্পাদনা। 'বঙ্গদর্শন' ও 'বঙ্গভারতী' সম্পাদনায় প্রাচীন লেখকদেব যেমন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির রচনা-সঙ্কলনে তাঁর সেই সম্মানদানের আগ্রহই উপলব্ধি করেছি। তাঁর এই 'মনোমুখী পশ্চাদ্দৃষ্টি' (inward backward gaze) থাকায় মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ বা মূল্য নির্ধাবণের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। উদাহরণতঃ মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা যখন রবীন্দ্রযুগে ম্লান হয়ে আসছে, কোন কোন অত্যাধুনিক লেখক তাঁদের প্রতিভা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, তখন ক্ষুব্ধচিত্তে তা অনুভব করে এঁদের গুণগ্রাহী হিসেবে হৃদয়ের মুক্তদৃষ্টির নির্দেশে তিনি নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করেন। মনের মহত্তম শ্রদ্ধানিবিড় দৃষ্টির ফলে এক্ষেত্রেও তিনি নব নব সৌন্দর্য

ও ভাববস্তু আবিষ্কার করেছেন। মধুসূদনকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে শুধু চিত্রিত করেন নি, বাংলা সাহিত্যের নবযুগের মন্ত্রের আদি-স্রষ্টা মধুসূদনকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীর অন্তর্জীবন বিশ্লেষণেও তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে তিনি অতীতকে বর্তমানের সম্পর্কশূন্য করে দেখেন নি। বালজাক বলেছিলেন, "To look back is to look beyond." মোহিতলাল অতীতের বিস্মৃতিকে উদ্ঘাটিত করলেও তাতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে ভোলেন নি। বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদেরও যে সকল উৎকৃষ্ট রচনা কোনো-না-কোনো কারণে পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি সে সকলের শ্রেষ্ঠত্বও তিনি প্রতিপন্ন করেছেন। যেমন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র প্রভৃতির রচনাবলীর রসসমৃদ্ধ আলোচনা। তাই বলা যেতে পারে, গত শতাব্দীর স্বর্ণযুগের ফসল কুড়োবার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানকে নিয়ে অফুরন্ত ঐশ্বর্য রেখে গেছেন ভাবী-কালের জন্যে।

সাহিত্য-প্রবন্ধ ছাড়াও বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিতে ভুল করেন নি তিনি। সমকালীন মানবমন যে দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে নিজেকে তার থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে রাখেন নি। স্বকীয় জীবন-দর্শনের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাসত্ত্বেও আমাদের এই সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হলেও সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন তা গ্রহণ করতে বাধ-বাধ ঠেকছে কেননা উনবিংশীয় সংস্কৃতি-সায়াহ্নের ধূসরতায় তিনি অস্থির এবং সে ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি 'ঐস্লামিক উন্মাদনা'র সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন নানাপ্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। সমাজ ও রাজনীতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাঙলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তিনি স্থান দিয়েছেন সবার উর্ধ্বে। বাঙলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বে তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এবং বিশ্বাস করতেন বাঙালী আবার ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। এই বিশ্বাসে যিনি বাধা দিতেন তাঁকে তিনি বাঙালীর শত্রু বলে গণ্য করতেন, তাঁর ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াতেন তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পশ্চাৎপদ হতেন না। বর্তমানের সংকটাপন্ন বাঙালী সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্যে তিনি এই সুরে অশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেছেন। 'বাঙলার

'নবযুগ', 'জয়তু নেতাজী', 'বাংলা ও বাঙালী' বইয়ে এবং 'বঙ্গদর্শন', 'বঙ্গভারতী' সম্পাদনার সময় তাঁর এই সচেতন সত্তা অনুভব করেছি। সাহিত্যের নীতি বা আদর্শের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেকের অমিল থাকলেও কোন সাহিত্য-জিজ্ঞাসু তা অধ্যয়ন না করে নিজস্ব মতামতের সম্পূর্ণতা আনতে পারবেন না কিংবা কোন প্রগতিবাদী সমালোচক তার বিচার না করে বাঙালী পাঠকের কৌতূহলের সদুত্তর যোগাতে পারবেন না। তাই সমস্ত বাদানুবাদ ছাপিয়ে তিনি যে একজন বিশুদ্ধ সাহিত্যের অধিবক্তা হিসেবে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর হাতে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই।

চার

আমার বক্তব্য অবশ্য এরূপ নয় যে মোহিতলাল নিখুঁত সমালোচক। বরঞ্চ সমালোচক হিসেবে তাঁর মানসিক গঠন-ভঙ্গীর (mental make-up) এমন কতকগুলি দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি যাতে সমালোচক হিসেবে তাঁর মূল্য-বিচার প্রসঙ্গে আমি মাঝে মাঝে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি। নির্ভীকতার অস্ত্র তুলে সাহিত্যের সমালোচনায় যে সাহসী আক্রমণ চালিয়েছেন তাতে উৎসাহবোধ করেছি বলেই তাঁর রচনার কয়েকটি দুর্বলতার দিক এখন উল্লেখ করতে চাই।

মোহিতলাল যে বাঙলায় জন্মেছিলেন তার এত বদল হয়েছে, তাঁর প্রিয় ও পরিচিত বস্তুগুলির অন্তর্ধানে তিনি এত ব্যথিত হয়েছেন যে তাঁর যৌবনে যে বিশ্বাস ছিল প্রগতির অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে, সে সময় যে গান গেয়ে তারুণ্যের পুরোধা হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন, তা যখন আজকের বাঙলায় পেলেন না, তখন তাঁর বিশ্বাস জন্মাল যে, স্বর্ণযুগ চিরতরে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। ফলে তাঁর মনে ঘনিয়ে উঠতে লাগল হতাশার অন্ধকার। দীর্ঘদিন তিনি হতাশার অন্ধকারে আলোর সন্ধানে ঘুরেছেন। কিন্তু এতটুকুও আলোর রেখা দেখতে পান নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শবাধার ঘিরে মোহিতলালের ক্রন্দনের ও উষ্মার কারণ হল এই।

বর্তমান প্রগতির মধ্যে যতই মোহিতলাল উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করেছেন তিনি গত শতাব্দীর জীবনদর্শনকে আরও জোরে আঁকড়িয়ে ধরেছেন। তিনি ভেবেছিলেন এ প্রগতি অবাধগতিতে চললে সাহিত্য ও দেশের ক্ষতি হবে। তাই

ইদানীং তিনি সমাজ-জীবনের এক ভিন্ন অর্থ করেছিলেন—সমসাময়িক কালকে ঘোর কলিযুগ মনে করে উনবিংশের আদর্শে তিনি নিজের জীবনকে শোধন করে নিয়েছেন। এ যেন পশ্চিম দিগন্তে শুকতারার স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকা, পূর্বগগনে অরুণোদয়ের রক্তিমদ্যুতি যে রাত্রির অবসান করে উজ্জ্বল দিবসের ঘোষণা করছে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসা। তাই এ যুগের তারুণ্য যেখানে নিত্য নব নব অভিযানে ব্যাপৃত তাকে তিনি অভিনন্দন জানাতে পারেন নি, তাঁর কাছে সেটি অনর্থক কালাপাহাড়ি তাণ্ডব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর কাছে চল্‌তি যুগ রুদ্রের আশীর্বাদ পায় নি, পেয়েছে কেবল দুর্বাসার অভিশাপ।

পারিপার্শ্বিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যকে না দেখলে কবি এবং সাহিত্য-স্রষ্টার জীবনদর্শনের যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায় না। তাই সমালোচনা-রীতির ভিতর রসবিচার ছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে—সেটি হল সমাজ-চেতনা। কবি বা সাহিত্যকার যেমন সামাজিক পটভূমি বাদ দিয়ে কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখতে পারেন না তেমনি সমালোচকও তার বিচার করতে বসে সমাজকে বাদ দিতে পারেন না। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-জীবনের যে একটি অচ্ছেদ্য অদৃশ্য সংযোগ রয়েছে—এই সত্যটি মোহিত-লালের জানা ছিল। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বিহারীলাল থেকে আরম্ভ করে দেবেন্দ্রনাথ সেন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে বাঙলা সমাজের সনাতন রূপটির প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। কিন্তু মোহিতলাল সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে যেটুকু সমাজ চৈতন্য টেনে এনেছিলেন সেটুকুও এমন একটা বিকৃতবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যে আজকের দিনে প্রগতিচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-নীতিক দৃষ্টির বা জ্ঞানের, রাজনীতিক চেতনা বা অনুভূতির চিহ্ন তাঁর মধ্যে নেই, মন-গড়া মতবাদের দোষে দুষ্ট শুধু আলোচনা তাঁর অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ ও মতনিষ্ঠার পরিচয় হিসেবে উল্লেখযোগ্য এবং মানুষ ও জীবনকে কোনদিন অবজ্ঞা করেন নি বলেই তাঁর শিল্পিজীবনের চরম সার্থকতা ওইখানেই নিহিত। সমসাময়িক কালের প্রতি তাঁর বীতস্পৃহ মনোভাব তাঁর শেষের দিকের সিদ্ধান্তসমূহকে এমন এক cynical politics-এর দ্বারা আচ্ছন্ন করেছিল যে সমাজের মধ্যে বাস করেও যে ওরকম বকা যেতে পারে তা ভাবতেও আমার সময় সময় অবাক লাগে।

সমালোচককে হতে হবে নিরপেক্ষ। সমালোচনার অর্থই হল সমান আলোচনা অর্থাৎ সমদৃষ্টি। কোন দল, মত কিংবা গোষ্ঠীর কাছে নিজের মনকে বিক্রী করে লেখার মধ্যে বন্ধকী কারবারের লেন-দেন করা চলবে না—সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু মোহিতলাল সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বত্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারেন নি। কতকগুলো motive (যেমন বাঙালীয়ানা, হিন্দুয়ানা, গতযুগের জন্য হাহুতাশ ইত্যাদি) দ্বারা তিনি পরিচালিত হয়েছেন। যেখানে motive মাথা তুলেছে সেখানে তিনি সমালোচক হিসেবে ব্যর্থ। তিনি যখন 'কল্লোল-কালি-কলম'-এর বিরুদ্ধ পক্ষ "শনিবারের চিঠি'তে গিয়ে সজনীকান্তের সঙ্গে একত্রিত হলেন তখন 'কল্লোলে'র বিপক্ষে যা লিখেছিলেন তা সব সময় সমালোচনা হিসেবে গ্রহণীয় নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা গালাগালের পর্যায়ে নেমে এসেছে। (দ্র. অতি আধুনিক প্রতিভা : শনিবারের চিঠি, ১৩৩৮)। সে-সময় কল্লোল লেখকদের মধ্যে অনাচার ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে তাঁরা যে সুন্দরের তপস্যায় মন দেন নি তা বলা যায় না। অনাচারকে বড় করে দেখে তিনি গোষ্ঠীর মন বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাহিত্যিকরা অধিকাংশ এই কল্লোল-কালীন লেখকবৃন্দ। আজ যখন এঁরা বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তখন মোহিতলালের অনেক মন্তব্যকে বাতিল করা যায়। তিনি এঁদের সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মশা' কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে বলেছিলেন 'ঘোলাটে রাতের অপচয় এরা প্রভাতেই যাবে সরে।' সত্যিই কি তাই! রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর কতকগুলো মন্তব্য যেমন 'বলাকা'র পর রবি-প্রতিভার বিকাশ হয় নি কিংবা গদ্য-কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে (দ্র. সাহিত্য-বিতানে 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা' প্রবন্ধ) প্রশংসা করা যায় না। বাস্তবপক্ষে এসব আলোচনার মধ্যে সমালোচকের ঈর্ষা, অভিমান, গোঁড়ামিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ ত্রুটি কমবেশী পরিমাণে আমাদের সাহিত্য-সম্রাটদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। যথা, বঙ্কিমচন্দ্র; তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হয়েও তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' বই যা শরৎচন্দ্রের পূর্বাভাষরূপে স্বীকৃত বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত একমাত্র উপন্যাস—সেই উপন্যাসের সমালোচনা কিংবা উল্লেখ 'বঙ্গদর্শনে'র কোন সংখ্যাতেই করেন নি অথচ অনেক অল্পখ্যাত লেখকদের মামুলী বইয়ের সমালোচনা করেছেন। 'স্বর্ণলতা' বইখানা যে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা স্বীকার করে একে অজ্ঞানতাবশতঃ ত্রুটি কিছুতেই বলা যায় না। সে যুগের

মৌলিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' তাঁর নীতিবিরুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস ছিল বলে বঙ্কিম এড়িয়ে গেছেন। এই মানুষটি বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবা বিবাহকেও সমর্থন করেন নি, করেছেন বহুবিবাহকে যা সেযুগের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের শ্রাদ্ধ করেছেন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'কে অশ্লীল তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য বলেছেন, তাঁর মতে 'মানসী', 'সোনার তরী' প্রভৃতি কাব্য ভাবের ধূম্রাচ্ছন্নে অস্পষ্ট। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক ভালো সমালোচনাও লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধু সম্পর্কে সমালোচনা এক কথায় অনবদ্য। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যাদি প্রত্যাহার করেছিলেন উত্তর জীবনে—তাঁর আলোচনা সমালোচনার নামে এক একটি অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলালের ভবভূতি ও কালিদাস সম্পর্কে প্রবন্ধ তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় প্রদান করে। ইনিও পরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রত্যাহার করেছিলেন, নিজস্ব মতের অসম্পূর্ণতা বুঝতে পেরেছিলেন। এঁদের বিভিন্ন জন সম্পর্কে সমালোচনা যখনই সঙ্কীর্ণতা কিংবা বিদ্বেষ দোষে দুষ্ট হয়েছে তখনি দেখা গেছে যে এঁরা সাহিত্য-বিচারে পরাজিত হয়েছেন, শাস্তিস্বরূপ তার ফল হাতে হাতে পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার না করলেও তারক গঙ্গোপাধ্যায় আজ স্বমহিমায় ভাস্বর। দ্বিজেন্দ্রলাল আক্রোশবশতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা-তা বললেও রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্ববিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল নিজস্ব মনোভাবের সংস্কার করেছিলেন, মোহিতলালের মতন পণ্ডিতব্যক্তি একটু অদলবদলও করলেন না—এটাই দুঃখ দেয় বেশী। এদিয়ে তাঁর মত-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু এই গোঁড়ামিই তাঁর সর্বনাশ করেছে। অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর এ দোষের জন্যে কেউ তাঁর 'স্কুলে' যোগদান করেন নি।

পূর্বেই বলেছি যে তিনি পৌরুষ ও বীর্যবান সমালোচক ছিলেন। বীর্যের প্রসাদ প্রায়ই দম্ভমিশ্রিত। মোহিতলালের ক্ষেত্রে এই সত্যটি আমাকে সবচেয়ে ব্যথিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" মোহিতলাল মনস্বী হয়েও অহমিকা ছাড়তে পারেন নি। তিনি নিজে বলেছেন, "আমার সাহিত্যিক আদর্শ বরাবরই কিছু স্পর্ধাপূর্ণ।" তাই নিজের অহংকে প্রশ্রয় দিয়ে অপরের অহমিকা শোধরাতে গিয়ে তাঁর সমালোচনাদি অশোভন উগ্রতায় তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবোধকে অনেক সময়

ক্ষুণ্ণ করেছে। আরও দুঃখের বিষয় শেষজীবনে তাঁর ঐ দুর্বলতা এবং উনিশ শতকের প্রতি মাতৃসুলভ মমত্ববোধ এমন আকার গ্রহণ করে যে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের পক্ষেও শ্রদ্ধা পোষণ করা একরূপ অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেটি একসময় সামান্য দুর্বলতা ছিল সেটিই শেষের দিকে একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মতন তাঁর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। উনিশ শতকের একটি set-idea-র প্রভাবে তিনি এতদূর কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে গত শতাব্দীর সভ্যতাই তাঁর বিচারে একমাত্র সভ্যতা এবং সে-যুগের সাহিত্যই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর এ সময়কার মানবিকতা বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয় নি, সাহিত্যের বিচারও যথাযথ হয় নি, আত্মপরায়ণ (egoist) হয়ে উঠেছে। এজন্যে লেখকদের লেখার মধ্যে যে সহমর্মিতা তাঁর একটি গুণ বলে পরিগণিত হত, পরে প্রীতির অভাবে অন্ধ-বিরূপতায় তাঁর আলোচনা আমাদের প্রতিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যে-বিকৃতি আমাদের এইভাবে পীড়িত করে তার অন্তরালে আমরা মোহিতলালের যে ব্যক্তিপুরুষের সাক্ষাৎ পাই তাতে স্বজাতি স্বদেশ ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি সন্দীপিত। এই প্রেরণাই তাঁকে একরূপ অন্ধের মতো দিগভ্রান্ত করেছে। ফলে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বিচারবুদ্ধির বেদনাদায়ক ভ্রান্তি তাঁর সমাজ-চেতনাকে নিতান্ত দুর্বল করে একপেশী সঙ্কীর্ণ মনোভাবের (প্রাদেশিকতা, হিন্দুয়ানী ও বাঙালীয়ানা) সঙ্গে সাহিত্যকে গুলিয়ে দিয়ে বিচারবুদ্ধিকে খাটো করে দিয়েছে। বাঙালী বৈশিষ্ট্যের নামে শেষে জাতি-রক্তের তত্ত্বে (Blood Theory) গিয়ে তিনি পৌছেছেন। কাজেই মহৎ প্রেরণার অভিব্যক্তি তাঁর স্বভাবগুণে রূঢ় হয়ে পড়েছে। এই স্বভাবের সীমা যদি তিনি উত্তীর্ণ হতে পারতেন, সহজ আত্মসমাহিতির প্রসাদে এ তিক্ততার উপরে যদি উঠতে পারতেন তাহলে আমরা আরও ভাগ্যবান মনে করতুম। তাই এসব দেখে-শুনে তাঁর সম্পর্কে 'An Acre of green grass'-এ বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যকে অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

তাহলেও সুখের বিষয় হল যে মত্ততার যুগে তিনি ছিলেন অপ্রমত্ত, কেননা নানা মতবাদের মন-ভুলানী হাতছানি উপেক্ষা করে সাহিত্যের চিরকালীন সুর কণ্ঠে ধারণ করে এবং যে নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তাতে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আর যাই করুন শস্তা জনপ্রিয়তার লোভ তিনি সংবরণ করেছেন। স্পর্ধা ও দম্ভের সঙ্গে যা চিরকালের ভাল তাকেই তিনি ঘাত-প্রতিঘাত

অগ্রাহ্য করে সারাজীবন স্বীকার করে গেছেন তার মধ্যে প্রাদেশিকতা, হিন্দুয়ানা, বাঙালীয়ানা যাই থাক না কেন। বরং এদিক দিয়ে দেখলে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অনমনীয় চরিত্র দৃঢ়তা সর্বযুগের বাঙালীর বিস্ময় হয়ে থাকবে। আরো সহজ হবে যদি আর একটি কথা মনে রাখি—রবীন্দ্রনাথের কথা নিয়েই সেটি বলছি, "মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি তো সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোট তাহা গলিয়া ধুলায় পড়িয়া ধুলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিসই টিঁকে যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন।" তাই অহঙ্কারের মত শোনালেও সাহস করে ঘোষণা করছি, বিপুল সৃজনী শক্তির প্রভাবে যে দান তিনি রেখে গেছেন তাঁর লোকোত্তর জীবনে, তার খাদের অংশ ঝরে পড়ে গেলেও উজ্জ্বল হয়ে রইবে তাঁর কতকগুলি রসসৃষ্টি যা শুধু একালের নয় চিরকালের অনাগত ভবিষ্যৎ তার পূর্ণস্বত্ব ভোগ করে কৃতার্থ হবে॥

মোহিতলালের প্রবন্ধ

আমাদের সাহিত্যে কাব্য-গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্র যেমন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার তুলনায় প্রবন্ধ-নাটকের গতির জড়তা আজও ঘোচে নি। নাটকের কথা বাদ দিন—আমার আলোচনার মধ্যে তার কথা আসে না। প্রবন্ধ-সাহিত্যের ওপর চোখ বুলোলে সার্থক প্রবন্ধকারের সংখ্যা এত কম যে আঙুলে গুণতে আঙুল ফুরোবে না। মোহিতলাল মজুমদার সেই স্বল্প-সংখ্যক প্রবন্ধকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। প্রবন্ধসাহিত্যের প্রতি এই অবহেলাসূচক মনোভাব এর আগে কোনোদিন হয়েছে বলে মনে হয় না। এর জন্ম-লগ্নও খুব বেশী দিনের নয়—উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের তাগিদে এর জন্ম। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ঐ শতকই প্রবন্ধ-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ, এই গোটা শতক ধরে বহু মনীষী ও সংস্কারক প্রবন্ধ-সাহিত্যের চর্চা করেছেন এবং চর্চার ফলে বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু সোনার আমদানী করেছেন। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না কিন্তু জেনে রাখা উচিত যে বর্তমান গল্প-উপন্যাসের মধ্যে ভাষার যে ঔজ্জ্বল্য আমরা লক্ষ্য করছি প্রবন্ধ-সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য দ্বারা অনেকখানি তা প্রভাবিত। কিন্তু রবীন্দ্রযুগের শেষের দিক থেকেই ধরা যাক ১৯৩০।'৫ থেকে কেন জানি না আমাদের সেই সচল স্রোতটি রুদ্ধ হয়ে হয়ে এখন ক্ষীণপ্রাণ হয়ে বয়ে চলছে। মনে হয় বাঙালীর চিন্তাশক্তির ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে আসছে। এখন একটা সহজিয়া সুর চার দিকে শোনা যাচ্ছে, চিন্তা-প্রবণতার প্রসার হচ্ছে না, যুক্তিপ্রধান প্রবন্ধ-সাহিত্যের স্থলে ভাবাশ্রয়ী প্রবন্ধের চলন হয়েছে। মাঝে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন, আর এর বিপরীতে ছিলেন মোহিতলাল। এঁরা দু'জনেই বিগত—বর্তমানে আর যাঁরা আছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমকালের লেখক, আর এঁরা প্রবন্ধ-চর্চা প্রধানভাবে করেন না, মুখ বদলাবার জন্যে এ সাহিত্যে মাঝে মাঝে আনাগোনা করেন। প্রবন্ধ-পুস্তকের প্রকাশক জোটে না, ব্যবসায়ের সহায়ক নয় বলে আদৃত হয় না, পাঠকমহলে তাড়াতাড়ি নাম কেনা যায় না, মাসিক পত্রে মননশীল প্রবন্ধ থাকলে পত্রিকার কাটতি হয় না, গল্প-উপন্যাস পড়ুয়ারা প্রবন্ধ পড়েন না; কাজেই সম্পাদকের প্রবন্ধের প্রতি অনুরাগও নেই। এজন্যে অনেকেই প্রবন্ধ-

রচনায় আগ্রহ প্রকাশ করলেও বাস্তব থেকে প্রেরণা পান না। এর ওপর রম্যরচনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, হালকা চালে এলোমেলো কথা-বলাকে প্রবন্ধের নাম দিয়ে চালানো হচ্ছে। ভাষার মারপ্যাচে যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার রেওয়াজ শুরু হয়েছে যাকে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'বাজে কথা' আখ্যা দিয়েছিলেন। ললিত উক্তির উদ্‌ব্যক্ত উচ্ছ্বাস ভালো কি মন্দ এ মন্তব্য করব না তবে মনে হয় তরল মানসিকতার জন্যে প্রবন্ধের জাত মারতেই সে এসেছে। সে যাই হোক, আজকে যেখানে নতুন নতুন শক্তিমান কবি, গাল্পিক, ঔপন্যাসিকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেখানে সার্থক নতুন প্রাবন্ধিকের সন্ধান একটিও পাওয়া গেল না। এর থেকেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে বাঙালা লেখকরা মননশীলতাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচেন। কাজেই বাধ্য হয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যের পুরোনো পুঁজি ভাঙিয়েই আমাদের দিন গুজরান হচ্ছে। এমন করে কতদিন চলবে কে জানে!

কিন্তু ভূমিকা থাক। আসল কথায় আসা যাক। মোহিতলালের রচিত প্রবন্ধের আলোচনা করতে হলে প্রবন্ধ-সাহিত্যের রূপ-প্রকৃতি এবং প্রবন্ধের ইতিবৃত্তের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

সাধারণের ধারণা প্রবন্ধ রচনা করা খুবই সোজা। দু-চারটে বই পড়ে ভাব ও ভাষার এদিক-ওদিক করে একটা প্রবন্ধ খাড়া করা এমন কী কষ্টের কাজ! কিন্তু রসোজ্জ্বল প্রবন্ধ-রচনা করা যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কঠিন, এ সত্যটি হঠাৎ কেউ স্বীকার করতে প্রস্তুত হবেন না। প্রবন্ধ বলতে আমরা সেই জাতীয় রচনাকেই বুঝিয়ে থাকি যে গদ্যরচনা উক্তির পারম্পর্য, বুদ্ধির আভিজাত্য, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, মননধারার প্রাখর্য ও সঙ্গতি, তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণের সহায়তায় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে বিশেষ কোনো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে অনুভূতির প্রকাশ বড় কথা নয়, বড় কথা হল—যুক্তিমূলক ক্রমশৃঙ্খলা প্রয়োগে কোনো সত্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই জাতের রচনায় শুধু বিষয়বস্তুর মহিমা, তথ্য, তত্ত্ব, তর্ক, যুক্তি, সিদ্ধান্তের গুরুভার চাপালে কাজ হবে না—সুষম গতিভঙ্গীর দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে যাতে একটা অনির্বচনীয় ললিতগুণ সম্বলিত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে যা পাঠকের মনকে টেনে রাখবে। সিদ্ধান্তের গুরুভারে লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে এবং তা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট'-ও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তার ভোক্তা হিসেবে পাঠকের চিত্ত ভরবে না যদি না তাতে সাহিত্যিক গুণ

থাকে। প্রবন্ধ-সাহিত্যে লেখক কি বলছেন এটা যেমন আমরা দেখি তেমনি তিনি তাঁর বক্তব্যকে কতখানি সুন্দর করে বললেন, পাঠকের হৃদয়ে কতখানি আনন্দের সঞ্চার করলেন তাও আমরা বিচার করে দেখব। খাঁটি সাহিত্যিক-প্রবন্ধ 'Literature of Knowledge' ও 'Literature of power'—এ দুয়ের মিলনে রচিত। তাই Saintsbury প্রবন্ধকে 'work of prose art' বলেছেন।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে ওপরে যে কটি কথা বলা হল তার নিরিখে মোহিতলালের প্রবন্ধগুলিকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তাঁর প্রবন্ধ রচনায় যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্ত কিংবা কোনো নীরেট সত্য ও পাণ্ডিত্য জাহির করার অহঙ্কার কোথাও মাথা তুলে দাঁড়ায় নি বরং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সাহিত্যবোধ ও হৃদয়বত্তা সমন্বিত হয়ে প্রবন্ধগুলি বিদ্বানের লেখা হয়, বিদগ্ধজনের লেখায় পরিণত হয়েছে। এর কারণ হল, মোহিতলাল একাধারে কবি এবং সমালোচক দুই-ই। তাঁর অন্তরতম কবি-প্রাণের সঙ্গে সমালোচনার ভাবনাশ্রিত চিন্তাধারা অর্থাৎ বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ানুভূতি, জ্ঞানের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ তাঁর রচনায় অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়ে আছে। এহেতু খাঁটি সাহিত্যের কথা ছাড়া যখন তিনি সমাজ ও রাজনীতির কথা বলেন তখনো তাঁর কবি-প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়। সাহিত্যগুণ সম্বন্ধে স্পষ্টসচেতনতাই তাঁকে অসাহিত্যিক হতে দেয় নি—তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে এটিই হল বড় কথা। তাই তিনি কাব্য ছেড়ে প্রবন্ধ রচনার দিকে গেলে কাব্যের যে ক্ষতি হয়েছিল সে ক্ষতির পূরণ হয়েছে তাঁর সুচিন্তিত ও সারগভ প্রবন্ধাবলীর দ্বারা। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর কবি ও সমালোচক সত্তার দ্বন্দ্ব হয় নি, সুয়োরাণী দুয়োরাণীর মত তারা কলহ করে নি, দুজনে এক হয়ে তাঁর মানসলোকের সিংহাসনে পাটরাণী হয়ে বসেছে। বিষয়ের অন্তঃস্থলে তিনি প্রবেশ করতে পারতেন, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির গূঢ় সংযোগ বেঁধে দিতে পারতেন। কবির সহানুভূতি নিয়ে সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তিনি কবি-সাহিত্যিকদের রচনার মর্মকথা ব্যাখ্যা করতেন। তাই তাঁর দৃষ্টি জীবনের সৌন্দর্যব্যাপ্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বিশ্লেষণের সঙ্গে সমগ্রতার অন্বয় ঘটেছে। এজন্য তাঁর প্রবন্ধের ধর্মই হল স্রষ্টার ধর্ম, বিষয়বস্তুকে Revitalise করা, রুচিকর শিল্পকার্যে তা উদ্বোধিত। Virginia Woolf শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের গুণবত্তা প্রসঙ্গে বলেছেন, "A good essay must draw its curtain round us but it must be a curtain

that shuts us in and not out." চিন্তার উপাদান এবং হৃদয়ের উপাদানের সঙ্গে শব্দার্থের যথাযথ্যবোধ (precision) ও বক্তব্যের পারিপাট্য বিন্যাস উভয়ই মিশ্রিত হয়ে তাঁর রচনাকে ঐ গুণে গুণান্বিত করেছে।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাস একটু মনোযোগী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে মোটামুটি দুটি পর্বে অনায়াসে তাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে- রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ও রবীন্দ্র-পরবর্তী। প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এমন একজন লেখক যিনি উপরোক্ত দুপর্বের দুহাতকে একত্রিত করে দিয়েছেন। আর কোনো লেখক এ দুটি দিক একসঙ্গে নাড়াচাড়া করেন নি—হয় কেউ প্রথমটি নিয়ে পড়েছেন নয়তো কেউ দ্বিতীয়টি নিয়েই মেতে আছেন। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কালের প্রবন্ধকারদের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ কারণ প্রবন্ধকে তিনিই প্রথম আঁতুড় ঘরের নিঃসহায়তা ঘুচিয়ে পথ্যসেবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে যেমন রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয় অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের কাল তার সমকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক-সামাজিক প্রবন্ধাদির ভাষা খুবই অনলঙ্কৃত ছিল—কলাবিদ্যার পারিপাট্য ছিল না বলে আজকের পাঠক যদি তাতে অনুৎসাহ প্রকাশ করেন, তা নিয়ে তাঁদের দোষ দেয়া যায় না। যুক্তির সঙ্গে ভাষার কারিকুরিও প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধই বক্তব্যের ঋজুতায় ও সাবল্যে, ছন্দোময় বিন্যাসে ও রাগ বন্ধনের সুষমায় বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'কে আশ্রয় করে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবান্বিত প্রাবন্ধিক চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখা দিলেন এবং এঁদের সমকালেই চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন। কিন্তু শেষোক্তরা বড্ড বেশী উচ্ছ্বাসপ্রবণ। এর পরই এলেন রবীন্দ্রনাথ যিনি স্বকীয় প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিসত্তার স্পর্শে কল্পনার ঐশ্বর্যে, ছন্দ সৌন্দর্যে, ভাষার লালিত্যে প্রবন্ধকে চিত্তহারী করে তুললেন, পুরাতনের সঙ্গে আধুনিকের মিলন ঘটিয়ে দিলেন। এঁর সমসাময়িকদের মধ্যে প্রবন্ধ-সাহিত্য রচনা করেছেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী। চৌধুরীমশায় বাদে এপর্বের সব লেখকের ওপর প্রধানতঃ ইংরেজি সাহিত্যের কার্লাইল, এমার্সন, হ্যাজলিট, ডি কুইন্সি, লুই ষ্টীভেনসন, রাস্কিন প্রমুখদের প্রভাব পড়েছিল, রচনা-

কার্যে ভাব ও ভাবুকতার প্রাধান্য ছিল বেশী। এর পরই যে কাল এল তাতে রচনাধারা, বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী উভয়তঃ কিঞ্চিৎ পৃথক হয়ে গেল। এই ধারায় রচনার ভিতর ভাবের চাইতে প্রাধান্য পেল প্রকাশের বৈচিত্র্য। বলার বিষয়টির চেয়ে কিভাবে বলা যাবে সেই কথাটি আগে ভেবে নেবার দিন এল। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে একটা মোটারকমের পালাবদল ঘটে গেল। আধুনিক এই স্বতন্ত্র অধ্যায়ের লেখার স্কুল প্রবর্তন করেছেন প্রমথ চৌধুরী। বক্তব্যের চেয়ে প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যের ওপর তাঁর অনুরাগ বেশী। আগের লেখকরা গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজি প্রবন্ধ-সাহিত্যের আদর্শ, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী দীক্ষা নিয়েছিলেন ফরাসী লেখকদের কাছ থেকে। তাই ওদেশের লেখকদের মতোই তাঁর লেখায় বক্তব্যের স্বচ্ছতা, ব্যঙ্গপ্রিয়তা, লঘুচাপল্য, শব্দনির্বাচনে তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তির বিকিরণ দেখা দিল, আগের যুগের কবিসুলভ emotionকে তিনি নির্মমভাবে বিদায় দিলেন। মোট কথা, তাঁর প্রবন্ধে 'হৃদয়' বলে জিনিসটা ছিল না যার বাড়াবাড়ির চোটে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে যায়, ভাবোচ্ছ্বাসের প্লাবন প্রবল হয়ে ওঠে। যার উদাহরণ চাইতে গেলে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে একাধিক খুঁজে পাওয়া যাবে। বীরবলী ঢঙে যাঁরা লিখছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি।

কিন্তু প্রাবন্ধিক মোহিতলাল এ পর্বে অবস্থান করে আধুনিক ধারাকে গ্রহণ করেন নি। তিনি গ্রহণ করেছেন প্রথম পর্বের রচনারীতি। প্রবন্ধে বঙ্কিমী রীতি আমাদের পরবর্তী প্রাবন্ধিকদের বহু পরিমাণে প্রেরণা যুগিয়েছে। সেকালের 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকগোষ্ঠী তার প্রমাণ হলেও একালের ওপরও তাঁর প্রভাব পড়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন যেমন কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার। উপরি-উল্লিখিতদের মধ্যে মোহিতলালই বঙ্কিমী রীতিকে আত্মসাৎ করেছেন এবং তাঁর ওপর বঙ্কিমের প্রভাব পড়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। তিনি বলেছেন যে তিনি চোখ মেলেছেন সেই গত শতাব্দীতে, নিঃশ্বাস নিয়েছেন সেই শতাব্দীর বাতাসে। কাজেই সেই শতাব্দীর প্রভাব তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকবে এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই শতাব্দীর ঋষিকল্প পুরুষ তাই যে তাঁকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করবে তাতে বিচিত্র কী! তিনি সাহিত্যে গুরুবাদ মেনেছেন এবং সাহিত্যগুরু পদে তাঁকে বরণ করেছেন।

এজন্য আমরা দেখি মোহিতলালের নিবন্ধাদির মধ্যে অর্ধেকের বেশী বঙ্কিমচন্দ্র জায়গা নিয়ে বসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন, "সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়—জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্ত মনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি পাওনা যেন যথালাভের মতো। কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।·· নবীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক সাহিত্য)। এই উক্তি মোহিতলাল সম্পর্কে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনিও বঙ্কিমের মত বাঙালী জাতিকে, বাংলা সাহিত্যকে, বাংলা ভাষাকে উন্নত করতে চেয়েছেন। বাস্তব জগৎ ও জীবন হতে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। প্রবন্ধ-সাহিত্যের বলিষ্ঠ আদর্শের মাধ্যমে তিনি ঐতিহ্যমার্গী-ধ্যান-ধারণায় জাতির চিত্তোন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন। এজন্যে অনেক সময় তাঁকে রসসৃষ্টির সুনিশ্চিত পন্থা ত্যাগ করে নিজস্ব মতবাদ প্রচারের জন্যে পা বাড়াতে হয়েছে। সেকালের যুগ-সঙ্কটে বঙ্কিমচন্দ্র যা করেছিলেন একালে মোহিতলাল তাঁরই প্রদর্শিত পথে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। বঙ্কিম ছিলেন অতীতমুখী, বিষয়বিন্যাসের আদর্শ ছিল রোমান্টিক। সেই আদর্শকে সত্যে পরিণত করার একটা ব্যাবহারিক মনোগতি থেকে তাঁর যেমন একটি বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠেছিল তেমনি মোহিতলালের কল্পদৃষ্টি থেকে এমন একটি দৃষ্টি বহির্গত হয়েছিল যা বাস্তববর্জিত নয়। ভাষা-শিল্পের ক্ষেত্রে মোহিতলাল বঙ্কিমের মত উপযোগিতাবাদী। উপযোগিতাবাদী হতে হলে শিল্পীকে প্রধানতঃ কারুকর্মী হতে হয়। যোদ্ধ মনোভাব ও আদর্শপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্তিপ্রবণতা আর কারুকর্মের মিলনে বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনা যেরূপ গ্রহণ করে তা মোহিতলালের গদ্য-রচনায় তাই পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমের ভাষার সারল্য তিনি সবসময় রক্ষা করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির যা ত্রুটি তা মোহিতলালের রচনারীতির ত্রুটি হলেও বাড়তি কতকগুলি এমন মারাত্মক ত্রুটি ছিল যাতে তাঁর অনেকগুলি

গুণ ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই কারণে তিনি তাঁর জীবিতাবস্থাতে যথাযোগ্য সম্মান পান নি, যদিও তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো আমাদের কর্তব্য ছিল তাঁর কতকগুলি মহৎ দানের জন্যে।

মোহিতলালকে বঙ্কিমবাবুর অনুপন্থী লেখক বলে নির্দেশ করলেও একথা বলা যায় না যে তাঁর ওপর আর কারোর প্রভাব পড়ে নি। রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধের ভাবধারা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্র-রচনারীতির ভাববাদ (কবির কল্পনা, ভাষার যাদুকরী শক্তি) আর বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিবাদ (বাঙালীয়ানা, হিন্দুয়ানি প্রভৃতি [illegible]) মোহিতলালের গদ্য রচনা [illegible] সম্পর্কে [illegible] এখানেই তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রতিভার অতি ভাস্বর দীপ্তি তার সমকালীন সাহিত্যিকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে মোহিতলালের রচনাশৈলী কিংবা প্রবন্ধের গুণাবলী সকলের মনে আগ্রহের সঞ্চার করে নি।

মোহিতলালের একটানা গদ্য রচনা শুরু হয় ১৩২৬ ভারতীর আসর থেকে। এর আগে 'মানসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ছুটকো দু একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। 'মাসকাবারী' অধ্যায়ে 'সত্যসুন্দর দাস' নাম দিয়ে অনেক তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেন। এই আলোচনায় একদিকে তাঁর বস্তু-বিশ্লেষণ ক্ষমতার এবং অপরদিকে তাঁর সমালোচনা প্রতিভার পরিচয় মেলে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যতত্ত্ব যুক্তির সমর্থনে দাঁড় করিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে চলতি সরল ভাষায় তিনি সে আলোচনা করেছিলেন তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] অনুপস্থিত ছিল—পরে তাঁর যে মতবাদ তাঁর আলোচনার মধ্যে [illegible] জাঁকিয়ে বসেছিল তার স্পর্শ এগুলিতে তেমন ছিল না। এই আদিপর্বের গদ্য রচনার হাতেখড়ি হলেও এই আলোচনাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে আমি মনে করি। এরপর ১৩৩০-এ 'নব্যভারত' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর গদ্য রচনার উদ্যোগ পর্বের সূত্রপাত হয়। 'নব্যভারত'-এ ধারাবাহিকভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এবং 'প্রবাসী'তে 'কাব্যকথা' নাম দিয়ে বাংলায় একটা 'কাব্যবিজ্ঞান' খাড়া করতে চেয়েছেন। এ পর্বে [illegible] তাঁর ভাষা ও ভঙ্গী বঙ্কিমী ঢঙ নিতে আরম্ভ করে। তাঁর গদ্য-জীবনের যুদ্ধপর্ব শুরু হয় 'শনিবারের চিঠি'কে আশ্রয় করে (১৩৩১)। এই পর্বে তিনি সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে নিন্দা স্তুতি দুই-ই পেয়েছেন, তাঁর গদ্য রচনার পরিণতি ঘটেছে কিন্তু এরই পিছু পিছু তাঁর ত্রুটিগুলিও এগিয়ে

দর্শনের মূলতত্ত্ব বুঝতে হলে উল্লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিশেষ সহায়ক।

কেন তিনি আমাদের সকলের সাগ্রহ সমাদরে বৃত হন নি তার কৈফিয়তে শুধু রবীন্দ্রনাথের সর্বতোময়-প্রতিভার অপ্রতিহত প্রতাপের দোহাই পাড়লে যথাযথ উত্তর দেওয়া হবে না বরং তাতে সত্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় রয়ে যাবে। বললে হয়তো কালাপাহাড়ীর মতো শোনায় কিন্তু বলতেই হয় যে মোহিতলালের মনস্বিতা সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর তারিফ করা যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড়ো আপত্তি যে তিনি যে-যুগে জন্মেছিলেন তাকে অতিক্রম করে, তিনি যে কালে বেঁচেছিলেন সেই কালকে সশ্রদ্ধ সহানুভূতি দিয়ে গ্রহণ না করে বেদরদী বিমুখতা দিয়ে তাকে বরাবরই দূরে সরিয়ে একালের শিল্পী মনকে বুঝেছেন, যেন ইচ্ছে করেই এর বিকৃত দিকটাই দেখেছেন—তাই বোঝার মধ্যে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। কালের ঊর্ধ্বে লেখক বাস করেন সত্য, কিন্তু নিজের জন্মকালেরও কিছু নগদ পাওনা থাকে যা লেখককে শোধ দিতে হয়। সাহিত্যের বিষয়-বস্তুতে চিরন্তন বলে কিছু নেই সাময়িক থেকে নিত্যকালের জন্ম। স্রষ্টারাই তাকে প্রজ্ঞার আলোকে শোধন করে নেন। একালের বিক্ষুব্ধ সংঘাত তাঁর মনোলোকে [illegible] যার ফলে তিনি কিছু দিনের জন্যে পক্ষবিস্তার করেছিলেন কবিতায় এবং যুক্তিবাদী আধুনিক মননকে গ্রহণ করেছিলেন বলে আধুনিক কবিতার একদিন নেতৃত্বও করেছেন, সেই প্রগতিশীল মানুষটি কেন জানি না গন্ধে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন নিজের কল্পিত-জগতের মোড়কের মধ্যে, শামুক যেমন নিজের দেহ গুটিয়ে নেয় নিজের খোলার মধ্যে। বাধ্য হয়ে তাঁর দৃষ্টি মুখ্যত অতীতে বিসর্পিত হয়েছে এবং টানা গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। উনিশ শতকের ঐতিহ্যে তাঁর ফিরে যাবার হয়তো যুক্তি রয়েছে তাঁর কাছে, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তা যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্প সম্পর্কে যে নির্দেশনামা 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে জারি করেছেন, আমার ধারণা, সাহিত্য সম্পর্কে সে কথাগুলি প্রয়োগ করলে সকল মতবাদীরই গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি বলেছেন, "সেকাল ছেড়ে কোন শিল্প নেই এটা ঠিক, কিন্তু একাল ছেড়েও কোন শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে এটা একেবারে ঠিক। সেকালের শাস্ত্রমতো ক্রিয়া করে চললে এখনো আমরা সেকালের মতোই সবদিকে বিস্তার লাভ করতে পারি কিন্তু একালকে বাদ দিয়ে ক্রিয়া করা চলবে না কেননা, বর্তমানকাল

এবং বর্তমানের উপযোগী-অনুপযোগী ক্রিয়া বলে কতকগুলো পদার্থ রয়েছে যেগুলোকে মেনে চলতেই হবে আমাদের, না হলে সেকালটা ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই দেবে না আমাদের এবং তাবৎ শিল্পজগতের অধিবাসীকে।" (শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড)। মোহিতলাল কিন্তু একালকে ছেড়ে গতকালের দর্পণে নিজের কায়ার প্রতিবিম্ব দেখেছেন আর বারে বারে শিউরে উঠেছেন একালের ক্লিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানসলোকের Yarrow-কে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে। কালান্তরের বিবর্তনে উনিশ শতকী ঐতিহ্যের দিনগুলি সোনার খাঁচায় ধরে রাখা গেল না, তাই সে ঐতিহ্য মানুষের কল্পলোকে বাসা বাঁধতে শুরু করল—বাস্তবের সঙ্গে যার আসমান-জমিন ফারাক। অথচ মোহিতলাল নিজ কল্পলোকের ওপর এতদূর বিশ্বাসী ছিলেন যে একালকে সেকালের অনুবর্তী হতে নির্দেশ দিয়েছেন, যা কোনো কালেই হওয়া সম্ভব নয়. যেমন ইচ্ছে করলেই আবার মাতৃজঠরে ফিরে যাওয়া যায় না তেমনি নতুন জীবনের আস্বাদে নবলব্ধ চেতনাও পুরোনো কাঠামোর মধ্যে ফিরে যেতে পারে না। এখানে তিনি যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়েছেন বেশী এবং ঐ sentiment-এর জন্যে বড় ঘটনার তো কথাই নেই কোনো সামান্য ঘটনাতেও তিনি উত্তেজিত হয়েছেন এবং চারদিকে অদৃশ্য শত্রু প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে কেউ সায় না দিলেই কিংবা তাঁর মতের বিপক্ষতা করলেই তাঁকে একহাত নিয়ে ছাড়তেন। নিজের চিন্তাধারা যুক্তিবাদ সমগ্র বাঙালীর পক্ষে ঠিক -এই রকম একটা অভিমানই বলুন আর আত্মগরিমাই বলুন মোহিতলালের ছিল। এজন্যে তিনি নিজস্ব মতবাদের সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না : অথচ আশ্চর্যের বিষয় তিনি অপরের মতবাদের সমালোচনা করতেন। সব সময় মনে করতেন তাঁর বিরুদ্ধে লোকে ষড়যন্ত্র করেছে। এই মনগড়া কল্পনার খেসারৎ দিতে দিতে তাঁর জীবনী-শক্তির অপচয় হয়েছে প্রচুর।

তাঁর বিপক্ষে দ্বিতীয় কথা হল যে তিনি একালের মধ্যে আশাবাদ কোথাও পান নি। রক্তহীনতার জন্যে মানুষের শরীর যখন পীতবর্ণ হয় সে তখন পীত চক্ষে দুনিয়ার সবকিছুকেই পীতবর্ণ দেখে তেমনি তিনিও একালের চারদিকে ঝরে-পড়ার হলদে রঙই দেখেছেন, মঙ্গলের প্রতীক নব যৌবনের সবুজের সমারোহ তাঁর চোখে হলদে বলেই ঠেকেছে। তাঁর মধ্যে নবীন বাঙলার অন্তরাত্মার চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহের যথাযথ গুণগ্রাহিতার অভাব ছিল

বলে আমাদের মধ্যে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সর্বশেষে, যে উদার অখণ্ড সাংস্কৃতিক দৃষ্টি থাকলে জীবনের সবকিছু মালিন্য কালিমাকে সামগ্রিক লাভের মধ্যে ক্ষতির অংশ বলে মেনে নেওয়া যায় মোহিতলালের মধ্যে সেই আপসরফা ছিল না। তাঁর এ মনোভাব প্রশংসনীয় হলেও সর্বক্ষেত্রে তা খাটে না, কারণ, জীবনযাত্রায় এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন আপস করা ছাড়া উপায় থাকে না তখন। সব মুহূর্তে আপস না করলে একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়ে বাহবা পাওয়া যায় কিন্তু হিসেবের খাতায় লোকসানের পাল্লা ভারী হয়ে উঠে। তাঁর 'শোভিনিজম্', 'অবস্কিওরান্টিজম্' মনোভাব পীড়াদায়ক। শিল্প-সংস্কৃতির দ্বারা পরিমার্জিত বহু অধ্যয়নের দ্বারা পরিশীলিত চিত্তে, সহজাত ক্ষুরধার মেধার দ্বারা শাণিত এক বিশেষ সমৃদ্ধ মনে এ জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, একালের প্রতি তাঁর অপ্রীতিমূলক মনোভাব দুঃখজনক বলেই তাঁর প্রতি আমাদের বক্তব্য সজ্ঞানে একটু তীব্র ও উগ্র হল।

তা বলে কি তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে প্রশংসার কিছুই নেই? তাঁর প্রবন্ধ থেকে অনুশীলনেরও কি প্রয়োজন নেই? নিশ্চয় রয়েছে—প্রবন্ধ সাহিত্য তাঁর হাতে অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করেছে এবং তিনি যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রবন্ধলেখক সে-সম্বন্ধে সমালোচকদের মধ্যে সকলেই একমত।

একথা বলাই বাহুল্য মোহিতলাল পূর্বসূরীর নির্মিত বাংলা প্রবন্ধ-ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। তাই তাঁর রচনায় একালের অত্যাধুনিক প্রকাশ-ভঙ্গী আশা করা অন্যায় হবে। রচনায় তাঁর বক্তব্যটাই প্রধান, প্রকাশভঙ্গী গৌণ হলেও কি সাহিত্য-সমালোচনায়, কি সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কিত বক্তব্যকে সুন্দর করে উপস্থাপিত করতে পারতেন। সব লেখার ভেতর তাঁর একটা বক্রোক্তির ক্ষমতা ছিল যার ভেতর শাণিত উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠ বক্তব্যকে চারুত্ব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করত। তাই চটুল মানসিকতা, তারল্য ও অধর্মাচার তিনি সহ্য করেন নি। তাঁর মনের মধ্যে 'Social and moral passion for doing good' নীতি তাঁকে উত্যক্ত করত, যেমন করেছিল ম্যাথু আর্নল্ড ও বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায়। আত্মসম্মানজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস তাঁর প্রখর ছিল, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের লাঞ্ছনায় তিনি বারবার নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর ভাষা অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত, বলিষ্ঠ, সুবিন্যস্ত ও আত্মপাস্ত সরস যেন বজ্রবাহী

মেঘের বুকে জ্বালাময়ী বিদ্যুৎ শিখা। সাহিত্যের কাজ মানুষের মনকে নিদ্রার অন্ধকার থেকে ছিনিয়ে জাগ্রত করে তোলা। বাঙালার মনকে তিনি বারবার আঘাত করেছেন তার জড়ত্ব অচেতনতাকে ভাঙবার জন্যে। কাজেই তাঁর ভাষা তাঁর বক্তব্যের বাহন হয়েছে। এবং এই বাচনভঙ্গীর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিচয়টি আভাসিত হয়ে ওঠে যা খাঁটি সাহিত্যের একটি মস্তবড় গুণ বলে স্বীকৃত।

তিনি যে ভঙ্গীতে যে ভাষাতে লিখে গেছেন সে-ভঙ্গী সে ভাষা আজকাল ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় না। মতের কথা বাদ দিলে তাঁর রচনাভঙ্গীর প্রভাব সজনীকান্ত দাসের উপর কমবেশী পরিমাণে আরোপিত, এ প্রসঙ্গে নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। মোহিতলালের মত উনবিংশীয় দৃষ্টি তাঁকে আচ্ছন্ন না করলেও সাহিত্য বিচারের সময় তাঁর নিজস্ব কতকগুলো একপেশে মন্তব্য আনা প্রায়ই মোহিতলালের কথা স্মরণ করায়। সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও শশাঙ্ক সান্যালের সাহিত্য-সংক্রান্ত সমালোচনা মোহিতলালের Standard অনুসরণ করে। এককালে সাহিত্যের ভাষা ছিল সাধু ভাষা, তারপর চলতি ভাষা এল সাহিত্যে, বর্তমানে চলতি ভাষারও একটা সাধুরূপ দাঁড়িয়ে গেছে। অতি আধুনিক ভাষা লিখতে গিয়ে ক্ষমতাবান লেখকদের হাতেও শ্লথবাক্‌ শিথিলবদ্ধ, সাংবাদিক রীতি প্রয়োগে অনেক জায়গায় অসাধু হচ্ছে, যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়ও আমরা দেখছি। সাহিত্যের ব্যাপারে মোহিতলাল ছিলেন পিউরিস্ট। তাই আজকের দিনে মোহিতলালের ভাষার কঠিন ক্লাসিক্যাল রূপের শক্ত গাঁথুনি, খাঁটি অভিজাত নিষ্ঠাবান ভাষা-চর্চা আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন শুধু এইজন্যে যে তাকে আমরা অনুকরণ না করতে পারি অন্ততঃ তার পটভূমিতে প্রতিফলিত করে ভাষার দোষ-ত্রুটি যেন ভেবে দেখতে পারি।

আমাদের কর্তাভজার দেশে ইদানীং ভালোকে ভালো বলার লোক রয়েছে, মন্দকে মন্দ বলার মত সাহসী লোক দুষ্প্রাপ্য। প্রশংসা যৌক্তিক হোক আর অযৌক্তিক হোক আমরা বিনা প্রতিবাদে উপভোগ করি কিন্তু সত্যিকারের গুণবিচার করতে বসে দোষ-ত্রুটি দেখালেই মতান্তর মনান্তরে গিয়ে পৌঁছোয়। মন তখন সমালোচকের প্রতি বিরূপ হয়। এই যেখানকার অবস্থা সেখানে একজন সমালোচকের দেখা পাওয়াটাই একটি অভাবনীয় ব্যাপার। মোহিতলাল বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে সেই অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা

বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি শেষরক্ষা করতে পেরেছেন কি পারেন নি সে বিচার পরে, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, আন্তরিকতার সঙ্গে মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার অভাব পূরণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; তাঁর সেই একাগ্রসাধনার দ্বারা তিনি সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর সমালোচনার ভালোদিক সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতির খ্যাতি তেমন ছড়ায় নি, তিনি যে রূঢ় অপ্রিয়ভাষী সেই অখ্যাতি ছড়িয়েছে বেশী। অথচ তথাকথিত সমালোচকদের হালচাল দেখে কেন তিনি সাহিত্য-সমালোচনায় রূঢ় হয়েছেন তা আমরা ভেবে দেখি নি, এই অখ্যাতি ছড়ানোর জন্যে আমাদের সাহিত্য-মহলে তাঁর সুচিন্তিত কয়েকটি অভিমতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বরং সেইগুলিকে ঈর্ষাপ্রসূত অভিসন্ধিমূলক ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করে তাঁর সমালোচনাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর ঢাকঢাক গুড়গুড় মনোভাব ছিল না, বিদগ্ধমন যা চিন্তা করত মুখ দিয়ে সেই কথা বেরুত, হাতের কলম নির্বিবাদে লিখে চলত। যাকে যতটা মর্যাদা দেওয়া যায় তাকে তিনি নিজের মানদণ্ডে তৌল করে সম্মান দিয়েছেন। আজকের দিনে সমালোচনার নামে বিজ্ঞাপনী প্রশংসাবাচন তিনি কাউকে দেন নি। কারুর লেখার যে প্রশংসা করেছেন তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন অবশ্য তাঁর বিচার-প্রণালী ভাবাবেগ-সমৃদ্ধ কাব্য-বিচারের পথ। যে লেখা তাঁর ভালো লাগে নি তা সে যতবড় পীরেরই হোক না কেন তাকে সুতীক্ষ্ণ বাক্যশেলের দ্বারা লাঞ্ছিত করেছেন কিন্তু তা কোনো স্বার্থবশে বা গোষ্ঠী-প্ররোচনার দ্বারা উদ্রিক্ত নয়। ইদানীংকার বাংলা-সমালোচনার রূপ-প্রকৃতি লক্ষ্য করে তাঁর বিচার-পদ্ধতির ত্রুটি মনে রেখেও একথা যদি বলি যে, এমন স্পষ্টবাদী, নির্ভীক সমালোচক, নিজস্ব মতবাদে এমন দৃঢ়চেতা এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ একক সংগ্রাম আধুনিক কালে যার দোসর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, সেটা খুব অমূলক উক্তি হবে না।

ব্যঞ্জনের মধ্যে যেমন উচ্ছেরও একটা স্থান আছে, দেহে রসাধিক্য হলে তিক্ত ভক্ষণই বিধেয়, রাষ্ট্রে যেমন একটা বিরোধী দল থাকলে দেশের উন্নতি হয় বলে আমরা মনে করি তেমনি সাহিত্যের গণতন্ত্রে একটা বিরোধী দল থাকা ভালো এবং বিরোধীদলের নেতার মুখ দিয়ে অপ্রিয় ভাষণের উত্তপ্ত তিক্ত বাক্যস্রোত বহির্গত হলে সাহিত্যের অনেক আগাছা জঞ্জাল সাফ হয়ে

যায়। মোহিতলাল ছিলেন সেই বিরোধী দলের নেতা—তাঁর লেখনী-কুঠারের আঘাতে সাহিত্যের অনেক আগাছা পরিষ্কার হয়েছে। তৎকালীন 'কল্লোলযুগ'-এর লেখকদের যৌবনের নামে উচ্ছৃঙ্খল রিরংসার মনোবৃত্তিকে তিনি 'শনিবারের চিঠি' মারফৎ রোধ করেছেন। একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে যে 'কল্লোলে'র লেখকরা যৌবনের সাময়িক উত্তেজনায় মত্ত হয়ে সেদিন বিপথে চলছিলেন তখন যদি মোহিতলালের ক্ষুরধার প্রবন্ধ, সজনীকান্তের হাড় জ্বালানো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না বর্ষিত হত, তাহলে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ যাঁরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এ চেহারায় তাঁদের দেখতাম না, দেখতাম ফুটপাথ কিংবা বটতলার সস্তা যৌন গ্রন্থে মুখ লুকিয়ে বসে আছেন তাঁরা। এদিক দিয়ে বিচার করলে মোহিতলালের কৃতকর্মের মহত্ত্বকে নির্দ্বিধায় অভিনন্দন জানানো চলে।

পরিশেষে বক্তব্য, তাঁর প্রবন্ধে নিজস্ব বীক্ষণে যে সত্যকে তিনি অবলোকন করেছেন তাতে তাঁর চিন্তাশীলতা, মৌলিকতা ও বিশেষত্ব রয়েছে; ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের দৃষ্টিতে থাকলেও উপলব্ধ-সত্যের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার গুণে রচনা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে এবং সর্বোপরি রয়েছে স্বাজাত্য-বোধের এমন একটি মহত্ত্ব যা সমস্ত দোষ-ত্রুটি ছাপিয়ে দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগ ও অবিচল আস্থা প্রকাশ করেছে। এই আন্তরিক অনুরাগের মধ্য থেকেই তাঁর প্রবন্ধের জন্ম এবং এই অনুরাগই তার আজীবন সাহিত্য সাধনার সবশেষ ফল॥

ক্রান্তদর্শী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই, জন্মি কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙালী কবি আর জন্মিতে পারে না।" আজকের বাঙলার অবস্থা দেখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মোহিতলালের জীবনে সত্য হয়েছে বলে মনে হয়। বাঙলা দেশ যে আবার এক সঙ্কটের সম্মুখীন তা আজ সকলেরই জানা আছে কেননা আজকের বাঙলায় আমরা প্রত্যেকেই তার ভুক্তভোগী 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা' বলে বহু বিঘোষিত সোনার বাঙলা আজ হানাহানি বঞ্চনার অভিশাপে অবনতির চরম বিন্দুতে উপনীত। বাঙালীর জীবন-সমুদ্রের ওপর দিয়ে আজ যে মন্থন চলছে সেই মন্থনের মধ্যে আমাদের জীবন সর্বমহিমাচ্যুত। মধ্যবিত্ত সমাজ আজ হৃতসর্বস্ব অশন ও প্রবাসন ভিক্ষায় পথে পথে ভ্রাম্যমান। বঙ্গবিভাগের ফলে ভাঙন শুধু বাঙলাদেশের মাটি ও মানুষকে আঘাত করলে না, আঘাত করলো তার ভাষাকেও। ভাষাকে কেন্দ্র করে ঘরে ও বাইরে যে হীন ষড়যন্ত্র চলেছে তাতে মনে হয় বাঙালী জাতির অস্তিত্বই যেন অনেকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে এইভাবে ভাষাবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিবিলুপ্তির একাধিক উদাহরণ পাওয়া যাবে। তাই এ অবস্থায় একজন খাঁটি বাঙালার আবির্ভাব ঘটবে—ঋষির কথা তো তাই মিথ্যে হতে পারে না। মোহিতলাল বিংশ শতাব্দীর কোলে সেই বঙ্কিম আরাধ্যা বঙ্গজননীর যেন বিদায়কালে প্রীতি-উপহার।

মোহিতলালের পক্ষে ঈশ্বর গুপ্তের মতো বাঙলার খাঁটি কবি হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ মোহিতলালের প্রজ্ঞা ও ঋদ্ধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা প্লাবিত আর ঈশ্বরগুপ্তের বিদ্যাবুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত। কাজেই তাঁর পক্ষে বাঙলার পৌষ-পার্বণ, তপসে মাছ, আনারস, বাঙালীর সুখদুঃখের গৃহস্থালীর ওপর সাদামাঠা ভাষায় ও হালকাভাব নিয়ে কবিতা লেখা সহজসাধ্য ছিল আর সে-কবিতার পাঠক অল্পশিক্ষিত হলেই চলে যেত। কিন্তু আজ আর তা হবার উপায় নেই—জীবনের রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্তন যেমন হয়েছে তেমনি বাঙালীর মননক্ষেত্রও যে আজ নানা-

দেশের চিন্তায় কর্ষিত। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা আজ প্রয়োজনানুসারে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মোহিতলাল বাঙলার প্রাণধর্মকে কাব্যে উপস্থাপিত করার সময়েই তাঁর নিজেরই অজান্তে তাঁর প্রজ্ঞার চিহ্ন স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। তাই তাঁর কবিতা শিক্ষিত বাঙালীর মনের খোরাক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-আলোচনায় যে মাপ-কাঠি প্রয়োগ করেছিলেন তার নিরিখে মোহিতলালের কবিতা হয়তো খাঁটি বাঙালী কবিতা নয় কেননা তাতে বাঙলার নিজস্ব প্রাণধর্মের সম্বন্ধ বেশী নেই। খাঁটি বাঙালী কবি না হলেও তিনি যে আজকের বাঙালায় একজন খাঁটি দরদী বাঙালী একথা অনস্বীকার্য। তিনি বাঙলাদেশকে নিজের জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন, ইষ্টদেবীর ন্যায় ভক্তি করতেন, প্রণয়িনীর ন্যায় ভালোবাসতেন। বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সবই ছিল মোহিতলালের অনুধ্যানের বস্তু, দিবারাত্রির জপমালা। তাই তিনি বাঙলার ভাব-গঙ্গাকে প্রবন্ধে-নিবন্ধে, সংকলনে-সম্পাদনে সকলের শীর্ষে তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাঙালী মোহিতলালের পরিপূর্ণ মুক্তি। তিনি বলেছেন, “আমি যতটুকু বাঙালী ততটুকু সাহিত্যিক ; আজ সেই বাঙালী জাতটাই আমার চোখের সামনে মরে গেল—বাংলা-সাহিত্যে আমার কি কাজ! · নিজের দেশ—জাতির বাস-ভূমি ও স্বজাতি-সমাজের প্রতি যে নিগূঢ় প্রেম ধার্মিকমাত্রেরই থাকে, এবং যে-প্রেম না থাকলে কেউ সত্যিকার বড় সাহিত্যরচনা করতে পারে না—যে-প্রেম না থাকলে দেশোদ্ধারের পুণ্য উন্মাদনাও রাজনীতির মিথ্যাচার ও পক্ষ-বিপক্ষের রেষারেষিতে পরিণত হয়, শেষে দেশ-জাতি-সমাজের নামে আত্মসুখ সাধনাই ধর্ম হয়ে ওঠে।” (এপারের কথা: কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৫৭)। পূর্বে জীবনকে প্রকাশ করবার জন্যে আজকের ‘পঙ্ককুণ্ড’ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে আত্মতৃপ্তির বিলাসিতার জন্যে কবিতা লিখেছিলেন, বিশুদ্ধ শিল্পের বিশুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু যখন ‘বাঙলার নাভিশ্বাস উঠেছে তার সর্বাঙ্গে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে’, তখন তিনি আর স্থির হয়ে থাকতে পারেন নি, তাঁকে নেমে আসতে হল দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার জন্যে। তাঁর মত বিশুদ্ধ সাহিত্যিকের পক্ষে জনতার কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মেলানো সম্ভব ছিল না। ‘আইভরি টাওয়ার’ থেকে যে-কয় ধাপ তিনি নেমে এসে বাঙালীর সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন

এবং সে বিশ্লেষণে মতামতের প্রশ্ন অনুক্ত রেখেই বলছি যে, তিনি এজন্যে আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। বাঙলার গৌরবে তিনি যেমন গৌরবান্বিত—বাঙলার লাঞ্ছনা, বেদনা, দৈন্য, দুঃখে তিনি তেমনি ব্যথিত। এ ব্যথা তাঁর আন্তরিক মর্মঘন। বাঙলাদেশের দুঃখদুর্দশা তাঁকে এত পীড়িত করে তুলেছিল যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও সে-কথা তাঁর মনে উদিত হয়ে তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছে—"আমার ঘরের নীচে, মাঠের পর মাঠ—কচিধানের পাতায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে—জানালা খুলিলেই, পশ্চিম আকাশ-প্রান্তের নীল নারিকেলশ্রেণী পর্যন্ত, সেই ক্রোশ ব্যাপী হরিৎ-শোভা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া তখনি প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, জানালা বন্ধ করিয়া দিই। ওই হরিতের মধ্যে অন্নপূর্ণার সে সুধা-হাস্য আর নাই, ওই সতেজ সরস তৃণরাশির অঙ্গে ধনলুব্ধ পিশাচের লালসা-বহ্নি এখন হইতেই জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—উপবাসকাতর বঞ্চিত বুভুক্ষার দীর্ঘশ্বাস উহাকে আন্দোলিত করিতেছে! তাই ওই শোভা এত ভয়ঙ্করী।' (শারদীয়া: বাংলা ও বাঙালী)। সত্যিসত্যিই কাব্যের জানালা বন্ধ করে দিয়ে বাঙলার শবাসনে বসে বাঙালী ঐতিহ্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সাহিত্যের কোষ্ঠিবিচার করতে বসেছেন। তাই বঙ্কিমের খাঁটি বাঙালী কবির বিচার প্রসঙ্গীয় মানদণ্ডে কবি মোহিতলাল, সমালোচক মোহিতলাল যেখানে পৌঁছতে পারেন নি, বাঙালী মোহিতলাল অবাধে সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বাজাত্যবোধের আদি গুরু—তাঁর সাহিত্য-সাধনার মূল-ভাবকেন্দ্রটি জাগ্রত স্বদেশপ্রীতি। দেশ বলতে তিনি বুঝতেন সপ্ত কোটি কণ্ঠ বাঙলা দেশকে, ভারতকে নয়—'বন্দে মাতরম্' গানটিই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাই তিনি ছিলেন একান্তভাবে বঙ্গ-সন্তান। তাঁর রচনায় ভারতীয় আদর্শ ভারতীয় সাধনার কথা তেমন নেই, যত বেশী আছে বাঙলার গৌরব ও গ্লানি, বাঙলার আনন্দ ও বেদনা, বাঙলার আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। মোটকথা বাঙলার দৃষ্টিই ছিল তাঁর দৃষ্টি। বাঙলাদেশের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি ফেরানোই ছিল তাঁর ব্রত। মোহিতলাল ছিলেন এই বঙ্কিমচন্দ্রের মানসসন্তান। তাই তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রতিভায় সমুজ্জ্বল গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন দেশভক্ত এক বিরাট পুরুষমূর্তির রূপ প্রত্যক্ষ

করি। তাঁর দেশপ্রেম সাহিত্যের কেবল অহেতুক উচ্ছ্বাস নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতই হৃদয়ের অকপট অভিব্যক্তি 'জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী'। তিনি বলেছেন, "একালে সকল সাহিত্য-চর্চার মূলে থাকিবে জাতির জীবনরক্ষার ভাবনা—মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের আরাধনা।" (জাতির জীবন ও সাহিত্য : বিবিধকথা)। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সাহিত্যিক-সমাজ এ মন্ত্রে আজও উদ্বোধিত হন নি। তাছাড়া আজকাল আমাদের দেশের অনেক কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যিক দেশের পরিস্থিতি থেকে সাত পা পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। সাহিত্যের সেবা তাঁরা করেন, দেশকে ভালও বাসেন কিন্তু দেশের উন্নতি ও অবনতির প্রতি তেমন উৎসাহী নন। কেমন যেন একটা উদাসীনতার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়ে চলেন। মোহিতলাল ছিলেন এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম—তিনি সত্যসুন্দরের পূজারী হয়েও রাজনীতিকে সাহিত্য-সেবার অঙ্গীভূত করে ফেলেছিলেন একজন। বঙ্কিমের মত তিনও বাংলা সাহিত্য ও বাঙলা দেশকে একাত্মা করেই দেখেছিলেন। তাঁর রাজনীতি একদেশদর্শী হতে পারে কিংবা egoistic view প্রচারও করতে পারে কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধকে সন্দেহ করা চলে না। বাঙলার নিজস্ব রাজনীতি, যে-রাজনীতি ও মনীষার বলে বাঙালী একদিন সমগ্র ভারতে নেতৃত্ব করেছিল—সেই নীতির মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন মোহিতলাল। যে উনবিংশ শতাব্দী বাঙলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ সেই যুগের আলোতে মোহিতলাল চোখ মেলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার চিত্তবিকাশ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের মধ্যাহ্ন-দিবালোকে, আমি জন্মিয়াছিলাম বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগরের যুগে। তেমন যুগ যে-কোন জাতির ইতিহাসে একটা গৌরবময় যুগ, সে যুগে জ্ঞান কর্ম ও প্রেমের মানুষী-সাধনার জন্য বাঙলাদেশে যেন দেবকুল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' (জাতির জীবন ও সাহিত্য : বিবিধকথা)। উনবিংশ শতকের এই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আজ হাওয়া-বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সেদিনকার প্রাণধর্মের বহু অদলবদল হয়েছে কিন্তু মোহিতলাল তাঁর মতবাদে এমনই একজন নৈষ্ঠিক সাধক ছিলেন যে যুগের তাগিদে সে পরিবর্তনকে সহজচিত্তে মেনে নিতে পারেন নি বলেই তাঁর মতবাদের ব্যাখ্যা আজকের যুগ-প্রয়োজনে প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্লেষণ বলে অনেকের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা হোক, মোহিতলালের শিল্পজীবনের কৃতিত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি।

তাঁর কৃতিত্ব নিহিত রয়েছে ওইখানে, যেখানে বাঙালীর জীবন-মরণ সমস্যাকে সাহিত্যের ওপর স্থান দিয়েছেন, দেশের চিন্তা তাঁর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, অন্যান্যদের মতো তিনি দেশকে দূর থেকে সেলাম জানান নি, সমস্যার মধ্যে নিজে দাঁড়িয়ে জাতির বেদনা অনুভব করেছেন। তিনি 'বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থের 'নিবেদনে' প্রশ্ন তুলেছেন, "সাহিত্যের ভাবরাজ্য ছাড়িয়া আমি যে এতকাল পরে এই বয়সে, ভগ্ন দেহে ও অবসন্ন মনে, এই ধরনের পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি, তার কারণ, সাহিত্যের দ্বারা জাতি বা সমাজের কোন সেবাই হইতে পারে না—যদি সেই জাতি স্বধর্মভ্রষ্ট হয়, তাহার আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয়। একালে বাঙালীর দেহজীবন ও মনোজীবন দুই-ই অতিশয় শক্তিহীন হইয়াছে, তাই সুপথ্যও যেমন অরুচিকর, কুপথ্য তেমনি রুচিকর হইয়াছে। ইহার উপর, পরানুচিকীর্ষা এ জাতির একটা রক্তগত ব্যাধি বলিলেও হয়, এক্ষণে ঐ দুর্বলতার কারণে তাহাও বৃদ্ধি পাইয়াছে; আবার রাজনীতি নামক এক সংক্রামক অধর্ম-নীতির মোহে সে যেন আত্মহত্যা করিতেই বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় সাহিত্যের উচ্চচিন্তা আগে, না ঐ মৃত্যু-নিবারণের চিন্তা আগে?' তাই তিনি প্রগতিপন্থী শিল্পী, কেননা তিনি বাঙলার সমস্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও আজকের বাঙলার সঙ্কটাবর্তে দিকভ্রষ্ট হযে মনের আসল বন্দর তিনি খুঁজে পান নি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন, প্রলাপ বকেছেন, বর্তমানের বীভৎসতায় জর্জরিত হয়ে নিজের একটা কাল্পনিক জগৎ (উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে) সৃষ্টি করে সেখানে আশ্রয় নিয়ে বর্তমানের প্রতি বক্রোক্তি ও শ্লেষোক্তি করেছেন। কিন্তু যাঁরা আজকের দুরবস্থা নিয়ে মাথা ঘামান না অথচ টেবিল টক্ হিসেবে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুক করেন, বাঙালীর সমস্যা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন সেই 'ভুড়ও খাব টামাকও খাব' গদাধরের দলকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। আবার যাঁরা আগুনের আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে নানাপ্রকার অশোভন উক্তি করে সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন কিংবা বাঙালী জাতির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত বাঙলা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে রুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর, ভাষার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করে যাঁরা তাকে হিন্দীর ছাঁচে ঢালাই করতে চান তাঁদেরকেই জাতীয় শত্রু মনে করে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন—

"বাঙালী যে মরিতে বসিয়াছে বা মরিয়াই গিয়াছে, এমন কথা বলিলে

যাহারা অতিশয় উচ্চভাব ধারণ করিয়া আমার অজ্ঞতা, বুদ্ধির বৈকল্য, অথবা নষ্ট-স্বভাবের নিন্দা করে কিম্বা উহাকে একটা সৌখীন নৈরাশ্যবাদ বলিয়া ধিক্কার দেয়, তাহাদের কথার জবাব দেওয়া নিষ্ফল বলিয়াই আমি সম্পূর্ণ নীরব থাকি, আমি তাহাদিগকে চিনি—তাহারা বাঙালী-জাতির কেহ নয়, তাহারা মিথ্যাবাদী ও দুরাত্মা। আমি বাধ্য হইয়াই এখানে তাহাদের কিছু পরিচয় দিব। যাহারা সাহিত্যিক তাহারা যে কেমন চিন্তাশীল, কেমন ভাবুক ও প্রতিভাবান এবং কেমন পণ্ডিত তাহা জানি, যদি হয়ও, তাহাতেই বা কি ?—তাহারা কেমন জীবন যাপন করে? তাহারা কেমন স্বাধীন-চেতা, কেমন নির্লোভ, কেমন নীচসংসর্গ-ত্যাগী ? ইহারা এতই ক্ষুদ্রচেতা যে, লজ্জা বা আত্মধিক্কার তো দূরের কথা অধিকাংশই তাহাদের সেই ঘৃণ্য অবস্থার গৌরব করিতে না পারিলে একদণ্ড স্বস্তিবোধ করে না, বিশেষতঃ ঐ সভ্যতাভিমানী নাগরিকেরা নিজেদের পঙ্কশয্যাকেই বিলাস শয্যা করিয়া—অতিশয় ধর্মহীন ও সত্যহীন জীবন যাপন করিয়াও চীৎকার করিবে—'সব ঠিক আছে।'—বাঙালীর—অর্থাৎ তাহাদের ঐ গোষ্ঠীর—গৌবব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই! আবার, যাহারা পশ্চিমা বণিকরাজের চরণামৃত পানে চরিতার্থ হইয়াছে, সেই শ্মশান কুক্কুরদের আনন্দ-কোলাহল এখনই নিবৃত্ত হইবে না। বাংলাব বড় বড় পত্রিকাধিকারিগণ—সেই বণিকরাজ্যের রাজশ্যালক যাহারা, এবং যাহারা ব বসায়ের দ্বারা, অর্থাৎ পয়সা লইয়া জনগণেব চেতনা হরণ করে—তাহারাও স্বাধীন ভারতে বাঙালীব এই চরম দুর্গতির কথা ঘুণাক্ষরে বলিতে দিবে না। এত সুখসমৃদ্ধিশালী নাগরিকেরা মনে করে তাহারা বাঁচিলেই বাঙালী বাঁচিল, ত হাদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, তাহাতেই বাঙালী-জাতি ধন্য হইয়াছে। ইহারা কিছুতেই মৃত্যুর কথা বলিতে দিবে না। এ যেন—জাতির মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে পাছে অশৌচ পালন করিতে হয়, এবং একটা বড় উৎসব ফস্‌কাইয়া যায়, তাই সে সংবাদ যে দিবে তাহার মত শত্রু আর নাই। তাই ঐ মৃত্যুকে অস্বীকার করিতে হইবে,—মানুষ যখন খাবি খাইতেছে, তখনও বলিতে হইবে, তাহার অঙ্গে পুলক-শিহরণ হইতেছে!—নহিলে স্বাধীনতার টেবিলে বসিয়া চোরাই-খানা খাইতে বড়ই অসুবিধা হয়। অতএব, ইহাদের কথার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাহারা স্বার্থের সম-বন্ধনে একটা বৃহৎ দল গড়িয়া পশ্চিমা বণিকের সহিত চুক্তি করিয়া দেশের যাবতীয় পত্রিকার সাহায্যে মৃতকে জীবিত বলিয়া ঘোষণা করিবেই, তাহাদের সেই প্রোপাগাণ্ডা

রোধ করা যাইবে না; কিন্তু ঐরূপ প্রচার-শক্তি যাহাদের নাই সেই রুদ্ধকণ্ঠ কোটি বাঙালী মর্মে মর্মে বুঝিতেছে, কোন্ কথা সত্য।

"আবার এমনও আছে, যাহারা বাঙালীর ঐ মৃত্যুর কথা স্বীকার করে কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নয়, বরং তাহাতেই তাহাদের ঐ ভারতের প্রতি ভক্তি আরও বাড়িয়া যায়! একদা ঐ সম্প্রদায়ের এক মহাবীর বাঙালী আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ না থাকিলেও তেমন কথা আমি পূর্বে কাহারও মুখে শুনি নাই। বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না এইজন্য যে, তিনি নিদারুণ গান্ধী-ভক্ত—অতএব হিন্দুস্থানীর প্রেমে দেওয়ানা হওয়া তাঁহার কর্তব্য। তার উপর, তিনি একজন লেখনী-লম্পট সাহিত্যিক, নামে ও বি-নামে সাহিত্যের সবরকম মুখভঙ্গি করিতে ওস্তাদ, -এমন নির্ভীক কর্তাভজাও দুর্লভ। একালে এহেন মহাপুরুষের মুখে কোন কথাই বাধে না, বরং আকার মত ছোট হয়, আওয়াজ ততই বড় হইয়া থাকে। একদিন সেই 'বিশ্বকর্মা' পুরুষটি আমার কথার প্রতিবাদে সহসা সত্যাগ্রহদীপ্ত লোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—এদেশ ও এই জাতি এমনই জঘন্য যে মানুষটাব তো কথাই নাই এদেশের মাটি পর্যন্ত তুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে এবং বিহারের মাটি দ্বারা পুনরায় ভরাট করিয়া লইতে পারিলে, তবে এদেশ মানুষের বাসযোগ্য হইতে পারিবে।' বিহার-ভুক্ত বাংলায় বাঙালীদের উপরে বিহারীরা যে উৎপীড়ন করিতেছে তাহার সমর্থন করিয়া এই ধর্মপুত্রটি বাঙালীর বিরুদ্ধে বহু কটূক্তি করিয়াছে। যতই অধঃপতিত হোক পৃথিবীতে আর কোথাও কোন জাতির মধ্যে এমন স্বজাতি-বিদ্বেষী কুলাঙ্গারের স্থান হয় না, অতএব, যে জাতির কুলীন-সমাজে এতবড় পাপাত্মা দম্ভভরে বিচরণ করিতে পারে, সে জাতি কি বাঁচিয়া আছে?" (নিবেদন: বাংলা ও বাঙালী)।

—উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। দীর্ঘ হয়ে গিয়ে একটা সুবিধেই হল যে স্বজাতিবৎসল ও স্বধর্মপ্রাণ বাঙালী মোহিতলালের পরিচয় পাঠকরা অনায়াসে বুঝতে পারলেন যা টীকা দিয়ে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না এবং আরও পরিষ্কার হল যে নিজস্ব মতবাদ জাহিরে মোহিতলাল কিরূপ স্পষ্টবাক্ ছিলেন।

দেশকে এতখানি ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই বাঙলার কল্যাণ, বাঙলার ধর্ম, বাঙলার বাঁচবার পথ নির্ধারণ করার কথা তাঁর হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক ছিল। তাই তিনি বাঙলার ঐতিহ্য উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন, সমাজ জীবন ও তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালী যাতে মানুষ হতে পারে,

মানুষ হয়ে আবার বাঙলার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করতে পারে, এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত ও সাধনার লক্ষ্য। বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি ও ব্যর্থ অনুকরণপ্রিয়তা তাঁর হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেলের মত বিদ্ধ হত বলেই তিনি ভাষার রূঢ় আঘাতে তাদের জাগ্রত করতে চেয়েছেন, যদি কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়। বাঙলার বৈশিষ্ট্য বলতে তিনি বুঝতেন, বাঙলার অনুশীলিত বুদ্ধির প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। 'বাংলার নবযুগ' ও 'বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে বাঙালার অতীত গৌরবের অধ্যায়টির সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন এই আশাতে বাঙালী যদি নিজেকে চিনতে পারে। 'বাংলার নবযুগ' এর 'শেষ কথা'তেও এই কথাই বলেছেন—

"এই দীর্ঘ ও দুরূহ চিন্তাকার্যে আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল—বাঙালীর আত্মপরিচয় সাধন। এই একাকার অন্ধকারে আমি যদি সেই চেতনা এতটুকুও উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারি, তবে আমার এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব, আমার সাহিত্যিক জীবনও ধন্য হইবে। আজিকার এই অতি উদার কালচার বাদ ও বিশ্ব-মানবীয় ভাববিলাসের দিনে, আমি যে আমার স্বজাতির ভাবনাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়াছি, এবং তাহার গৌরব-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইয়াছি, সেজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই ...বাঙালীকেও যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহাকে বাঙালী হইয়াই বাঁচিতে হইবে, 'অখণ্ড ভারত' নামে মাটির উপরে, মানচিত্রে কোন দেশ নাই, তথাপি ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া পুনঃসৃষ্টি করিবার শক্তি বাঙালীর আছে,...এমন কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার—সেই অখণ্ড ভারতকে উদ্ধার করিবার প্রতিভাশক্তি বাঙালীরই আছে; বাঙালী ঘুমাইলে সেই ভারতের সকলেই ঘুমাইবে।"

'বাংলা ও বাঙালী' বইতেও উদ্দীপ্তকণ্ঠে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুরে তিনি বলেছেন—

"আমার উদ্দেশ্য—আজিকার এই মোহান্ধকারে আত্মনিন্দা ও পর-পদাঘাত সহনপটুতার প্রেতবৎ অবস্থায় সে একবারও তাহার বাঙালীত্বের মর্যাদা স্মরণ ও মনন করুক। যাহা গিয়াছে—যাক্, যাহা হইবার—তাহা হউক! তবু একবার এই অন্তিমকালে সে যেন তাহার আত্মাকে দেখিতে পায়। সে কি ছিল কি হইয়াছে—সেই জ্ঞানের গঙ্গাজল-গণ্ডুষ পান করিয়া

সে যেন পাপমুক্ত হয়।" (নিবেদন)।

—দেশের ঐতিহ্যের পরিপেক্ষিতে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের আলোচনা এরকমভাবে পূর্বে বাঙলা দেশে হয়েছে কি না আমার জানা নেই। স্টাইল এবং পদ্ধতিটা অবশ্য বঙ্কিমী, কেননা বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বাঙলার দুরবস্থার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্কিমের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করে বলেছেন, "বঙ্কিমের প্রভাব যে পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা এই ভীষণ যুগ-সঙ্কটে সকল দিকেই দিগভ্রান্ত হইতেছি।" এর কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—সূক্ষ্ম মনোবিলাসের বা কালচারের আয়োজন প্রচুর করিয়া তোলেন নাই; তিনি এই জাতির বক্ষে বল ও প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন; ভাব ও চিন্তার প্রচণ্ড শক্তি বলে তাহার জীবনের জীর্ণ ভিত্তি সংস্কার করিয়া নূতন সৌধের পত্তন করিয়াছিলেন।" (বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট: বঙ্কিম-বরণ)। এযুগে মোহিতলাল আরেকজন মনীষার ওপর নির্ভর করেছেন তিনি হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র—তিনি এঁর মধ্যে তাঁর অভীষ্ট ব্যক্তিরূপ দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি কখনও রাজনীতির চর্চা করি নাই।...আমার দৃষ্টি রাজনীতির দৃষ্টি নয়। তাহা এমন এক নীতি যাহা সকল নীতির উপরে; উহাই মানব-ধর্মনীতি ও শাশ্বত সত্য-নীতি, এবং সে প্রেরণা আমি লাভ করিয়াছি সেই এক পুরুষের অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়া।... দেশ ও জাতির নিপীড়িত আত্মার যতসব আর্তি—তাহার মৃত্যুর কারণ ও পুনর্জ্জীবনের আশা— আমি সেই পুরুষের আত্মাহুতির যজ্ঞানলশিখায় পাঠ করিয়াছিলাম।" (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা: জয়তু নেতাজী)। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এঁর কর্মবহুল জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন। গান্ধীবাদ ভারতের ঐতিহ্যকে কেমন নির্জীব করে দিয়েছে, সুভাষচন্দ্র সেই ঐতিহ্যের প্রাণচঞ্চল পুরুষ ছিলেন, তাঁর মধ্যেই সকল বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটেছিল—'জয়তু নেতাজী' বইয়ের মূলকথা হল এই। মোহিতলাল বলেছেন, "ভারতের ঐতিহ্য ও মানবইতিহাসের অন্যতম ধারা—এই দুইয়ের যদি কোথাও সমন্বয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভারতের সেই 'সনাতন' যদি কোথাও যুগোচিত মূর্তিধারণ করিয়া থাকে তবে তাহা ঐ একটি পুরুষের জীবনে—তাহার জ্ঞানে, তাহার প্রেমে ও তাহার কর্মে। কারণ, সুভাষচন্দ্র শুধুই আজাদ-হিন্দ-

ফৌজের নেতাজী নহেন—সমগ্র ভারতের প্রাণ-গঙ্গার গঙ্গাধর।" তাই নেতাজীর কর্মময় জীবনকে তিনি মহাকাব্যের উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "হোমারের 'ইলিয়াড', বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও ব্যাসের 'জয়'-মহাকাব্য পাঠ করার পর যদি আর একখানি মহাকাব্য তেমনই পাঠ্য হইতে পারে, তবে তাহা এই নেতাজী-চরিত। অথচ ইহা কাব্য নহে—ইতিহাস। আমার বিশ্বাস, জগৎসাহিত্যে এমন মহাকাব্য আর মিলিবে না। ভারত যদি আবার বাঁচিয়া উঠে তবে রামায়ণ-মহাভারতের মতই এই মহা-কাহিনী, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কৃষকের পর্ণকুটির হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র ঘরে ঘরে পঠিত হইবে; কত গান, কত গাথা, কত কাব্য, কত নাটক এবং কত রকমের শিল্প-কলায় এই অমৃত-নিস্যন্দী রসধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে।"—দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তিন

দেশ-বিভাগের বিষময় ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে দুর্দশাটা দাঁড়াল—এই নিয়ে তাঁর মতটা কেমন ছিল এবং বাঙালীর ওপর বিহারী-অসমীয়ার অত্যাচার এবং তার ফলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসিভাব তাঁকে কতদূর ব্যথিত করেছে এবার তারই নিদর্শন হিসেবে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি—

"ঐ ম্যাপখানির দিকে চাহিয়া দেখ, উহাই স্বাধীন বাংলা—বাঙালীর স্বদেশ। এতদিন যে-ভূমির নাম ছিল বঙ্গদেশ, যে দেশের সাত কোটিকে লইয়া তোমার গর্বের অবধি ছিল না, যে-দেশের চতুঃসীমা প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার চারণ-কবিগণ বর্ণনার ভাষা পাইত না—সেই 'বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমলা' আরও কত কি!—এখন সেই দেশের ঐ একটি ক্ষুদ্র টুকরার দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারো? সহস্র বৎসর বাঙালী যাহাকে আপন বলিয়া জানিত, আজ এতদিন পরে সে ভূমি আর তাহার নহে! বাঙালী-মুসলমানেরও নহে, সেও সেখানে দাসত্ব করিবে—ডবল-দাসত্ব।

"ভূমির ভাগ ত' চোখে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু উহার অন্তরালে যে আর একটি ভাগ রহিয়াছে তাহা যেমন গূঢ়, তেমনই আরও ভীতিজনক। ঐ যে সীমানা-নির্দেশ উহার অন্য অভিপ্রায় আছে, বোধ হয় সেই অভিপ্রায়টাই গুরুতর। পূর্বভাগের ঐ বিপুল বিস্তারের দ্বারা বাঙালী হিন্দু-সমাজের একটা

বৃহৎ অংশকে বেড়াজালে বেষ্টন করিয়া লওয়া হইয়াছে, ঐ যে বাংলা-ভাগ—উহাতে হিন্দুসমাজের হস্ত পদ উদর ও বক্ষ কাটিয়া লইয়া কেবল মুণ্ডটি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—যে-মুণ্ডের মস্তিষ্কে এযুগে বাঙালীর পাপবুদ্ধি ঘনীভূত হইয়া আছে।

"ভগবান মানুষকে যে সহজ-বুদ্ধি দিয়াছেন, এবং মৃত্যু-সঙ্কটে পড়িলে ইতর জীবেরও যে চৈতন্য সজাগ হইয়া উঠে, আমরা তাহার বেশি দাবী করিতেছি না; প্রকৃতির নিয়মকে আমরা ভগবানের নিয়ম বলিয়াই মানি, সেই নিয়ম না মানিবার মত স্পর্ধা আমাদের নাই। এবং সর্বোপরি আমরা বাঁচিতে চাই, আত্মহত্যাকে একটা বড় নাম দিয়া, পরের সুবিধার জন্য নিজেরা সবংশে নিপাত হইতে চাহি না। যখন সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইতেছি, আর সকলেই যেমন করিয়া হোক শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া যাইবে, মরিবে কেবল বাঙালীই, তখন গোটা ভারতবর্ষের হিতার্থে আমরা এমন করিয়া মরিতে প্রস্তুত নহি। স্তোকবাক্য ক্রমেই বাড়িতেছে—কেন তাহা জানি। বাঙালীর কানে একটা কথাই বারবার ধ্বনিত করা হইতেছে, যে, এমন আত্মত্যাগ বাঙালীই করিতে পারে, বাঙালী আবার সারা ভারতের গুরু হইবে। ত্যাগের দৃষ্টান্ত সে-ই দেখাইবে বটে, কিন্তু অপরাপর ভারতবাসী তাহার অনুসরণ করিবে কেন? তাহাদের তো প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে তো এমন বাউণ্ডারীর শমনজারী সহিতে হয় নাই। তাহারা কি দুঃখে বাঙালীর মত নিজের চিতা নিজে সাজাইবে?

"ভারতরাষ্ট্রের হিতার্থে বাঙালীকে বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ বাঘের মুখে ছাড়িয়া দিতে হইল গেল, বাঙালীরই গেল! তবু বাঙালী ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ভারতরাষ্ট্রের কোলে বসিয়া বাঙালীকে যৎপরোনাস্তি পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিল, অপর প্রদেশগুলার সন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের ছিটেফোঁটাও বাংলার সহিত যুক্ত হইতে দেওয়া হইল না—তাহা দেখিয়াও বাঙালী ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। 'পূর্বাচল' নাম দিয়া বাঙালী একটা প্রদেশ গড়িয়া লইবার অতিশয় ন্যায্য দাবী করিল, ভারতরাষ্ট্র, কেবল প্রভুত্বের অধিকারে, সকল যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেই দাবী না-মঞ্জুর করিল—তবু বাঙালী ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। 'বন্দে মাতরম্' ও বাংলা ভাষা—বাঙালীর এই দুইটি অমূল্য দান ভারতরাষ্ট্র দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করিল—এতবড় অবিচার ও অপমান সহ্য করিয়াও বাঙালী

ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল। ভারত-সরকারের উচ্চতম পদগুলি হইতে (ব্রিটিশ কর্তৃক পূর্বনিযুক্ত কতকগুলি ছাড়া) বাঙালীকে বহিষ্কৃত করিবার নীতি অবলম্বিত হইয়াছে দেখিয়াও বাঙালী ভারতরাষ্ট্রের জয়ধ্বনি করিল.. কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে; ব্যবসায়-বাণিজ্যে হিন্দুস্থানীর একচেটিয়া অধিকার দৃঢ়তর করিবার ও তাহাদিগকে সর্ববিধ সুযোগদানের পক্ষপাতী দেখিয়াও বাঙালী ঐ ভারতরাষ্ট্রেরই জয়ধ্বনি করিল। ওগো দয়াময়গণ! এত করিয়াও কি বাঙালী একটু দয়া পাইবে না! জানি, ব্রিটিশ-মিত্রের বিরুদ্ধে বাঙালীই সর্বপ্রথম জাতীয়তা মন্ত্রের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল—বাঙালীর স্বভাব সহিংস সংগ্রাম করিয়া সব মজাইতে বসিয়াছিল কিন্তু সে পাপের শাস্তি কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়? তাই বাঙালীকে শেষে ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়া আন্দামানে বাস করিতে হইবে?

"বাংলার পূর্বভাগে বাঙালী-জাতির একটা বড় অংশ শীঘ্রই 'পাক' হইয়া যাইবে, বিহার খানিকটা হজম করিবে, আসামও কিছু সদ্গতি করিবে। গোদ পশ্চিমভাগটাতে যত অনাবাদী পতিত জমি আছে, সেগুলি পরে হিন্দুস্থানী ধনিকদের কবলে যাইবে, কত রকমের কারখানা স্থাপিত হইবে। তাই বাস্তুহারা বাঙালীকে সেখানে বসতি করিতে না দিয়া (অজুহাতের অভাব নাই) আন্দামানে চালান করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার পরেও যে বাঙালীগুলা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারা হয় বলদের ল্যাজ মলিবে, নয় কারখানার কুলি হইবে। হিন্দুস্থানী বণিকের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া, অথবা হিন্দুস্থানী রাজপুরুষের সেবা করিয়া, যে কয়জন ভুঁড়িতে হাত বুলাইবে, তাহাদিগকে বাঙালী বলিয়া চিনিতেই পারা যাইবে না। ইহাই হইল বাঙালী-সমস্যার সমাধান।

"হিন্দী হইবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা, অর্থাৎ রাজভাষা, অর্থাৎ পিতৃভাষা। বাংলা ভাষার মারফতে কোন দেবকর্ম অর্থাৎ পিতৃকর্ম অর্থাৎ প্রভুকর্ম করা আর চলিবে না—ঐ ভাষা রাষ্ট্র-সভায় বা রাষ্ট্রিক শাসন বিভাগের উচ্চ-পদ-অধিকারে কোন কাজে লাগিবে না। না লাগুক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যটাকে যদি ঐ নাগরী লিপিতে ছাপানো হয়, তবে ভারতের সকল জাতিই উহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যাইবে, ভৃত্যেরও একটু খাতির মিলিবে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, এবং বাংলার লিপিও হিন্দীর লিপি হইলে, বাঙালীর দাস মনোভাব যে কিরূপ পাকা হইয়া উঠিবে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

"স্বাধীনতা ভালো, এক-রাষ্ট্রও ভালো; কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতই একটা মহাদেশ, ইহাতে বহুজাতি বাস করে, তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে; ভারতবর্ষ এক রাষ্ট্র হইলেও, কখনও একজাতি-রাষ্ট্র নহে। বাঙালীকেও জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় জাতির মত তাহার জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। কংগ্রেস এখন আচরণে যে মূর্তিই ধারণ করুক—এই জাতি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ধর্ম-শপথ করিয়াই সে সারাভারতের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল। আজ যদি সর্বপ্রকারে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য নাশ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে, তবে বাঙালীকে তাহার স্বাতন্ত্র্য নিজেই রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা ও একরাষ্ট্রের কোন মূল্যই তাহার পক্ষে আর নাই, সে ক্রমে একটা দাস-জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ঐ দাসত্ব বা পরাধীনতা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়—'ভাষার স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা'।...এ সঙ্কট যদি আমরা এখনই ঠেকাইতে না পারি, তবে বাঙালীর আর কিছুই থাকিবে না। ইহার মত বিপদ আর কি হইতে পারে? যে বাঙালী—তিনি যত বড় পণ্ডিত, বা যত বড় নেতাই হউন—এই কার্যে সহায়তা করিবেন, তাঁহাকে বাংলা ও বাঙালীর মহাশত্রু বলিয়াই গণ্য করা উচিত।" (বাঙালীর বর্তমান: বাংলা ও বাঙালী)।

—উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। এ কথাগুলো তিনি আজকে বলেন নি, বলেছিলেন ১৩৫৪-এর শেষের দিকে। ইতিমধ্যে আশা করি একথা স্পষ্ট হয়েছে যে মোহিতলালের এসব মতামত নেহাতই ফেল্না নয় আজকের বাঙলায় আমরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি। বিশেষ করে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূমের ওপর বাঙালীর একান্ত ন্যায্য ইতিহাসসম্মত সত্যনির্ভর দাবীকে দাবিয়ে রেখে বাঙালীর ওপর বিহারীর অকথ্য অত্যাচার, অসমীয়াদের অমানুষিক পীড়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা আমাদের যথেষ্ট বিস্মিত করেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস সরকার একদা নিজেই ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের আদর্শকে কার্যকরী রূপদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু আজ সে-প্রতিশ্রুতি পালনে ইতঃস্তত। অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনে গণ-আন্দোলনের জয় হয়েছে কাজেই আত্মরক্ষার গরজেই আজ পশ্চিমবাঙলাকে রাজ্য গঠনের দাবী উচ্চকণ্ঠে জানাতে হবে কিন্তু আমাদের নিজেদের কর্মদোষে বাঙালীর আন্দোলন এখনও সংহত হয়ে ওঠে নি। বাঙালী-প্রধানরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত প্রদেশ-গঠন কমিশনের কাছ থেকে সুবিচারের আশা করেছিলেন—যথাসময়ে পশ্চিমবঙ্গের

দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তার পর বাঙলার মতলববাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বঙ্গ-বিহার একীকরণের প্রস্তাব করে বাঙলাকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিলেন। বাঙালী আন্দোলনের দ্বারা ঘরের শত্রু বিভীষণের চক্রান্তকে বানচাল করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানীর আরামকক্ষে বসে পক্ষপাত-মূলক মনোবৃত্তি উদ্দেশ্যমূলক আচরণের বহু দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করছি। 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' দুর্যোধনের সেদিনের আস্ফালন বিহারী অসমীয়ারা বাঙলার বিরুদ্ধে আজ প্রয়োগ করছে। বাঙলা-সংস্কৃতির ওপর তাদের সদম্ভ পদাঘাত ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন প্রতিদিনকার খবরের কাগজে আমরা পড়ছি। বাঙালীর এই দুর্দিনে যিনি বাঙলার জন্যে ভেবেছিলেন সেই মোহিতলালের রচনাবলীর বিচার এই আলোকে আরেকবার আমাদের দেখে নিতে হবে। সাহিত্য-ও স্বজাতি নিয়ে যথার্থ 'শহীদ যদি কেউ থাকেন সে তিনি। তিনি 'বঙ্গদর্শন' 'বঙ্গভারতী'র সম্পাদনায় ও প্রবন্ধাদির সাহায্যে জাতির দৈন্যের কথা বেদনার কথা, জাতির ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ-সূচনা সম্বলিত বিবিধ প্রবন্ধ লিখে মরণোন্মুখ জাতির সম্মুখে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন সেদিন তাকে আমরা আমলই দিই নি। কিন্তু আজ প্রলয়পয়োধির জল বাড়তে বাড়তে আমাদের নাকের ডগায় এসে ঠেকেছে। প্রলয়ের বন্যা যখন পিছনে তাড়া করে আসছে তখন মোহিতলালের নির্দিষ্ট পথকে ধ্রুবলক্ষ্য করে নাই-বা এগিয়ে গেলাম, অন্ততঃ পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্ধারণে তাঁর রচনাবলী পাঠ করতে দোষ কি?

আজকের অন্ধকার ভেদ করে দেশকে দেখেছিলেন বলেই বাঙলার এ অবস্থায় মনে পড়েছে অতীত গৌরবের সুখ-স্মৃতি, কেননা তাঁর জন্ম হয়েছিল মহাজাগরণের সেই সোনার বাঙলায়। সে-সুখের স্মৃতি আছে যার নিদর্শন বর্তমান নেই—তাই তিনি আজকের শ্মশানভূমির দিকে চেয়ে যে বিলাপোক্তি করেছেন তা তাঁর মত বাঙালীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ছন্নছাড়া বাঙালীর শোচনীয় অবস্থা তাঁর মনে নৈরাশ্যের উদ্রেক করলেও পরাজিত মনোভাব তাঁর চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় নি। রঁলার জাঁ-ক্রিস্তফের মতো তাঁর মনোভাবও হল যেন "I am beaten ; I will fight again." তাই বাঙালী চরিত্রের প্রতি গভীরভাবে আস্থাবান না হলে নদীয়া জেলায় সাহিত্য-সম্মেলনে (৮ই বৈশাখ ১৩৫৮ : ২২শে এপ্রিল ১৯৫১) তিনি কিছুতেই এ কথা বলতে পারতেন না—

"…যদি বাঙালী আর বাঙালী হইয়াই বাঁচিয়া না থাকে তবে ভারতও মরিবে—অন্তত ভারতের আত্মা যে নির্বাণপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অতএব আমি যে বাঙালীর জন্যই কাঁদি তাহাতে ভারতের অকল্যাণ হয় না…বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের জাতি এমন করিয়া মরিতে পারে?…এ জাতি বিশেষ করিয়া প্রাণধর্মী, ইহার এক আশ্চর্য প্রাণবত্তা আছে আর কিছুতেই এ জাতি জাগিবে না, একমাত্র—কোন মহাপ্রাণ পুরুষের সাক্ষাৎ সংশ্রব ব্যতিরেকে। যদি এখনও তেমন পুরুষের আবির্ভাব হয়—তবে সেই একজনের আহ্বানে এই শ্মশানভূমিতেও শবদেহ উঠিয়া বসিবে, ইহার মৃত্তিকাতল হইতেও অস্থি-কঙ্কাল বাহির হইয়া কলেবর-শোভিত হইবে। এ জাতির প্রাণ-মাহাত্ম্য এমনই! (সভাপতির ভাষণ)।

চার

মোহিতলালের বাঙালী-সত্তা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্ত অনায়াসে টানতে পারি। সেটি হল—বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও আগে বাঙালী পরে ভারতীয়, আগে হিন্দু পরে অন্যকিছু, আগে দেশ ও জাত পরে সাহিত্য। এইখানেই মোহিতলালকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে কেননা স্বদেশিকতা থেকে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা। মোহিতলালের মধ্যে এই অন্ধ প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কেউ যদি সবচেয়ে বেশী রক্তমূল্য দিয়ে থাকে তবে সে বাঙলা দেশ। কিন্তু বিনিময়ে সে পেল কি? পেল দ্বিখণ্ডিত হৃৎপিণ্ড মাত্র। সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙালীর অবস্থা যেমন শোচনীয় তেমনি পূর্ব বাঙলায় বাঙলী হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ফলে ভারতে তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারের শৈথিল্য বাঙালী হিন্দুকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় বাঙলাদেশের ঐতিহ্য ও বাঙালী হিন্দুকে বাঁচাবার জন্যে যদি মোহিতলাল ব্যাকুল হয়ে পড়েন তা কি প্রাদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট হবে? বাঙালীত্বের প্রতি অনুরাগকে প্রাদেশিকতা ও বাঙালী হিন্দুকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের কথা চিন্তা করাকে যদি সাম্প্রদায়িকতা বলতেই হয় তাহলে বলতে হবে যে মোহিতলালের বাঙালীয়ানা বিহারী-উড়িয়া-অসমীয়াদের মত বাঙালী খেদায় রূপান্তর নয়, তাঁর জাতির প্রতি ভালবাসা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধানো নয়। তিনি শুধু বলতে চেয়েছেন, যে

বাঙালী নিজের মেধা ও মনন নিয়ে একদিন সমগ্র ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করেছে সে-জাতকে যেমন করে হোক বাঁচতে হবে সমগ্র ভারতের খাতিরে এবং এর ফলে একালের ভারতীয় সংস্কৃতির নবতররূপ যে একান্তভাবে বাঙালী সংস্কৃতিরই রকমফের মাত্র এবং ভারতের সেই জাগরণের মধ্যে বাঙলায় বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুর যে কৃতিত্ব রয়েছে সেই হিন্দুকেও বাঁচতে হবে। এ ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে ড. সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, আর মার্কসবাদী সমালোচক গোপাল হালদার 'সংস্কৃতির রূপান্তর,' 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ বইতেও স্বীকার করেছেন—তবে এঁরা বাঙালিত্বের প্রতি অন্ধ অনুরাগের বশবর্তী না হয়ে আসলে এঁরা ভারত-পথের পথিক হয়েছেন। কিন্তু মোহিতলাল ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই যাঁরা ভারত-পথের পথিক ছিলেন তাঁদের তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এজন্যে রবীন্দ্রনাথের ওপর তিনি আস্থা রাখেন নি, কেননা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারত-ভাগ্যবিধাতার উপাসক বাঙলার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে কখনও স্বতন্ত্র মর্যাদা দেন নি, বরং বাঙলাদেশকেই ভারত-পথের পথিক হবার প্রবর্তনা দিয়ে গেছেন। 'বাঙালীর অদৃষ্ট' প্রবন্ধে মোহিতলাল তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "যে জাতির মেরুদণ্ড বক্র ও শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যাহার উদরে অন্ন নাই, চক্ষে দীপ্তি নাই—যে জাতিহারা, বাস্তুহারা হইতে বসিয়াছে—সে এখন কবির মুখে বিশ্বভারতী ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনিয়া কেমন করিয়া সঞ্জীবিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কবি তাহাকে বঙ্গভারতীর পরিবর্তে বিশ্বভারতীর আদর্শে দীক্ষিত করিতেছেন; দেশ ও জাতি ভুলাইয়া মহামানবের বন্দনা-গান শুনাইতেছেন, তাহার রসবোধ উন্নত ও মার্জিত করিবার জন্য সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার নব নব ধারায় বেগসঞ্চারে সাহায্য করিতেছেন; সত্যকার রক্ত-মাংসের চেতনা স্তিমিত করিয়া, অরূপ-রূপকের মিস্টিক-রসে তাহার মরণাহত প্রাণে সান্ত্বনা সিঞ্চন করিতেছেন। তাই মনে হয়, বাঙালীকে লইয়া বিধাতার কি পরিহাস! এত বড় প্রতিভাও জাতির পক্ষে নিষ্ফল হইল! রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর Renaissance-এর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক না হইয়া তাহার মৃত্যুযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন!"

(বিবিধ কথা)।

আজকের দিনে স্বতন্ত্রভাবে একটা দেশ বা জাতি বেঁচে থাকতে পারে না,

প্রত্যেকের উন্নতি-অবনতি পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটা খণ্ড সত্যের মহত্ত্ব একটা অখণ্ড সত্যের ঘাড়ে কোন প্রকারেই চাপানো যায় না তাতে যত গুণই থাক। সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখতে হবে, নিজের মধ্যে সর্বভূতের আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই একের কথার আগে বহুর কথাকে ভাবতে হবে—এ যুগের এটিই হল বেঁচে থাকার একমাত্র পন্থা। বাঙালীকে উদ্ধারের পথ বাতলিয়ে দেবার পূর্বে, সে-পথ আজকের জাগতিক ও ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় কতটা কার্যকরী হবে এবং সেজন্য নিজের মতের কতখানি যোগ-বিয়োগ করতে হবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সেই দৃষ্টির সমগ্রতা মোহিতলালের ছিল না। জগতের সহিত দূরের কথা সমগ্র ভারতের সহিতই তাঁর অন্তরের আত্মীয়তা নেই। নিরতিশয় স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে নিজের বাঙালীত্ব নিয়ে মেতেছিলেন। তিনি শুধু বাঙালীর দুর্দশায় কাতর হয়ে এমন উত্তেজিত হয়েছেন যে বাঙালার গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে এবং বাঙালীর প্রতি বাকী ভারতের ঔদাসীন্যকে সর্বদা মানসপটে জাগ্রত রেখে বাঙালীর বাঁচার পথ চিন্তা করেছেন। কাজেই শেষের দিকে তাঁর এই মনোভাব বাঙালী জাতির রক্ত-নির্ধারণ তত্ত্বে গিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে। বিদ্যাবত্তা এবং মনীষার সমন্বয়ে তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, বিদগ্ধ চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিমিত বদ্ধ-গণ্ডীর মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠে। তবু এত ত্রুটি বলার পরও আবার বলছি, বাঙালীর প্রতি মোহিতলালের মমত্ববোধকে কিছুতেই সন্দেহ করা চলে না, বাঙালীর সঙ্গে তাঁর সত্যিকারের নাড়ীর টান ছিল। আর এই অকৃত্রিম মমত্বের জন্য বাঙালী মোহিতলালের চরিত্রকে অনুধাবন করে আজকের দুর্বিপাকের মরীচিকা থেকে বাঙালীকে সত্যিকারের মনুষ্যত্বে ফিরে যাওয়ার পথ সকলকে নির্ধারণ করতে আহ্বান জানাই—যাতে ভারতীয় আত্মার রূপ পরিপূর্ণতা লাভ করবে, যাতে বিরোধ থাকবে না, বন্ধুত্বের মিলন-সেতু গড়ে উঠবে, একের জন্যে অপরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে॥

বাংলা পত্র-সাহিত্যে মোহিতলাল

কবিকে লেখককে শিল্পীকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে তার গহন অন্তর্জীবনে বিজন মনোলোকে যে তরঙ্গ নাচানাচি করে সেই হিন্দোলের স্পন্দন একমাত্র দিনলিপি ও পত্রগুচ্ছের মধ্যেই অনুভব করা যায়। কবি, সাহিত্যিক দেশনেতা, বিজ্ঞানী এসব পরিচয় মানুষের খণ্ডিত পরিচয়— ভেতরের মানুষটিকে তার মধ্যে পাওয়া যাবে না, তাকে প্রকৃত চেনা যাবে না কেননা কবিতা পাই কবিকে পাই না, লেখা পাই লেখককে পাই না, জ্ঞানীর চিন্তা পাই জ্ঞানীকে পাই না। মোট কথা কর্ম ও চিন্তার ফসলে সমগ্র মানুষটা নেই, তার মধ্যে বস্তুকে যতটা পাই ব্যক্তিকে ততটা পাই না। চিঠির মাধ্যমেই তাকে চেনা যেতে পারে, দিনলিপির মাধ্যমেই তাকে জানা যেতে পারে। লেখা পড়ে যাকে মহৎ বলে জেনেছি, বক্তৃতা শুনে যাকে সৎ বিবেকবান ব্যক্তি বলে মনে করেছি চিঠি পড়লে দেখতে পাব তার মত নোংরা ব্যক্তি দ্বিতীয়টি নেই। নিছক কৌতূহল চরিতার্থ নয়, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে একত্রীভূত করে সম্পূর্ণ মানুষকে চিনিয়ে দিতে সহায়তা করে এই চিঠি। লেখা পড়ে যে চরিত্র বোঝা যায় নি, চরিত্রের উৎস কোথায়, কী সূত্রে এবং কোন্ প্রেরণায় লেখক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন সেই অন্তরালের খবর চিঠিপত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও ইঙ্গিতের সাহায্যে স্পষ্টতর ও গভীরতর ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। বাইরের বদমেজাজী খিটখিটে লোকটি অন্তরে অন্তরে যে একজন স্নেহপ্রবণ ভালবাসার কাঙ্গাল, সে-খবর দিনলিপি ও চিঠিপত্রের মধ্যেই পাই। দিনলিপির সঙ্গে চিঠির তফাৎ হল যে দিনলিপিতে লেখক নিজের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় ধরা পড়ে যদি সেটি বাইরে প্রকাশিত হয় তবেই। আর চিঠির অন্তত একজন গ্রাহক থাকে তিনি ইচ্ছে করলে লেখকের অনুমতি না নিয়েই চিঠি প্রকাশ করে দিতে পারেন। চিঠি হচ্ছে ছোঁড়া তীর আর দিনলিপি হচ্ছে তূণীরে জমিয়ে রাখা তীর। দিনলিপি হল 'art for one self, art for own self'। চিঠির মধ্যে সমগ্র অসংবৃত ব্যক্তিসত্তাকে পাবার কারণ হচ্ছে যে চিঠি লেখা হয় একটি মাত্র মনের মানুষকে যার কাছে নিজের অন্তর উজাড় করে দেবার সুযোগ থাকে, এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের যোগ চিঠির মাধ্যমে স্থাপিত হয়। বাইরের পাঠক-

সমাজের কাছে সেই সুযোগ থাকে না, সেখানে অনেক কিছু রেখে-ঢেকে বলতে হয়, সাবধানে কলম চালাতে হয়, এদিক-ওদিক বেচাল হলে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। তাই লেখার কাগজে অনেক অলিখিত বাধা-নিষেধ লেখককে সত্যি কথা বলতে দ্বিধান্বিত করে, ফলে কাছের মানুষ দূরে সরে যায় আর চিঠির কাগজে কোন বাধা থাকে না, নির্ভয়ে অসংকোচে অকুণ্ঠিত চিত্তে যা খুশী তাই লেখা যায়, ফলে দূরের মানুষ আরও কাছের হয়ে পড়ে। সেই চিঠি ব্যক্তিমূল্য নিরূপণে যেমন সহায়তা করে তেমনি সাহিত্যমূল্য নির্ধারণেও সাহায্য করে। লেখকের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক পরিচয় ছাড়া বিষয়বস্তুর গৌরবে ঐতিহাসিক, জীবনীকার, সমাজতাত্ত্বিক গবেষকরা সাহিত্য ও সমাজমানস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও চিঠির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করেন, কারণ চিঠিতে জাতির পরিচয় ও সংস্কৃতির স্বরূপ ধরা পড়ে। তাই স্যামুয়েল জনসনের কথায় চিঠির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যেতে পারে "A man's letters are only the mirror of his heart. Whatever passes within him is there shown undisguised in its natural progress; nothing is invented, nothing distorted; you see systems in their elements, you discover actions in their motives."

সাহিত্য লেখা হয় বহুজনহিতায়, চিঠি লেখা হয় একটি রসিক মনকে পরিতৃপ্ত করার নেশায়। এখানেই লেখক মন খুলে আলাপ করেন, তাঁর সব কথা অন্তরের রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে তাঁর চিঠিপত্রই তাঁর সাহিত্য ও জীবন বিচারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড—এরই পাদপীঠে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে তাঁর অন্তরলোকের সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নাই। এই চার পৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিংবা প্রবন্ধ কখনোই তা পারে না।' (ছিন্নপত্র)। এ জন্যেই পত্র-সাহিত্যকে মূল সাহিত্যের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সাহিত্যের মাঝে material validity'র প্রয়োজন ততটা নয়, যতটা দরকার internal coherence-এর। তাই পত্র ও সাহিত্যের মাঝে আসল পার্থক্য রূপগত নয়, গুণগত। ব্যক্তিগত

অনুভূতিকে চিঠিতে রসাত্মক করে লিখলে, পত্রলেখকের রচনারীতি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও অন্তরঙ্গ উপস্থিতির গুণে তবেই সেটি সাহিত্যের মর্যাদা ও কৌলিন্য অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়। পৃথিবীতে যারা চিঠি লেখায় যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প।" (পথে ও পথের প্রান্তে)। রবার্ট লিণ্ড 'English Essays' গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথাই বলেছেন, "…it is an indisputible fact that the greater letter-writer is rarer even thin the great poet:" এজন্যে চিঠিকে ইংরেজিতে 'the gentlest art' (কোমলতম সুকুমার শিল্প) বলা হয়।

ইউরোপে দিনলিপি ও চিঠিপত্র সযত্নে রাখার রেওয়াজ আছে। আমাদের দেশে চিঠিপত্রের মাধ্যমে দোষগুণ জড়িয়ে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সমগ্র দিকটি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করার উপায় নেই, তথ্যগত নিস্পৃহতাই শুধু নয় তথ্যবহির্ভূত ভক্তি ও ব্যক্তিপূজার দ্বারা রক্ত-মাংসের মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করি। এ জন্যে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দিনলিপি সংগ্রহ করার প্রয়োজনবোধ জন্মেনি বরং তাকে নষ্ট করার প্রবণতাই বেশী ছিল, সেজন্যে আমাদের দেশের মনীষীদের চিঠিপত্র চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ পুঁথি-নির্ভর—পুঁথি-লেখকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আবিষ্কারের কথা আজ ভাবাই যায় না, দেশের আবহাওয়ায় তালপত্র, ভূর্জপত্র, তুলটকাগজ, স্বল্পায়ু কাগজ নষ্ট হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অনড় জড়তাকে ভেঙেছেন, অব্যয় ক্রিয়াকে সক্রিয়তা দান করেছেন—পত্র-সাহিত্যের প্রতি আমাদের সচেতনতা তাঁর আর একটি প্রত্যক্ষ প্রেরণা। তিনি এত অধিক সংখ্যক পত্র রচনা করেছেন যার জুড়ি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ নেই। তাঁর গদ্য-সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর পত্রগুচ্ছ। তাঁর চিঠিপত্রের সংকলনের মাধ্যমে তাঁর কবিজীবনের বিচিত্র তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আর তিনিই চিঠিকে জাতে তুলেছেন, সেই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আমরা কবি-মনীষীদের চিঠিপত্র সংরক্ষণে ইদানীং একটু তৎপর হয়েছি।

ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা পত্র-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে এ কথা

তথ্যজনিত দিক দিয়ে নির্ভুল নয় কেন না ড সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রাচীন বাংলা চিঠিপত্রের যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তাতে দেখা গেছে যে ষোড়শ শতকে আমাদের দেশে চিঠি রচনার চর্চা ছিল। তারও আগে সংস্কৃতসাহিত্যে পত্র রচনার নিদর্শন আছে। বররুচির 'পত্র কৌমুদী' সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত যা চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলি প্রধানত দলিল দস্তাবেজ জাতীয়, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক—চিঠির মধ্যে হৃদয় বিনিময়ের, প্রাণরসের কোন আভাস সেগুলিতে নেই। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতক থেকেই সাহিত্যগুণান্বিত চিঠি লেখার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব চিঠি সংগৃহীত হয় নি, কিছু কিছু উদ্ধার হয়েছে। রবীন্দ্র-যুগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উদ্ধারকর্মে প্রথম ব্রতী হয়েছিলেন।

সাহিত্যগুণান্বিত চিঠি আমরা মধুসূদনের হাত থেকেই প্রথম পাই কিন্তু সেগুলি ইংরেজিতে লেখা। বাংলা ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিতেই সাহিত্য সৌন্দর্যের হার্দ্য স্পর্শ পাওয়া যায়, কেননা তাঁর চিঠিগুলি প্রধানত আত্মিক উপলব্ধির ভাবধারায় স্নাত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতির চিঠি যা সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে নির্জন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় নেই, সেগুলি প্রধানত শিল্পের কৃতিত্ব অপেক্ষা জীবনী রচনা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে মূল্যবান।

গ্রন্থাকারে রবীন্দ্রনাথের চিঠির পর শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী সংকলিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের চিঠিপত্র আজও সংকলিত হয় নি। আমরা যথাসময়ে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করতে পারি নি বলে প্রাচীন বাঙালী মনীষীদের চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলেছি, সমকালীন লেখক-শিল্পীদের চিঠিপত্র সংরক্ষণের দ্বারা পুরোনো কলঙ্ক মোচনের স্পৃহা আজ আমাদের মধ্যে জাগুক। সম্প্রতি প্রকাশিত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের পত্রগুচ্ছের সংকলন, পাঠক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের দ্বারা সেই দুরপনেয় কলঙ্কমোচনের প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র।

খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য সবাই চিঠি লেখে কিন্তু সব চিঠিই সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। জরুরি খবর ছাপিয়ে পত্র-লেখকের মনের খবর

যখন ভাষা পেয়ে মুখর হয়ে ওঠে তখন শিল্পীর স্বাভাবিক নৈপুণ্যের জোরে চিঠি সাহিত্য পদবাচ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন, "যে চিঠিতে ভরতি মনের অবস্থায় জরুরী কথা ছাপিয়েও মুখরতা উদ্বৃত্ত থাকে—সেই চিঠিই প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য। ⋯ চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছ-ঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া-প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি, আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসারপথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।" (ভূমিকা: পথে ও পথের প্রান্তে)। সাধারণ চিঠিতে নিছক কুশলাদির প্রশ্ন, দেশ ও সমাজের অল্পবিস্তর তথ্য থাকে, তাতে সমসাময়িক সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। সাহিত্যগুণান্বিত চিঠি বিষয় ও বৈষয়িকতাকে অতিক্রম করে পত্র লেখকের ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসই প্রধান হয়ে ওঠে। সাহিত্য পদবাচ্য চিঠি বিভিন্ন রকমের হতে পারে—কোনটি মননধর্মী, কোনটি ভারহীন সহজরস, কোনটি হালকা মেঘের কথার মালা। মোহিতলালের চিঠিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এজন্যে তাঁর চিঠি প্রধানত মননধর্মী। হালকা জাতের কথা তিনি ভাবতে পারেন না, সহজ হতে জানেন না, তাঁর মনঃপ্রকৃতি বরাবর সিরিয়াস। কাজেই চিঠি লেখার সময়ও তিনি নিজের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক দৃঢ়প্রত্যয় বজায় রেখেছেন যা তাঁর শিল্পী জীবনের মতো ব্যক্তি জীবনেরও অন্যতম ভূষণ ছিল। কবি-আত্মার অন্তরলোকের কথা, সমালোচক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা, তাঁর মৌল প্রবৃত্তির কথা সাদা মাঠা ভাষায় জোরালো ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। এক কথায় তাঁর চিঠিগুলি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যধর্মের স্বরূপ, মনোজীবনের গতিবিধি, মনের বিকাশ ও পরিণতি জানতে সহায়তা করে। তিনি নিজেই যেন নিজের জীবন ও সাহিত্যের ভাষ্য রচনা করেছেন, কেননা তাঁর কাছে জীবন ও সাহিত্য সমার্থক ছিল। তাছাড়া তিনি কোন্ সময়, কী রকম পরিবেশে কবিতা রচনা করেছিলেন, তাঁর মনের অবস্থা তখন কেমন ছিল, এ সব তথ্যও তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়। সমকালীন যুগজীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, শিক্ষানীতি বিষয়ে তাঁর অভিমত, সমাজচিন্তা ও রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর স্বজাতিপ্রীতি চিঠিপত্রের মধ্যেই আরও ঋজুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কামনা-বাসনা অর্থাৎ কী করতে চেয়েছিলেন অথচ করতে পারেন নি, কী কারণে সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় নি, দুঃখ-ব্যথা বেদনা তাঁকে কতদূর বিচলিত করেছে, দুর্বল মুহূর্তগুলিতে সাহিত্যের দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করে কেমন করে

ব্যথা-বেদনা ভুলতে চেয়েছেন এসব অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। এ পর্যন্ত মোহিতলালের ১৯৩টি চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছি। সেগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— ১। সাহিত্যচিন্তা, ২। দেশ ও সমাজ, ৩। শিক্ষার্জন, ৪। ব্যক্তি-চরিত্র ও অন্তর্জীবন, ৫। বিবিধ। বিষয়ানুসারে এই শ্রেণীবিভাগ সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হয় নি কেননা অনেকগুলি চিঠিই মিশ্র প্রকৃতির অর্থাৎ একই চিঠিতে সাহিত্যের কথাও আছে আবার দেশ ও সমাজের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি-প্রকৃতির কথাও আছে। আর চিঠি কখনও একটি প্রসঙ্গ নিয়েই শেষ হয় না, সেখানে পাঁচ রকম বিষয়ের পাঁচমিশেলী কথা থাকে, তবে ব্যতিক্রমও আছে যেমন বড়লাটকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগের চিঠি কিংবা ইদানীংকালে ভারত সরকারকে লেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'পদ্মশ্রী' উপাধি ত্যাগের চিঠি; কিন্তু অধিকাংশ চিঠিই খোলা জানালার মত যাতে চারদিকের বাতাস নির্বিবাদে যাতায়াত করতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'চিঠি চলে যায় বিনা বাঁধানো রাস্তায় বাইসিক্‌লের মতো।' কাজেই এসব ক্ষেত্রে চিঠিতে যে প্রসঙ্গ নিয়ে বেশী আলোচনা আছে কিংবা চিঠির motiveকে অবলম্বন করে শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ফেলা হয়েছে। বর্তমান আলোচনার মধ্যে দেখা যাবে যে এক বিভাগের আলোচনার সময় বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য অন্য বিভাগের চিঠিপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে মোহিতলালের চিন্তাধারার পরিচয় নেওয়া যাক।

দুই

ক. সাহিত্য-চিন্তা (পত্রসংখ্যা ১-৪৩)

মোহিতলাল একজন সর্বজনস্বীকৃত সমালোচক। তাঁর রচনা ভাবময় ও কল্পনাসমৃদ্ধ—মননশীলতা ও সূক্ষ্ম রসবোধের দ্বারা তাঁর বোধি প্রসাধিত। এই প্রসাধনের স্পর্শ তাঁর সাহিত্যবিষয়ক চিঠিতে পাওয়া যায়। এই চিঠিগুলির মধ্যে সাহিত্য-সম্পর্কিত বহুবিধ প্রশ্নের জবাব আছে, সাহিত্যের উপাদান, সাহিত্যের প্রাণ, সাহিত্যের ধর্ম, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত আছে। প্রকাশিত সমালোচনা গ্রন্থে তিনি ঐ সংক্রান্ত বিষয় কিভাবে আলোচনা করেছেন তারও ইঙ্গিত পত্রগুলিতে

দিয়েছেন। চিঠিগুলির রচনারীতি সহজ ও অনাড়ম্বর, আবেগপ্রবণ ও গতিশীল। রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের মতামত প্রবন্ধাকারে না লিখে পত্রাকারে প্রকাশ করতেন তেমনি মোহিতলালও নিজের বক্তব্য বিষয়গুলি প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করেও আরও সহজ করার জন্য আলাপী সুরে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য পত্র লিখতেন। তাঁর অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রেম, সাহিত্যসাধনায় আন্তরিকতা, একান্ত নিষ্ঠা, সাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগ তাঁর প্রাত্যহিক উপাসনারই সামিল ছিল। সাহিত্যসাধনাকে তিনি অধ্যাত্মমহিমায় মণ্ডিত করেছিলেন। তিনি ২১ সংখ্যক পত্রে বলেছেন, "আমার সাহিত্যসাধনা আমার জীবনের গভীরতম উৎকণ্ঠার সহিত যুক্ত হইয়া আছে—উহা আমার অধ্যাত্মসাধনা এবং একমাত্র সাধনা।" (পৃ. ৪৯)। আর একস্থানে রয়েছে, "সাহিত্যব্রত আমার জীবনের ব্রত, তাহা ত্যাগ করিতে আমি পারিব না—সেই ধর্ম বজায় রাখিতে যদি উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে. গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া তাহাই করিব। আমার বর্তমান সংকল্প ইহাই।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ৩১, পৃ ২১২)। এর থেকেই বোঝা যায় কী গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিক শ্রদ্ধায় তিনি যোগীর মত সাহিত্য রচনায় মগ্ন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, প্রত্যক্ষভাবে—স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বসমাজ এবং পরোক্ষভাবে—মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান।" (বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিমবরণ)। তাঁর ঐ কথাটি তাঁর নিজের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধেও খাটে। তিনি প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছিলেন। একটি চিঠিতে সেই উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে— "আমি তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া আমার সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, প্রথম—বাংলা সাহিত্যের অরাজকতা নিবারণ, দ্বিতীয়—বাঙালীর শিক্ষায় বাংলাকে উপযুক্ত মর্যাদাদান এবং তৃতীয়—বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা—তজ্জন্য একটি প্রকাশনালয় স্থাপন।" (শিক্ষাদর্শন, পত্র ৩, পৃ ১৫৪)। এই তিনটি কাজে তিনি পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারেন নি—এ স্বীকৃতি তাঁর চিঠির মধ্যেই আছে।

তাঁর কাছে 'বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র বর্তমান বাঙালী জীবনের মতই বড় অশুচি ও অপরিচ্ছন্ন।' (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ৫, পৃ. ১৭২)।

শুচিতা রক্ষার জন্য অপরকে যেমন উপদেশ দিয়েছেন তেমনি নিজেও বেত্রহস্তে অশুচি নিবারণে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছেন। সাহিত্যে অশ্লীলতা নিবারণে, ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষণে তাঁর অক্লান্ত সংগ্রামের অজস্র উদাহরণ চিঠিপত্রের এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। 'সাহিত্য-কথা'-য় 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' 'সাহিত্যে সুনীতি' 'বিচিত্র কথা'-য় 'অতি-আধুনিক প্রতিভা' 'কাব্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধাদিতে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত ৮ সংখ্যক পত্রে উপরিউক্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আজীবন নতুন প্রতিভা আবিষ্কারে ও নতুন নতুন গ্রন্থপাঠে তাঁর অফুরন্ত আনন্দ ছিল। কোন লেখকের লেখা পড়ে যদি আনন্দ পেতেন তাহলে তাঁকে দীর্ঘপত্র লিখে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিতেন। এ জাতীয় পত্র মামুলী কথায় পূর্ণ থাকত না—রীতিমত যুক্তিতর্ক সহকারে লেখকের প্রতিভা যে খাঁটি ও প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ তা তিনি দেখিয়ে দিতেন। রসবোধ ও বিচারবোধের সমন্বয়ে এই জাতীয় চিঠিগুলি বাংলা সাহিত্যে অনন্য। এ জাতীয় চিঠির উদাহরণ হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে নজরুলকে স্বাগত জানিয়ে 'মোসলেম ভারত' সম্পাদককে লিখিত চিঠি (১)। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কোন লেখকের লেখা পড়ে যদি ভাল লাগত কিংবা লেখার অংশ লেখক যদি তাঁর কাছে পাঠাতেন তারও ভাল-মন্দ বিস্তারিত আলোচনা চিঠিতে করতেন। যেমন ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৫, ৬), বনফুল (১৫), তারাচরণ বসু (২২), বিনায়ক সান্যাল (৩৬), ভবতোষ দত্ত (৪১)কে লেখা চিঠি। লেখকরা তাঁকে উপহার স্বরূপ যা বইপত্র পাঠাতেন তার শুধু প্রাপ্তি স্বীকারই করতেন না বইটি তাঁর কেমন লেগেছে, বইয়ের দোষত্রুটি কোন্‌খানে, কী করলে আরও ভাল হত ইত্যাদি উপদেশ পরামর্শ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুজনের মত দিতেন। আমরা এভাবে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কুটীরের গান' (১১) বনফুলের 'বৈতরণীর তীরে' (৯, ১৩), 'তৃণখণ্ড' (১৯), 'বনফুলের গল্প' (১৩, ১৭), 'ভূয়োদর্শন' (১৪, ১৭), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কুমারসম্ভব' (২৫), রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' (২৮) দিলীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' (৩১) গ্রন্থসমূহের চিঠি-মারফৎ সমালোচনা পেয়েছি। এই সমালোচনায় পত্র-প্রাপকের সঙ্গে পত্র-লেখকের মানসিক সংযোগ যেন একসূত্রে গ্রথিত। বইয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এমনভাবে করেছেন যা দিয়ে অনায়াসেই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারত। লেখা ও

লেখককে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন বলে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রী হিসেবে সেগুলির যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে তাঁরই যেন এক ধরনের দায় ছিল - এই দায় তিনি হাসিমুখে পালন করতেন এবং কর্তব্য বলে মনে করতেন। এই কর্তব্য পালন কোন বন্ধু বা গোষ্ঠীর মুখ চেয়ে করতেন না। তিনি যা শ্রেষ্ঠ বলে বুঝতেন তাকেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেন। বন্ধু-বান্ধব বিমুখ হলেও তিনি তার তোয়াক্কা করতেন না। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ধারণা ছিল যে লেখকের প্রকৃত বন্ধুরাই লেখকের প্রকৃত বিচার করতে পারে। মোহিতলাল তাঁর এই কথা স্বীকার করতেন না। তিনি তাঁকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "আপনার ধারণা যে বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ না হইলে কেহ কাহারও প্রতিভার আদর করে না। ইহার কারণ, আপনি নিজ শক্তিতে আস্থাবান হইলেও পরের সম্বন্ধে আপনার কোন শ্রদ্ধা ছিল না, বন্ধুত্ব বা স্নেহ স্বীকার করিতেন কিন্তু সত্যকার রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল না, অথচ আজ প্রায় বিশ বৎসর আমি বাংলা সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া খ্যাতি অর্থ বন্ধুত্ব সকলই তুচ্ছ করিয়া আধুনিক সাহিত্যের আধুনিক সমালোচনা প্রবর্তিত করিতে প্রাণপণ করিতেছি। আপনার কাব্য সমালোচনাও তাহারই প্রয়োজনে, এবং তার জন্য আপনার কাব্যই যথেষ্ট। আপনার সহিত বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় কিছু মাত্র আবশ্যক হয় না, যাহাদের সহিত সরূপ পরিচয় আছে তাহাদের সমালোচনায় বরং বাধা ঘটে। অবশ্য আমার চক্ষুলজ্জা আদৌ নাই।' (৩৫, পৃ ৯১-৯২)। মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রাদির সমালোচনাকে তিনি সমালোচনা বলে মনেই করতেন না, কারণ সেখানে দায়সারা কাজের পরিচয় থাকে, সমালোচক বইটি আদৌ পড়েন না। 'বঙ্গদর্শনে' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'অনুপূর্বা' সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজের সমালোচনা সম্পর্কে তাঁকে বলেছেন, "আমি কি বাংলা সাহিত্যের আড্ডাধারী বৈঠকবিলাসী বা বন্ধুগোষ্ঠীর সমালোচক? আমার সমালোচনার একটি পৃথক গৌরব আছে, উহা মাসিক পত্রের সমালোচনা নয়—রীতিমত সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং উহা আমার গ্রন্থে স্থান পাইবে অর্থাৎ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবে। আমিও আপনার খোসামোদ করি নাই—বন্ধুতার ঋণ শোধও করি নাই। যাহা লিখিয়াছি তাহার উপরে কথা কহিতে পারে বাংলা সাহিত্যের এই সমাজে এমন কোন বুদ্ধিমান দুঃসাহসী ত দেখি না—আপন আপন কোটরে বসিয়া যে যেমন কণ্ঠকণ্ডূয়নই

করুক।" (৩৫, পৃ. ৯২-৯৩)। নিজস্ব সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর এমনই প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল। এজন্যে কোন লেখকের অক্ষম রচনার অকাতরে প্রশংসা বিতরণ কিংবা গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তাকে তিনি কঠোরভাবে ধরে রাখতেন, তাতে তাঁর ক্ষতি যতই হোক। তিনি বলেছেন, "ভূমিকা লিখিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নীতি বিরুদ্ধ। এ পর্যন্ত তাহা করি নাই, আমার পক্ষে তাহা শোভন নয় বলিয়াই করি নাই—কাব্য-সাহিত্যের যে আদর্শ আমি কঠিনভাবে ধরিয়া আছি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচার করিয়াছি, তাহাতে ব্যক্তিগত স্নেহ-সহানুভূতির উপায় নাই। এজন্য আপনার অনুরোধও রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে কিছু করিবেন না।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ৭, পৃ. ১৭৬)।

সাহিত্যের পরাদর্শ রক্ষা করার বিষয়ে তিনি সমস্ত প্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সাহিত্যের মধ্যে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, মিথ্যাচার সহ্য করতে পারেন নি—দিনের পর দিন যত ক্ষুদ্রতা নীচতা বেড়েছে তিনি নিজেকে তার থেকে ততদূরে সরিয়ে একক জীবনযাপন করেছেন। ১৯২০-এর একটি চিঠিতে তিনি এই সম্পর্কে বলেছেন, "বর্ত্তমান সাহিত্য সমাজের সহিত আমি কখনো সন্ধিস্থাপন করিতে পারি নাই, বরং ক্রমশঃ যতদিন যাইতেছে আমি তাহার ক্ষুদ্রতা ও মিথ্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে অপসরণ করিতেছি —ক্রমে দেখিবেন কোনো পত্রিকার সঙ্গে আমার সদ্ভাব থাকিবে না কোনো coterie আর আমাকে আসন দিবে না। সাহিত্য-সমাজে বন্ধুত্ব একটি অপূর্ব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে—Mutual Admiration Society'র মেম্বার হইতে না পারিলে আর গত্যন্তর নাই—বন্ধু কথাটির একটি মাত্র অর্থ আছে 'They are the agreeable hypocrites of life, who sustain for us the illusions in which we wish to live,' এই hypocrisy আমি কখনও সহ্য করিতে পারি নাই -ইদানীং আরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই আমাকে একক বলিয়া জানিবেন—সামাজিক লোক বলিয়া মনে করিবেন না।" (২, পৃ. ৫)। পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি সবসময় সাহিত্যের মান বজায় রেখে চলতেন। এজন্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখাও ফেরৎ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং একাধিক লেখা পাঠাতে বলতেন যাতে নিজের পছন্দমত উৎকৃষ্ট লেখাটি পত্রস্থ করতে পারেন। যতীন্দ্রনাথ

সেনগুপ্তকে অনুরোধ করেছেন, "আপনি আমার জন্য সেইরূপ কবিতা পাঠাইবেন যাহা আমাকে বড় মুগ্ধ করে।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ৩৩, পৃ. ২১৫)। কুমুদরঞ্জন মল্লিককে বলেছেন, "আপনার কবিতা দুই চারিটি পাঠাইবেন যদি উৎকৃষ্ট হয় তাহাও ছাপিব।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ২, পৃ ২১৩)। কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছেন, "আপনার কবিতা ছাপিতে পারিলে সুখী হইব কিন্তু এক সঙ্গে দুই চারিটি পাঠাইলে ভাল হয়, আমি নিজের পছন্দমত বাছিয়া বাকিগুলি ফেরৎ পাঠাইব। যদি আবশ্যক হয় কিছু সংশোধন করিব, তাহাতে আপনার আপত্তি থাকিলে, আমি আপনাকে পূর্বেই জানাইব। আপনি ইহাও জানিবেন যে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির কবিতা আমি পছন্দ না হইলে ফেরৎ দিয়া থাকি।" (৩৭, পৃ. ৯৬)। তাঁর এই সংশোধনে আপত্তি জানিয়ে শৌরীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিয়েছিলেন তদুত্তরে মোহিতলালও বলেছেন, "আপনি আমাকে বাংলা কবিতা এবং ছড়ার ইতিহাস এবং কাব্য ও কাব্য-ভাষা সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন। বয়সে আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, তাই এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু লেখা অতিশয় অশোভন হইবে। আমি সাহিত্যের শুধুই সমালোচক নই—উচ্চতম ক্লাশের ছাত্রদের অধ্যাপক, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের P. R S ও Ph D প্রভৃতির পরীক্ষার পরীক্ষক, ইহাই আপনাকে মনে রাখিতে বলি।" (৩০, পৃ ৯৫)। তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই মন-রাখা কথা বলেন নি। এই স্পষ্টভাষিতাই তাঁর চরিত্রের একটি মস্তবড় গুণ। তিনি বলেছেন "আমাকে লোকে দাম্ভিক, অসামাজিক অভদ্র বলিয়া থাকে--ভাগ্যে আমি তাহ নহিলে জাতটাও রক্ষা করিতে পারিতাম না।" (৩৫, পৃ ৯২)। তাঁর সমালোচনার সত্তার মধ্যে তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব এভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে।

মোহিতলাল যেভাবে সাহিত্য-বিচার করেছেন তা দেশ কাল-সমাজ নিরপেক্ষ নয়। তিনি তাঁর সমালোচনা পদ্ধতির কথা কয়েকটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন—

"সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্যই শাশ্বত সত্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তথাপি সাহিত্যের একটা দেশকালানুবর্তিতা আছে—কারণ সাহিত্য একার নয়— সমাজমনের, দেশ ও কালের শাসন তাহাকে মানিতে হয়। আমরা যতই

স্বতন্ত্র হই না কেন যতই চিরযুগের দিকে তাকাইয়া থাকি না কেন—যুগকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।" (১৮, পৃ ৪৫)।

"বাংলা সাহিত্যের যে সেবা আমি করিয়াছি তাহা দেশ, জাতি ও সমাজকে দূরে রাখিয়া নহে - কেবল সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক চালনা ও সাহিত্যরস চর্চার জন্য নহে বাঙালী জাতির জাতিগত সাধনা ও জাতীয় প্রতিভাকে আমি তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।" (৩৮, পৃঃ ৯১)।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কয়েকজন কবির কাব্যালোচনা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। এই উপলক্ষে কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনাও করেছিলেন যেমন—বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এছাড়া আরও অনেক কবি ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন, তাঁদের কয়েকজনকে তিনি কবি বলে স্বীকারই করতেন না। ২৬ সংখ্যক পত্রে তিনি বলেছেন, "আমার রুচি বা মনোভাব aristocratic এবং conservativeও বটে। কেবল আমাদের অতি জাগ্রত মনের তৃপ্তি সাধন হইলেই চলিবে না—গভীর চেতনায় পরম রহস্যবোধ চাই। এমন লেখক কোন যুগেই সংখ্যায় বেশী হইতে পারে না।—ইহাই আমার বিশ্বাস। লেখক কেবল শক্তিমান হইলেই হইবে না--কেবল 'ভাল' লেখা নয়—চটকদার বা চমকপ্রদ হইলেই হইবে না—অতি স্থির ও গভীর দৃষ্টির প্রমাণ চাই ' (পৃ ৭০)। সাহিত্য-বিষয়ক চিঠিপত্রের মধ্যে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক-দের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনাও আছে। যেমন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে ২৩, ৩৩ সংখ্যক পত্র, কুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্পর্কে ২৭ সংখ্যক চিঠি। সাহিত্যবিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর ৬ ও ৭ সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়। অনুবাদ কেমন হওয়া উচিত অনুবাদ করার সার্থকতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ৩৯ ও ৪০ সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে মোহিতলালের মূল্যবান উক্তি চিঠিপত্রে রয়েছে। তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে অনেকেই মনে করেছেন ঈর্ষাজনোচিত মনোভাব—তার মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত কারণও আবিষ্কারও করেছেন। ড সুকুমার সেন স্পষ্টই বলেছেন, "মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিদ্রোহের কিছু ব্যক্তিগত কারণ থাকা অসম্ভব নয়। · ঢাকায় থাকিয়া মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিমুখতা নূতন

রূপ পাইল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড) কিন্তু ড. সেন মোহিতলালের রবীন্দ্র-সমালোচনার গভীরে প্রবেশ করেন নি, করলে একথা বলতে পারতেন না যে মোহিতলালের সমালোচনা প্রবন্ধগুলি 'শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা তরণের ভেলা'। তাঁর নিজের বইগুলি যে সেই ভেলারূপে কাজ করছে তা তিনি কি জানেন না? মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাকে সমর্থন করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয়েছিল আর মোহিতলালের মন বিদেশী কাব্য-সমুদ্র মন্থন করেও তাঁর স্বদেশের ভূমিকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়ে ধরেছে। এই দুই বিপরীত ধারার মধ্যে মতবিরোধ থাকা বিচিত্র নয়। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি বাঙালীকে তার নিজস্ব সংস্কৃতির এক দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথের সাধনা সেই ভিত্তিভূমিকে আলগা করে দিচ্ছে। তিনি ছিলেন মুখ্যত বঙ্গ সংস্কৃতির প্রচারক ও সাধক। তিনি এক পত্রে বলেছেন "বাঙালী জাতির সাধনা ও জাতীয় প্রতিভাকে আমি তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।" (৩৮, পৃ. ৯৭)। এই নিরীখে রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যরস বিচার করতে গিয়ে তাঁর যা আশঙ্কা হয়েছে তা তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন। একটি চিঠিতে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ নিজের ভোগ-মোক্ষ সাধনার জীবনেও 'রস' ছাড়া আর কিছুকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং সেই ভোগবাদকে আজীবন নিজের অলৌকিক গীতি প্রতিভার বলে এমন মোহনভঙ্গিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, এজাতির যেটুকু 'ধর্ম'-ও অবশিষ্ট ছিল তাহাও শেষ করিয়া গিয়াছেন।" (দেশ ও সমাজ, পত্র সংখ্যা ৫, পৃ. ১১৮)। 'বিবিধ কথায়' 'বাঙালীর অদৃষ্ট' নামক প্রবন্ধেও এই কথা বলেছেন, "দেশ ও জাতি ভুলাইয়া মহামানবের বন্দনা গান শুনাইতেছেন; তাহার রসবোধ উন্নত ও মার্জিত করিবার জন্য সঙ্গীত, নৃত্য, ও চিত্রকলার নব-নব ধারায় বেগ-সঞ্চারে সাহায্য করিতেছেন; রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর Renaissance-এর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক না হইয়া তাহার মৃত্যুযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্মের প্রতি তিনি চিরদিন শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাঁর ধর্মগুরু বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কাব্যগুরু রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিজেকে কবির ভক্ত বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর ভক্তি যে কত খাঁটি ও নিঃস্বার্থ তা তিনি

রচনা ও চিঠিপত্রে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথকে আমি যতটুকু শ্রদ্ধা করি তার অধিক শ্রদ্ধা যে করে সে হয় মূঢ়, নয় স্তাবক ভণ্ড। আমি রবীন্দ্র-প্রতিভার নিকটে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইতে পারি।' (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র সংখ্যা ৫, পৃ. ৮৭১)। আর একটি চিঠিতে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের অন্ধভক্তের অভাব নাই—সাহিত্যক্ষেত্র তাহারাই ভরিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র আমি এই অন্ধভক্তির প্লাবন রোধ করিয়া সাহিত্যের বৃহত্তর গতি অবাধ অব্যাহত রাখিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক তাহার বিচার করিবে।" (৮, পৃ. ২১)। রবীন্দ্র-বিয়োগে তিনি শোকবিহ্বল হয়েছেন, মনের ওপর গুরুতর আঘাত এসেছে কিন্তু তথাকথিত রবীন্দ্র-ভক্তদের শোকোচ্ছ্বাসে তিনি আশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন. "রবীন্দ্র-বিয়োগের যে বেদনা আমরা অনুভব করিতেছি, তাও অল্প লোকে করিবে। ..রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার মত মন ও হৃদয়ের স্বাস্থ্য এবং মনুষ্যত্ব সংস্কার যাহাদের শতকরা ৯৯ জনেরও বেশি নাই, তাহারা আজ এই যে রবীন্দ্রশোকে শোকাত হইয়াছে, সে শোক, এবং তাহা যে রবীন্দ্রনাথের জন্য তাহাতে আমাদের মত ব্যক্তির শ্বাসরোধ হয়—বুদ্ধকে বৌদ্ধরা যাহা কারয়া তুলিয়াছিল, ইহারা রবীন্দ্রনাথকে এখনই তাই করিয়া তুলিয়াছে।" (ব্যক্তিচরিত্র অন্তর্জীবন, পত্র ৯, পৃ. ১৭৮-৭৯)। অন্ধ ভক্তদের মত রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাছে সাহত্যের শেষ কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের থেকে সাহিত্য বড়, কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেই যৌক্তিক হোক আর অযৌক্তিক হোক ভক্তরা হৈ চৈ করে উঠেন. রবীন্দ্রনাথের কোন কিছুই খারাপ নয়, তিনি মানুষের উর্ধ্বে মহামানব—এই বোধশক্তি রবীন্দ্র বিচারকে পঙ্গু করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা পূজার বেদীতে বসিয়ে বেলপাতা দিয়ে পূজো করছি। মোহিতলালের সমালোচনা এ-জাতীয় ছিল না। তিনি কি ভাবে রবীন্দ্র সাহিত্য আস্বাদন করতে চান তার আভাস দিয়েছেন একটি চিঠিতে "রবীন্দ্র-কাব্যের আকৃতি-প্রকৃতি বিকাশ ও পরিণতি তাঁহার mind ও art-এর বিবর্তন—অন্ধভক্তি বা পৌত্তলিক দেবপূজার আবেগে নয়—অতিশয় সংযত ও সমাহিত দৃষ্টিতে অনুসরণ ও তাহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে; না করিলে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা আমাদের কল্যাণকর না হইয়া অকল্যাণকর হইবে— উদ্বুদ্ধ না করিয়া বিমোহিত করিবে। বাংলাদেশ অতি-ভক্তির দেশ,

বাঙালী বড়ই Sentimental, এজন্য খুব বড় কিছুকে সে না বুঝিয়াই কেবল পূজা করে, ফলে অমৃত বিষ হইয়া উঠে।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ৩৪, পৃ ২১৭)। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিচার প্রণালী সম্পর্কে মোহিতলাল বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার ঠিক যুক্তিতর্কের অর্থাৎ খুব Logical argument-এর ধরনে লেখা নয়। কবির দৃষ্টি নিয়ে কয়েকটি তত্ত্ব আবিষ্কার করে লিখে গেছেন। সেগুলো আসলে খুব ঠিক, কিন্তু তাঁর যুক্তিপ্রণালী বা মীমাংসার পদ্ধতি খুব পরিষ্কার নয়।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ২৪, পৃ ১৯৮)। একথা তো সর্বজনস্বীকৃত কিন্তু এই কথা বলিষ্ঠভাবে কে আর বলছে? মোহিতলালের নির্ভীকতাকে বরং ভক্তরা রবীন্দ্র-বিরোধিতা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই যদি ব্যক্তিগত বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয় তাহলে মোহিতলালের প্রতিভাকে ছোট করা ত হয়ই উপরন্তু রবীন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট সম্মান দেখান হয় না। রবীন্দ্র-সাহিত্য উপলব্ধির গভীরতার প্রমাণ তাঁর 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য', 'কবি প্রদক্ষিণ' প্রভৃতি গ্রন্থ ও বিভিন্ন আলোচনায় পাওয়া যাবে। 'সাহিত্যচিন্তার' ৭ সংখ্যক চিঠির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের 'পরশপাথর' কবিতার রসগ্রাহী ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অনেক হাস্যকর মন্তব্য রয়েছে। যেমন 'কথা ও কাহিনী'র পর রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভাল লাগে নি। 'রবীন্দ্রনাথের গন্ত কবিতা' 'অতি আধুনিক ছন্দ 'রবীন্দ্রনাথের অতি আধুনিক কবিতা' নামক প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করেন নি। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য শারদীয় লোকসেবক ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'মোহিতলালের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আধুনিক বাংলা কবিতার পুরোধা হিসেবে তাঁর খ্যাতি থাকলেও তাঁর কবিতার আলোচনা তেমন ব্যাপক ছিল না। যদিও বা ছিল তা তাঁর মনঃপূত ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা হয়েছে, এজন্যে তিনি নিজেই নিজের কবিতার ভাষ্য রচনা করেছেন। ১৯, ২১, ৩২ সংখ্যক পত্রে তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা রয়েছে। এই জাতীয় চিঠি থেকে জানতে পারি যে মোহিতলাল নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতা নির্বাচনে কি জাতীয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি কবিতাকেই তিনি নির্বিচারে গ্রন্থভুক্ত করতেন না। যে কবিতাগুলি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কাব্য-

জ্যোতিতে উজ্জল সেগুলিই তিনি গ্রন্থলগ্ন করেছেন। কী রকম মূডে ও কেমনভাবে কবিতা লিখেছেন, তার পটভূমি কেমন ছিল, কোন্ কবিতার সঙ্গে কোন্ কবিতা মিলিয়ে পড়লে কাব্য সৌন্দর্য অধিকতর স্পষ্ট হবে তার আভাস চিঠিতেও রয়েছে। মফঃস্বলের কানুনগো-জীবন কবিত্ব নির্মাণে তাঁকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, কবিতায় অনুচ্চারিত থাকলেও চিঠিতে রয়েছে তারই সুস্পষ্ট উচ্চারণ। ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবনের ২২ সংখ্যক পত্রেও সাহিত্য সাধনায় কর্মজীবনের প্রভাবের কথা বলেছেন।

ভাষা-সংক্রান্ত তাঁর পৃথক কোন চিঠি নেই। তবে সাহিত্য ও শিক্ষানীতি বিষয়ক কয়েকটি চিঠিতে তিনি বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। কাব্যগ্রন্থ নাটক আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকের ভাষাব ত্রুটি উল্লেখ করেছে, অনেকেই ভুল অর্থে শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ১১, ২১, ৩৮ সংখ্যক পত্রে, শিক্ষা-দর্শনের ৪, ৮, ৫ সংখ্যক পত্রে ভাষার অপপ্রয়োগের উদাহরণ দিয়েছেন। ভাষা, বানান, ব্যাকরণ ব্যবহারের যথেচ্ছাচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সমস্ত রকমের অনাচার থেকে ভাষাকে রক্ষা করা তাঁর জীবনব্রত ছিল। তিনি বলেছেন, "ভাষাকে সকল প্রকার অনাচার হইতে রক্ষা না করিলে জাতির ভাবজীবন মনোজীবন এমন কি অধ্যাত্মজীবনও বিপন্ন হয়—জাতি আত্মভ্রষ্ট হয়। এ-জন্য সকল জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির এই বিষয়েও একটি দায়িত্ব আছে।" (শিক্ষা-দর্শন, পত্র ২ পৃ ১৫০-৫)। 'আধুনিক সাহিত্যের ভাষা' প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন, "সাহিত্যের ভাষা জাতির প্রাণ ও মনঃপ্রকৃতিরসে একটা বিশিষ্ট আকার লাভ করে, তাহা কৃত্রিম নয়, তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া গড়া যায় না—তাহার মূলে জীবনেব মতই একটা সত্যকার শক্তি সক্রিয় হইয়া আছে। ·ভাষার রীতি একটা খেলা বা খেয়ালের বস্তু নয়—ব্যক্তিবিশেষের খুশী বা বিলাস-বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে চায় ও পারে—তবে সে জাতির মৃত্যু অবধারিত"। (আধুনিক বাংলা সাহিত্য)। সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে যে প্রভেদ আছে এবং বাংলাকে সংস্কৃতায়িত করার বিরুদ্ধে তিনি মত দিয়েছেন—

"রচনাতে সংস্কৃত idiom সম্বন্ধেও সাবধান হইবে—সংস্কৃতকে বাংলা করিবে, বাংলাকে সংস্কৃত করিবে না। (পত্র ২১, পৃ. ৫৩)।

"সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র ভাষা; তুমি সংস্কৃত বিভার

অনুরাগী হইতে পারো, কিন্তু তাই বলিয়া সে অনুরাগের আতিশয্যে বাংলাকে অশ্রদ্ধা করিতে পারো না, কারণ তাহার ঘরে আর কাহাকেও প্রভুত্ব করিতে দেওয়াই তাহাকে অসম্মান করা।" (পত্র ২২, পৃ. ৫৫)।
একথা তিনি প্রবন্ধেও বলেছেন, 'মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমরা বাংলা কাব্যের যে ভাষা-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মূল-ভঙ্গি অবিকৃত রাখিয়া ভাব কল্পনা ও ধ্বনি ব্যঞ্জনার তারতম্য অনুসারে, ভাষা অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।' (আধুনিক সাহিত্যের ভাষা: আধুনিক বাংলা সাহিত্য)। সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রচলনের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। তাঁর মতে "বাংলার ধাতু প্রকৃতিতে, খাঁটি বাংলা ইডিয়মের উপরেই সংস্কৃতের প্রভাব যতটা স্বাস্থ্যকর, সংস্কৃত বর্জিত কথ্য ভাষায় আদর্শ ততটাই অস্বাস্থ্যকর।" (ঐ)। কাব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "লিখিব সাধু ভাষায়, ভঙ্গিমা করিব বাংলা বুলির—এবং তাহারই খাতিরে উচ্চারণ বাঁকাইয়া ক্রিয়া পদের স্থানে টক্ টক্ শব্দ করিব, এ অনাচারে ভাষা পীড়িত হয়, তাহার ধ্বনিধর্ম নষ্ট হয়। সেই ধ্বনি ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই রচনার বাগ্‌বন্ধনও শিথিল হয়।" (ঐ)। সাহিত্যে কথ্য ভাষার প্রচলনের নেতা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। কথ্য ভাষার বিপক্ষে মোহিতলাল ছিলেন, যাঁরা প্রমথ চৌধুরীর অনুরাগী তাঁদের প্রতি শ্লেষোক্তি করেছেন একটি চিঠিতে, "সাহিত্যের ভাষাটি একেবারে নষ্ট হইবে, তোমাদের অকালপক্কতা আরও বাড়িবে। আড্ডাটি আরও ভালরূপ জমিবে। প্রমথ চৌধুরীর মত জ্যাঠা মহাশয়কে যখন পাইয়াছ তখন 'কায়দা ও চালিয়াতি' আরও ভাল রকমেই অভ্যাস হইবে। লেখা পড়া যত অল্পই হোক, মুরুব্বিয়ানায় সিদ্ধহস্ত হইতে পারিবে।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ৬, পৃ ১৭৬)। তবে কাব্য ভাষা সম্পর্কে তাঁর ছুৎমার্গী সংস্কার ছিল না। তিনি বলেছেন, "সাহিত্যিক রচনায় কোন ভাষাই সাধু বা অসাধু নয়—ভাব প্রকাশের অব্যর্থ শব্দ যাহা তাহাই সাধু—কবিতার ভাব যদি অন্তরের অগ্নিযুক্ত হয়, তাহার উত্তাপে সকল শব্দই 'সাধু' হইয়া উঠে।" (পত্র ৩৭, পৃ. ৯৫)।

ছন্দ সম্পর্কে মোহিতলাল 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১, ৪, ১৬ সংখ্যক পত্রের মধ্যেও ছন্দ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। ছন্দকে তিনি কবিতার অঙ্গ রূপে দেখেছেন, কিন্তু ছন্দের নিয়ম রাখতে গিয়ে কবিতায় প্রাণ রসকে ক্ষুণ্ণ করা তিনি পছন্দ করেন নি।

এ সম্পর্কে বলেছেন, "ছন্দ কবিতার প্রধান অঙ্গ বটে, কিন্তু ছন্দ রচনা যদি কবিদের মুখ্য চেষ্টা হয়, তবে কাব্যকে তা কতখানি কৃত্রিম করে তোলে বা নষ্ট করে, আজকালকার কাব্য রচনায় তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ছন্দে কবিতার বা কবির style-ও অনেকটা প্রকাশ পায়, কোনো ছন্দ যদি ভাব কল্পনার অনুপযোগী হয় তবে কবিতা যে inspired নয়, তা সহজেই ধরা পড়ে, লেখকের personality যে একটা ছল বা pose মাত্র তা বোঝা যায়।" (পত্র ৪, পৃ. ১০-১১)। ছন্দ কবিতা সৃষ্টি করে না, কবিতাই ছন্দকে সৃষ্টি করে, কারণ কবির ভাব ও ভাষা অনুযায়ী ছন্দ গড়ে ওঠে। তিনি বলেছেন, "যে কোন ভাব বা কল্পনা যে কোন ছন্দে সুপ্রকাশ হয় না, ভাবে ও ছন্দে বিরোধ বাধে। আবার কবির নিজস্ব ভাষা বা diction ছন্দের উপযোগী হওয়া চাই—রবীন্দ্রনাথের 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দের অনেকেই অনুকরণ করে থাকেন—কিন্তু তাঁর phrasal music কেউ ধরতে পারলেন না—সেটা কবির নিজস্ব আত্মার expression—সে ত অনুকরণ করা চলে না। এই কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় কবিতার ছন্দ তার প্রসাধন মাত্র—কবির 'বাণী'ই তাঁর ভাবমূর্তির প্রকৃত পরিচয়।' (পত্র ৪, পৃ. ১১)। 'বাংলা কবিতার ছন্দে'র শেষেও তিনি বলেছেন, "কবিতায় মিলের প্রয়োজন যেমনই থাকুক, মিল—ছন্দের মতন—কবিতার বাহন মাত্র, কবিতা মিলের বাহন নয়। এ জন্য, কবিতা উৎকৃষ্ট হইলে, তাহার সর্বাঙ্গের মত মিলও সুন্দর হইবে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া মিলের কৌশল ও কারিগরি থাকিলেই কবিতা উৎকৃষ্ট হয় না, এমন কি তাহা কবিতা না হইতেও পারে।" মোহিতলাল ছন্দের বাঁধন যেমন সর্বক্ষেত্রে মানেন নি, তেমনি ছন্দের স্বাধীনতা গ্রহণের যথেচ্ছাচারকেও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি উক্ত গ্রন্থে বলেছেন, "কবিরা অনেক সময় মিলের খাতিরে শব্দের বানান ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রয়োজন মত লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। ...বড় কবিদের কবিতায় ইহারই নাম 'আর্যপ্রয়োগ' কিন্তু ছোট কবিদের এত স্বাধীনতা দাবী না করাই ভাল।"

মোহিতলালের পড়াশুনার পরিধি কত ব্যাপক ও গভীর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চিঠিপত্রে। তিনি বিভিন্ন সময়ের চিঠিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে একথা বলেছেন—

"আমি অতি অল্প বয়সে য়ুরোপীয় কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম—জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য—ইংরেজী Elizabethan ও Romantic কাব্য

—আমি মদের মত আকণ্ঠ পান করিয়াছিলাম ; এজন্য সংস্কৃত কাব্য, এমন কি রবীন্দ্রনাথও আমাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে নাই। (পত্র ২৩, পৃ. ৫৮-৫৯)।

"আমি এখন কিছুকাল যাবৎ দার্শনিক গ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থ আলোচনা করিতেছি। সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা যোগ করিতে চাই, তাহাতে বোধ হয় আমার দৃষ্টির কিছু প্রসার ঘটিবে এবং যদি বাঁচিয়া থাকি তবে কিছু উপকার হইবে। (পত্র ২৬, পৃ. ৭০)।

"আমি প্রাচীন বা আধুনিক—দেশী ও বিদেশী এমন উৎকৃষ্ট কাব্যরস নাই, যাহার আস্বাদন করি নাই, সব রসের বৈচিত্র্যই আমাকে মুগ্ধ করে। ইহার উপর, আমি কাব্য-সৃষ্টি ও কবি-প্রতিভা এবং কাব্যকলার যত কিছু তত্ত্ব তাহাও যতটা সাধ্য বুঝিয়া লইবার জন্য রীতিমত অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছি।" (পত্র ৩৫, পৃ. ৯২)।

শুধু পড়লেই হবে না, পড়ার মত করে পড়তে হবে—নিজস্ব মতামত গঠনে পড়াশুনা যেন সহায়তা করে। তিনি বলেছেন, "পড়ার মধ্যেও মনের স্বাধীন বিচরণ চাই—মনের পুষ্টির জন্য পড়া, মনকে শাসন করিবার জন্য নয়। অর্থাৎ নিজের সহজ সংস্কার বা বিশিষ্ট প্রেরণা যেন বাধা না পায়।" (পত্র ৫, পৃ. ১৫)। কিন্তু তাঁর নিজের সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দিয়েছে। একথা পরে আলোচনা করছি।

সাহিত্য বিষয়ক চিঠিতে তিনি কী ধরনের কবিতা লিখতে চান, তার পরিকল্পনা ও ভাববস্তু কেমন হবে তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন ১৮ সংখ্যক পত্রে। 'ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন' অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক পত্রেও তাঁর পরিকল্পনার কথা জানা যায়। সাধারণের রসবোধ জাগ্রত ও মার্জিত করার জন্য আদর্শ সাহিত্য প্রকাশ ভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 'Golden Treasury'র অনুকরণে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা কবি, কাব্যের পরিচয়, আধুনিক গদ্য পরিচয়, সঞ্চয়িতার ভাষ্য রচনা, আধুনিক পদ্ধতিতে Theory of Poetry রচনা ইত্যাদি সুসম্পন্ন করার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা এবং উপযুক্ত প্রকাশনার অভাবে তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নি। এ জন্যে তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না—যাহা লিখিয়াছি তাহাই গ্রন্থাকারে রাখিয়া যাইতে পারিব না, ইহাই দুঃখ, কারণ আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়াই বিশ্বাস করি।" (পত্র ১২, পৃ. ২৯)।

সাহিত্য-পাগল বলতে যা বোঝায় মোহিতলাল ছিলেন তাই, মন-প্রাণ সাহিত্যে সমর্পণ করে তিনি পার্থিব দুঃখ কষ্ট ভুলতে চেয়েছেন, দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনাকে তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি সাহিত্যকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ বা সাধনমার্গ বলিয়া মনে করি। মানুষের প্রাণ মন দেহ ও আত্মার যত কিছু উৎকণ্ঠা সকলই এই সারস্বত সাধনায় নিবৃত্তি লাভ করা চাই।" (পত্র ২৪, পৃ. ৬০)। তাই সাহিত্যকে তিনি ব্যবসায় পরিণত করেন নি—অর্থ প্রাতপত্তির উপায়স্বরূপ করেন নি। তিনি বলেছেন, "সাহিত্যকে লইয়া আর যাহাই করিয়া থাকি প্রতিপত্তির উপায় স্বরূপ তাহাকে ব্যবহার করি নাই—তাহার জন্য বহু নিগ্রহ, বহু অপবাদ ও বন্ধুবিচ্ছেদ অকাতরে সহ্য করিয়াছি—বড়র তোষামোদ করি নাই, বরং অযাচিত আদর উপেক্ষা করিয়া অসন্তোষভাজন হইয়াছি। তাহাতে নিজেদের সামাজিক সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিতে হইয়াছে—সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছি। সাহিত্যিক জীবনে আমি যে সত্যের সাধনা করিয়াছি তাহার শক্তিই আমাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, নিন্দা-প্রশংসা আমাকে বিচলিত করিবে না।" (পত্র ৮, পৃ. ২১)।

মোহিতলালের সাহিত্যবিষয়ক চিঠি পড়তে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীর একটি কথা আমার মনে পড়ে। তিনি কোন একজনকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "অনেকে দেখতে পাই, চিঠি লিখতে বসলেই লিখতে বসেন অর্থাৎ তার ভিতর একটা সাহিত্য পুরে দিতে চান, এতে অবশ্য তাঁদের চিঠিগুলো প্রবন্ধের ছোট ভাই হয়ে ওঠে।" মোহিতলালের চিঠি 'প্রবন্ধের ছোট ভাই' হলেও সেটা ইচ্ছাকৃত নয়—গ্রাহক তাঁর কাছে সাহিত্যের নানা বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব জানতে চান বলেই জবাবে তাঁকেও তা ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, তথ্য ও তত্ত্বের ভারে তা ভারাক্রান্ত হয়েছে কিন্তু পাণ্ডিত্য কোথাও উৎকট ভাবে প্রকাশ পায় নি। চিঠিকে প্রবন্ধে রূপান্তরিত করবেন এ রকম মনোভাব নিয়ে তিনি চিঠি লেখেন নি। চিঠি ও প্রবন্ধের সীমারেখা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁর অজান্তে অনেক ক্ষেত্রে সেটি প্রবন্ধের পর্যায়ে চলে গেছে। বিষয়বস্তুর গম্ভীরতায় তাঁর চিঠি যেমন রসঘন তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত মননের বিচিত্র প্রকাশে সমুজ্জ্বল।

খ. দেশ ও সমাজ (পত্রসংখ্যা ১-১৮)

মোহিতলালের জীবন ও সাহিত্য বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত। বাংলা সাহিত্য বাঙালীর গর্বের সামগ্রী হোক, বাঙালী সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে চিনুক সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার প্রধান কাজ বাংলা সাহিত্যকে কৌলীন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা—আধুনিক বাঙালী সন্তান যেন তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে কোন লজ্জা বা অগৌরব বোধ না করে।" (শিক্ষাদর্শন, পত্র ৪, পৃ. ১৫৮)। সাহিত্যে বাঙালীকে সচেতন করতে গিয়েই দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করেছেন এবং তারই মধ্যে দেশ সেবার প্রেরণা পেয়েছেন। তাই দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষের জন্মগত কয়েকটি ঋণ আছে—পিতৃ ঋণের মত জাতি-ঋণও একটি ঋণ ; জাতির কল্যাণ সাধন করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, যে না করে সে অধার্মিক।" (শিক্ষাদর্শন, পত্র ২, পৃ. ১৫০)। 'বাংলার নবযুগ', 'জয়তু নেতাজী', 'বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে তাঁর ঋণ শোধের ইতিহাস এবং এই তিনটি গ্রন্থ "আমি আমার স্বজাতির চৈতন্য সম্পাদনেব জন্য লিখিয়াছি।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন, পত্র ৫৪, পৃ. ২৪৬)। বাংলা সাহিত্য আলোচনা কালে তিনি বাঙালীকে ভোলেন নি। তিনি বলেছেন, "একদিন জীবন, আর সাহিত্য এ দুটো আমার কাছে এক ছিল—জীবনের যেটুকু স্বাদ, তা আমি সাহিত্য থেকেই পেয়েছিলাম। আজ সেই বাঙালী জাতটাই আমার চোখের সামনে মরে গেল,—বাংলা সাহিত্যে আমার কি কাজ!" (পত্র ১৬, পৃ. ১৪১)। অন্যত্র বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যের অরাজক অবস্থা আমাকে এতই পীড়িত করে যে আমি আজ প্রায় ১৫/১৬ বৎসর নিজের কাব্য চচা ছাড়িয়া বাংলা সাহিত্যের কোষ্ঠী ও দশাবিচার করিতে আমার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছি।" (সাহিত্য-চিন্তা ২৭, পৃ. ৭১)। এই ভাবে তিনি বাঙালী জাতি ও সমাজের আত্মিক অবক্ষয় ও শোচনীয় অধঃপতনের চিত্র একাধিক পত্রে এঁকেছেন।

দেশের সামাজিক সমস্যাগুলির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে দেখেছেন, "আমরা জাতি হিসাবেই চরম অধঃপাতে পৌঁছিয়াছি—মনুষ্যত্ব আমাদের নাই ; ···আমাদের সকল সমস্যার মূল—আমাদের পুরুষেরা পশুর ধাপে নামিয়াছে। ···জগতে আজ সভ্য

মানুষের মহা সঙ্কট উপস্থিত—যে সভ্যতার মূলে স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম উৎকর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সভ্যতা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যপ্ত হইয়া আজ মানুষ-জাতিকে বিনাশের মুখে আনিয়াছে।" (পত্র ১, পৃ. ১০৮)। আর এক পত্রে বলেছেন, "আমাদের দেশে বর্ত্তমানে একটি অতিশয় লক্ষ্যহীন, ধর্মহীন, নেতৃত্বহীন, উপদ্রবের আবহাওয়া মাত্র আছে—সত্যকার যজ্ঞ বা যজ্ঞেশ্বরের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। কেবল উপদ্রব ও উৎপাত, কেবল হাত-পা ছোড়া এবং লক্ষ্যহীন অকর্মের উত্তেজনাই এ পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে।" (পত্র ৩, পৃ. ১১৪-১৫)। এর থেকে প্রতিকারের পথও তিনি নির্দেশ করেছেন—"বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে আমিও সচেতন, কারণ ব্যক্তি-মন সমাজ-মন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যিক জ্ঞান-যোগের দ্বারা এই সকল সমস্যার যে সত্য রূপ উপলব্ধি করা যায়—তাহা প্রতিকারমূলক না হইলেও, তাহার মূল্য খুব বেশী। এই জন্য যাঁহারা সাহিত্যব্রতী বা সাহিত্যিক প্রতিভাশালী তাহাদিগকে জন-কোলাহল হইতে একটু দূরে কতকটা নির্লিপ্ত থাকিতে বলি।" (পত্র ১, পৃ. ১০৭)। নিজের এই সমাধানে তিনি নিজেই বেশী দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি—ক্রমশঃ দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। গান্ধী ও কংগ্রেসকেই তিনি এর জন্য দায়ী করেছেন—

"গান্ধী-কংগ্রেসই বাঙালীর সর্বনাশ করিয়াছে—এখনও করিতেছে।" (পত্র ৬, পৃ. ১২০)।

"আজ এই অবস্থায় ও এই বয়সে আমি আমার দেশ ও জাতির যে আসন্ন নিপাত 'দিব্যচক্ষে' দেখিতে পাইতেছি এবং ইহাও দেখিতেছি যে, একটি বাঙালী কোথাও নাই যে বাংলার কথা ভাবে, শুধু তাহাই নয়, দেশ ও জাতিকে বিকাইয়া দিয়া সকলেই (প্রায় এক জনও বাদ নাই) ঘোরতর স্বার্থসাধনে উন্মত্তের মত রত হইয়াছে; তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এত বড় মিথ্যাচার, এবং এত বড় দেশদ্রোহিতা আমি কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। ...কংগ্রেসের যে মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে এবং দিনে দিন পাইবে এবং আর যে প্রদেশের পক্ষে যেমন হোক, বাংলাকে কংগ্রেস কি করিয়া চোখের উপর হত্যা করিল, তাহা আমি আজ যেমন দেখিতেছি, কাল সকলেই তাহা দেখিবে।" (পত্র ৮, পৃ ১২৪-২৫)।

"আমি বাংলা ও বাঙালীর জন্যই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আমি 'ভারত'-এর ভাবনা ভাবিতে পারিতেছি না—আমার বাংলাদেশ ও বাঙালী

সমাজ যে ধ্বংস পাইল ইহাই ভাবিয়া আমি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি। আমার এই আশঙ্কা মিথ্যা নহে, এই অবস্থা এবং কংগ্রেস পলিটিকস্ যদি জয়ী হয়, তবে বাংলা দেশ বলিয়া কিছু থাকিবে না।" (পত্র ৯, পৃ ১২৭)।

এ সব কথা দেশবাসীর শ্রাব্য হয় নি। 'জয়তু নেতাজী', 'বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থেও তিনি গান্ধী-নীতি ও কংগ্রেসের অসারত্বের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন এবং তা দিয়ে দেখিয়েছেন যে বাংলা দেশের উপর কংগ্রেস গোড়া থেকেই কি ভাবে অবিচার করেছে, দেশবিভাগের পরও তার সেই চেহারার পরিবর্তন হয় নি। স্বাধীনতার পরও বাঙালীর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে, বাঙালীর প্রতি কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার তাঁকে আরও ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। তাই স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হয়েছেন, "আমরা স্বাধীনতা পাইযাছি এ ধারণা আপনারও হইয়াছে দেখিলাম, দুঃখিত হইলাম। ইংরেজ চলিয়া গিযাছে, এটা আপনিও বিশ্বাস করেন? ইংরেজ কি সত্যই গিয়াছে? ছোটবেলায় যাত্রার 'রাবণ বধ' পালায় রাবণ বধ হইল দেখিয়া শিশুমনে কষ্ট হইয়াছিল, পরে দেখিলাম সেই লোকটিই আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। মনটা সুস্থ হইল। ইংরেজ তেমনই মরে নাই, যায় নাই, আসরে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে।" (পত্র ১৫, পৃ ১৪০)।

মোহিতলালের স্বদেশপ্রেম জাতীয়তাবাদের আদর্শে দীপ্ত—তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ভাবেন নি, বাংলাদেশ ও বাঙালীকে গভীর ভাবে ভালবেসেছেন, কারণ তাঁর কাছে 'মানব জাতির চিন্তা আগে নয়, স্বজাতির চিন্তাই আগে।' (জয়তু নেতাজী)। কোন বিশেষ রাজনীতি গ্রহণের জন্য তিনি কাউকে অনুরোধ করেন নি। এমন কি তাঁর মত অন্য কেউ গ্রহণ করুক তাও আশা করেন নি। তিনি শুধু নিজের মতটিকেই জোর দিয়ে বলেছেন আর বলতে চেয়েছেন যে তাঁর বাঙলা ও বাঙালীকে ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ নেই, স্বার্থ নেই। তাঁর এই বাঙালী-প্রীতি এবং প্রীতির বিশ্লেষণ অনেকের ভাল লাগে নি, অনেকে তার অপপ্রচারও করেছে। একটি চিঠিতে এই কথাগুলি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন, "আমি জানি আমার মত ও আমার বিশ্বাস সকলের সমর্থন লাভ করিবে না, কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা ত অন্ততঃ ইহা মনে করিয়া আমাকে সহ্য করিতে পারে যে, আমার ঐ মত ও বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত বা অপ্রীতিকর হোক, আমার প্রাণে কোন পাপ নাই, আমার কোন স্বার্থ নাই, বরং যদি স্বার্থ থাকিত, তবে আমি সম্পূর্ণ একা ঐ অতিশয়

বিপদজনক মত ও বিশ্বাসকে ধরিয়া থাকিতাম না।…আমি আপনার মত পরিবর্তন করিতে বলি না, আমি কেবল আমার হৃদয়ের সততায় বিশ্বাস করিতে বলি।" (পত্র ৮, পৃ. ১২৪-২৫)। দেশকে ভালবাসার বদলে তিনি কিছু চাননি, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু জাতির মঙ্গল চিন্তা করেছেন, "আমি কিন্তু নিজেকেই হত্যা করিয়াছি—দেশের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য। আমার দাম্ভিকতা বা গর্ব বা খাদ যাহা কিছু দোষ থাক—তাহার মূলে 'আমি' 'আমার' নাই। আমার সেই 'আদর্শ' ভ্রান্ত হইতে পারে, আমার সেই কল্যাণ সাধনের চেষ্টা একটা স্পর্ধা হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোন সজ্ঞান স্বার্থ বা মিথ্যাচার নাই।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ৪১, পৃ. ২২৯)।

মোহিতলালের বাঙালী-প্রীতি নিয়ে অনেক সাহিত্যিক কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করেছেন, নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলা ও বাঙালীর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, তাতে মোহিতলাল ক্ষিপ্ত হয়েছেন, "দেশের কাছে আমি কিছুই চাহি নাই। আমি শ্মশানে বসিয়া শিবের আরাধনা করিয়াছি, তাহাতে কোন কামনার কথা নাই, থাকিলে সত্যকে হারাইতাম। শ্মশানে শিয়াল-কুকুর থাকে, তাহারা চিৎকার করে, করিবেই। আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই না। কেবল যখন আমার গুরুকে, আমার সেই শিবকে, সত্যকে অপমান করে তখন মুখে অভিশাপ আসে কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের দুর্বলতা। কিন্তু কাহারও নিকটে যেমন কিছুই চাহিবার ও পাইবার নাই, তেমনি অভিশাপ দিব কাহাকে?" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ৫৪, পৃ. ২৪৭)। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই এক কালে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন সে কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে জড়িয়ে তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তিনি বলেছেন—

"আপনি বিশ্বাস করুন, যাহার সাহিত্যিক প্রতিভা আছে সে-ই আমার পরমাত্মীয়, আমাকে যদি সে ছুরিও মারে, তাহাতেও আমি তাহাকে সাহিত্যিক হিসাবে সমান শ্রদ্ধা করিব।" (পত্র ৮, পৃ. ১২৬)।

"রাজনৈতিক মতামতের যথেষ্ট অমিল থাকতে পারে, সেটা বাইরের ব্যাপার; প্রাণ নয়, বুদ্ধির ক্ষেত্রে। বিষয়ী বুদ্ধি অথবা ধর্মবিশ্বাস এই দুয়েরই কারণে সেখানে অমিল হয়, অন্ততঃ আজকের দিনের বাঙালী সমাজে। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যের উচ্চতর ও উদারতার ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করব না কেন?" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ৩৫, পৃ. ২২০)।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় মোহিতলালের এই আন্তরিকতার মূল্য সাহিত্যিকরা দেন নি। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার সময় অনেকের কাছে লেখার জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলেন কিন্তু অধিকাংশই নিরাশ করেছেন। তিনি গভীর মর্ম-বেদনার সঙ্গে বলেছেন, "সাহিত্যিক হলেই যে 'মানুষ' হবে, এমন কথা নেই—তা জেনেও আমি তাদের ঐ রকমের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম, তার শাস্তিও খুব পেয়েছি। সমাজে, ধর্মে, শিক্ষায় এবং সর্বপ্রকার কার্যে যেমন, তেমনি সাহিত্যেও পলিটিকস্' পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করেছে—জীবনের কোনখানটাতেই আর শুচিতা রইল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্পর্ক—এমন কি আত্মীয় সম্পর্কও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি পারিবারিক সম্পর্কও কলুষিত হয়ে উঠেছে। নিদারুণ অর্থপিপাসা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদনা বাঙালী জাতটাকেই পেয়ে বসেছে, আর কোন চিন্তা তার নেই।" (পত্র ১৮, পৃ. ১৩২-৩৩)। বাঙালী-প্রীতির জন্য তাঁকে জীবনে কম খেসারত দিতে হয় নি। সেই ক্ষতি করার কথাও তিনি কয়েকটি পত্রে বলেছেন, "এ কয় বৎসর আমার মুখ একেবারে উহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন। দেশের কোন সুপ্রচারিত পত্রিকায় আমার একটি লেখাও প্রকাশিত হয় না আমাকে উহারা বয়কট করিয়াছে।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ৪৫, পৃ ২৪৭)।

সাহিত্যে যেমন দুর্নীতি অনাচার যত দেখেছেন তত বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরে রেখেছেন, তেমনি দেশ ও সমাজের অবস্থা যত খারাপের দিকে এগিয়েছে, গান্ধী ও কংগ্রেস বাংলা ও বাঙালীদের বাঁচার পথকে যত ঘোরালো করেছে ততই তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেই পরিত্রাতা রূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি 'জয়তু নেতাজী' গ্রন্থে বলেছেন—

"ধৃতরাষ্ট্রের সভায় শকুনির সহিত পাশাখেলার যে ফলাফল তাহাই ভারতের ভাগ্য মীমাংসা নয়। তাই আজ যখন গান্ধীধর্মী কংগ্রেস একটা মহামিথ্যাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া, সেই স্বাধীনতা সে লাভ করিয়াছে বলিয়া, ধমক ও চীৎকারের দ্বারা সকলকে নিরস্ত্র করিবার আশা করিতেছে, এবং যখন সেই স্বাধীনতার সম্ভাবনামাত্রে চতুর্দিকে মিথ্যা ও খামখেয়ালীর চীৎকার, কবন্ধের নৃত্য প্রভৃতি অশিব দুর্নিমিত্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তখন সারাভারত কাহার পুনরাবির্ভাব প্রত্যাশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে? —নেতাজী, নেতাজী, নেতাজী।" (২য় সং, পৃ. ১০০-১০১)।

দিলীপকুমার রায় সুভাষচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। তিনি 'আমার বন্ধু সুভাষ' ও 'The Subhas I know' গ্রন্থে সুভাষ চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু মোহিতলাল তাঁকে যেমন ভাবে বুঝেছেন তেমন ভাবে দিলীপকুমার বুঝতে পারেন নি। এই পার্থক্যের কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মোহিতলাল বলেছেন, "সুভাষচন্দ্র আপনার বাল্যবন্ধু, আপনার সহিত তাঁহার একটি সাক্ষাৎ-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে-সম্বন্ধ আত্মীয়তার সম্বন্ধও বটে। আমার সহিত তাঁহার সে-সম্বন্ধ ছিল না অথচ আমি অনুভব করি, আমার ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনি আমাকেই তাঁহার আত্মার স্বধর্মী বলিয়া বুঝিতেন. স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব বা শ্রদ্ধা নয়—একেবারে Spiritual kinship।" (সাহিত্য-চিন্তা ৩০, পৃ ৭৮)। সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষ চরিত্রের মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী হয় নি। এদিক দিয়ে 'জয়তু নেতাজী' বিশেষ গুরুত্ব দাবী করতে পারে যদিও এতে আবেগ ও উচ্ছ্বাস বেশী রয়েছে।

গ. শিক্ষা-দর্শন (পত্রসংখ্যা ১-৬)

মোহিতলাল বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন: তাঁর মতে—"আমাদের দেশে আজিও যথার্থ শিক্ষার নীতি বা রীতি প্রবর্তিত হয় নাই, পুরুষরাও শিক্ষিত হয় নাই—নারীরা যে শিক্ষা পাইতেছে তাহা সেই শিক্ষারই একটা কদর্য অনুকরণ। আমার মতে ইহাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। কুশিক্ষিত পুরুষের মত কুশিক্ষিতা নারীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহাই ভয়াবহ। (দেশ ও সমাজ, পত্র ১, পৃ. ১০৯)।

"দেশে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা দুই-ই একটি mockery হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাদের মত পণ্ডিত অধ্যাপকদেরও 'Occupation is gone'। বড় লজ্জার কথা! আমি ভাবি, বিলাতে London Matric-এ ইংরেজি অর্থাৎ মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্য যে পদ্ধতি ও যে আদর্শে পঠিত ও পাঠিত হয়, এখানে ডিগ্রী পরীক্ষাতেও তা অচল! অর্থাৎ স্কুল হইতে কলেজের উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত বাঙালী সন্তান সত্যকার বিদ্যালাভ করিতে না পারে—তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ৪২, পৃ. ১০২-১০৩)।

'জাতীয় জীবনসঙ্কটে' নামক প্রবন্ধে বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশে যে অভিপ্রায় ও যে প্রণালীতে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার ধারণাই অন্যরূপ হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিতে আমরা

বুঝি—চাকুরী লাভ, এবং সেই সঙ্গে জাতি ও সমাজ হইতে পৃথক ও স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের গৌরব, আর্থিক সচ্ছলতা ও শহরের ভদ্র আবহাওয়ায় বাস করিবার মহা সৌভাগ্য—ইহাই শিক্ষা লাভের পরম পুরস্কার।" (বিচিত্র কথা)। সবাইকে এক ছাঁচে ঢেলে যে শিক্ষা-পদ্ধতি চালু আছে তাতে মনুষ্যত্ব-বিকাশের সাধনা নেই। তিনি ঐ প্রবন্ধেরই এক অংশে বলেছেন, "পুথি-গুলিতে যে সকল বাক্য আছে, সেইগুলিকে কোনও রূপে মগজস্থ করিয়া 'পরীক্ষা' নামক যন্ত্রে এক একটা চিহ্নে চিহ্নিত হইতে হইবে। এই ছাপ নিজের মানস চর্মে যে যত গভীর করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে পারে, সে-ই চাকুরীর ক্ষেত্রে তত বেশী উচ্চস্থান লাভের অধিকারী, তাহাব কলরব তত বেশী। যদি ছাপ অনুযায়ী চাকুরী না মিলে, তবে আক্ষেপ ও আক্রোশের সীমা নাই। এই চাকুবীর প্রতিযোগিতার ফলে—জ্ঞাতি, বন্ধু, ধর্ম, সমাজ, সর্বত্র মহা রেষারেষি—মানুষের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া যায়। অর্থোপার্জন বা জীবিকা-সংগ্রহ মানুষ মাত্রেরই জীবনের অতিশয় আবশ্যিক কার্য; কিন্তু শিক্ষা লাভ করা বা মানুষ হওয়া যে তাহারও অপেক্ষা প্রাথমিক প্রয়োজন এবং এই দুইয়ের অনোন্য সাপেক্ষকতা যতই সত্য হউক—আদৌ শিক্ষা যে শিক্ষার জন্যই, সে কথা আমরা বহুদিন ভুলিয়াছি।" এ জন্যে উচ্চ চিন্তা দূরের কথা, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাই আমরা পাইনে, আর যদিও বা কিছু শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে, শিক্ষার দৌলতে চাকরী জুটে যাওয়ার পর পড়াশুনার পাট আমরা চুকিয়ে দি। শিক্ষাটা টাকা রোজগারের উপায় মাত্র—শেখাটা আসল কথা নয়, কিভাবে টাকা রোজগাব করা যেতে পারে সেটাই মোদ্দা কথা। মানুষকে মানুষ বলে মনেই করি না, একটার পর একটা ডিগ্রী বাড়িয়েই চলি—শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বশতঃ নয় শুধু চাকুরী জোটার অপেক্ষায় থাকি। শিক্ষিত লোকের মনের কথাটি টেনে এনে তিনি ধারালো ভাষায় বলেছেন, "আজকাল যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা শেষ করিয়া 'রিসার্চ' নামক তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে আমাদের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বা বিদ্যার প্রতি বিশেষ আসক্তি বাড়িয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের কারণ নাই। উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই সকল ছাত্র অধিকাংশ স্থলে সত্ত অর্থ লাভের আশায়, যত দিন চাকরী না হয় ততদিন, গবেষণা প্রসাদে কিঞ্চিৎ বৃত্তি লাভের লোভে এইরূপ 'তপশ্চর্যা' করিয়া থাকেন। যদি শেষ পর্যন্ত একটা কিছু প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন এবং তাহার ফলে আর একটি উপাধি লাভ ঘটে,

তবে জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন প্রায়ই আর থাকে না—সেই উপাধির সাহায্যে অতঃপর চাকুরীর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। সেই গবেষণা তাঁহাদের জীবনে, অথবা দেশে জ্ঞান-বিস্তারের পক্ষে, আর কোনও ফল প্রসব করে না আজকাল এইরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে—অর্থাৎ চাকুরীর প্রতিযোগিতায়—দেশী মার্কা উমেদারের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে অতঃপর বিদেশ হইতে ছাপা হইয়া না আসিলে সকল বিদ্যা বন্ধ্যা হইবার সম্ভাবনা, তাই দলে দলে বিদেশ যাত্রার ধূম পড়িয়াছে। ইহাই বর্তমান শিক্ষা ও শিক্ষিতের চরম আদর্শ।" (ঐ)। শিক্ষা-সংস্কার করার যে পন্থা দেশের শিক্ষানায়করা ভাবছেন সেটিও বাস্তবসম্মত নয়। ইউরোপীয় আদর্শের ছকে ঢেলে শিক্ষা-সংস্কার করা তাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের চোখ রয়েছে বাইরের দিকে, দেশের প্রয়োজনের দিকে নয়। বড় বড় হর্ম্য তৈরি হচ্ছে মানুষ তৈরি হচ্ছে না, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করা হচ্ছে, গরীবরা যাতে শিক্ষিত হতে না পারে তারই পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এজন্যে মোহিতলাল বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'সহজ সরল ছাপ তাহাতে নাই—মনের কুটিল চিন্তায় তাহা আচ্ছন্ন, প্রাণের সাড়া তাহাতে নাই। শিক্ষানীতি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক বা দলীয় কূটনীতি শিক্ষার নামে স্বার্থ সাধনের সুযোগ পাইতেছে। মুখে বড় বড় কথা কিন্তু আসল লক্ষ্য ভাগাড়ের দিকে। যাহারা গম্ভীরভাবে শিক্ষা সংস্কারের চিন্তা করে তাহারা মাছি-মারা কেরানীর মত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে 'ট্রু কপি' করিতে চায়। কোনও জাতির শিক্ষা পদ্ধতি যে তাহার পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতির—তাহার জীবনযাত্রা প্রণালীর—উপযোগী না হইলে ফলপ্রদ হয় না, সে কথা আমাদের দেশের ময়ূরপুচ্ছধারী বায়স-সমাজ ভুলিয়া যাইতে পারিলেই গৌরব বোধ করেন। এক দেশের পক্ষে যাহা ঔষধ, আর এক দেশের পক্ষে তাহাই বিষ।" (ঐ)। চিঠিপত্রেও এইসব কথার প্রতিধ্বনি আছে, "শিক্ষার যে ব্যবস্থা দেশে কায়েমী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে খাঁটি জাতীয় শিক্ষা বা বাংলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষানীতিই কলুষিত হইয়াছে—ইহার জন্য স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই দায়ী, গাছের গোড়া কাটিয়া এখন আগায় জল দিয়া কি হইবে? . বাঙালী জাতিই শিক্ষার আদর্শ ভুলিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা এখন আর কেহ চায় না—য়ুনিভার্সিটি শিক্ষাকে যেরূপ সস্তা করিয়া দিয়াছে, তাহাতে এখন আর কেহ বেশী মূল্যে সেই শিক্ষা (অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা) লইতে চায় না। ·· বাংলার ছাত্র-ছাত্রীর যাহারা অভিভাবক,

তাহারা একেবারে ধর্মহীন হইয়াছে।" (পত্র, ৩, পৃ. ১৫৪-৫৫)। শিক্ষার এই অধঃপতন কবে থেকে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "১৯০৯ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে New Regulations-এর প্রবর্তন হয় তাহাতেই এ জাতির শিক্ষার সমাধি হয়; তারপর গত generation ধরিয়া বাংলাদেশে শিক্ষা বা সংস্কৃতির কোন বালাই আর নাই। (পত্র ২, পৃ. ১৫৭)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের অন্ত ছিল না। তাঁর মতে, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এত বড় অপবিত্র বিদ্যাস্থান বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই আজ দুই পুরুষ ধরিয়া বাঙালীর বিদ্যা শিক্ষাকে একটা অতিশয় মিথ্যা অধর্ম ও জুয়াচুরীর ব্যাপাব করিয়া রাখিয়াছে। উহার কথা ভাবিলেও আমার মর্মচ্ছেদ হয়।" (পত্র ৬, পৃ. ১৬২)। অনেকেই তাঁর এই ক্ষোভকে অন্য অর্থে ব্যবহার করতেন—তাঁরা বলতেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পাত্তা পান নি বলেই তাঁর অভিযোগ প্রধানতঃ আক্রোশ-মূলক। এই অভিযোগ তিনি নিজেই খণ্ডন করে দিয়েছেন বিভিন্ন চিঠিতে—

"য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধে আমার কোন মোহ নাই—অনেক দিন উহাকে ত্যাগ করিয়াছি। উহা কেবল মেরামত করিলেই হইবে না, উহার ভিত পর্যন্ত বদল করিতে হইবে। ওখানকার পণ্ডিতেরাও তাহা জানে—আমাকে সকলেই বিষ চক্ষে দেখে এবং নানারূপে নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। উহারা জানে না তাহাতে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না, যদি করিতাম তবে এতদিনে আমার কোন পদার্থই থাকিত না।" (ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ৩৭, পৃ ২১৯)।

যাঁরা ছাত্র তৈরি করবেন সেই শিক্ষক সমাজের পড়াশুনার দীনতাও তাঁকে পীড়া দিত। তিনি এক পত্রে বলেছেন, "শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত আছেন যাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী নহেন, তারপর যাঁহারা উচ্চ ডিগ্রী লাভ কবিয়া বাহির হন, তাঁহাদের নিজেদের শিক্ষা প্রায় হয় নাই বলিলেই হয়।" (পত্র ৬, পৃ. ১৬২)।

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন তা-ও তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি বলেছেন, "কলকাতা University-র Honours গোরুর গাড়ীর বোঝা মাত্র উহাতে ভাষা ও সাহিত্য কোনটাই চর্চা হয় না।" (সাহিত্য-চিন্তা ২১, পৃ. ৫২)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকের ত্রুটি বিচ্যুতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এ জাতীয় দু'একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন, "তোমাদের কলকাতা য়ুনিভার্সিটির প্রকাশিত

অতএব অবশ্য পাঠ্য পুস্তকগুলি ছাত্রদের পক্ষে যে কি ভয়াবহ তাহার বহু প্রমাণ পাইতেছি। 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' এইরূপ একখানি পুস্তক। তারপর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমালোচনা দেখিয়া রীতিমত ভয় পাইয়াছি। ছাত্রগণের কথাই নাই, বঙ্কিমচন্দ্রেরও দুরদৃষ্ট এখনও ঘুচিল না।" (সাহিত্য-চিন্তা ১৯, পৃ ১৬)। ছাত্রদের উপযোগী করে তিনি দুটি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। 'কাব্য মঞ্জুষা' ও 'বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি'-র প্রধান লক্ষ্য ছিল পরীক্ষা পাশ করানো নয়, ভাষা ও সাহিত্যের ভিত পোক্ত করা। পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্পর্কে যদিও তাঁর ধারণা ছিল "পাঠ্য পুস্তক রচনায় আমার কিছু মাত্র উৎসাহ নাই বরং উহাতে জাতি নাশ হয় বলিয়াই মনে করি।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ১৬, পৃ. ৩৮)। তবু ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের দুরবস্থার প্রতিকার নিজের সাধ্যমত যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু না করে থাকতে পারেন নি। 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "যখন দেখিলাম মহা মহা ছান্দসিকগণ বাংলা ছন্দ তত্ত্বকে এমন একটি ব্রহ্মতত্ত্বে ঠেলিয়া তুলিয়াছেন যে, বাংলা কবিতার ছন্দময় রসরূপ নিতান্তই অরস—অতএব উহ্য—হইয়া পড়িয়াছে, এবং আরও যখন দেখিলাম, বাংলা সাহিত্যের নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীগণের উপরে সেই ব্রহ্মসূত্র এমনই কঠিন শাসন বিস্তার করিয়াছে যে তাহাদের কানে ও প্রাণে বাংলা কবিতার সাহত বাংলা ছন্দের যোগ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে—তখন একরূপ লোক হিতব্রতের মতই আমাকে এই ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করিতে হইল, কারণ, শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়—শিক্ষকগণেরও আর্তনাদ আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। অতএব, আমি যে খুব প্রসন্নচিত্তে এই কার্য সমাধা করি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" 'কাব্য মঞ্জুষা'-র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "এই পুস্তক বাংলা কাব্য সঞ্চয়ন নয়, ইহাতে কবিতাকে মুখ্য করা হয় নাই, 'কবিতা পাঠ'কেই মুখ্য করা হইয়াছে। বাংলাদেশে শিক্ষা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে, শিক্ষকগুলি প্রায় সকলেই গণ্ডমূর্খ; তাহার ফলে ছাত্রগণের সর্বনাশ হইয়া থাকে। আমি কবিতা-রস নয় কাবতার ভাষা, বিষয়, রচনারীতি ও তৎসংক্রান্ত নানা বিদ্যা বা তত্ত্ব কেমন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়—কবিতার সমালোচনা যত দিক দিয়া করা যায়—তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন তেমন কতকগুলি কবিতা (একেবারে অপাঠ্য বা সৌষ্ঠবহীন নয়) সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে ছাত্রগণের পাঠের বিষয় করিয়া 'পাঠ' শিক্ষা দিয়াছি। ...খুব বড়

-সাহিত্যিক আদর্শ বা বোলপুরী ব্রহ্মবিদ্যার বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া, আমি প্রকৃত শিক্ষার গোড়া বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি।" (পত্র ১, পৃ. ১৪৮)। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কাব্যমঞ্জুষা' প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন, "ছাত্রদের জন্য যে টীকা-টিপ্পনী দিয়াছেন সেগুলি চমৎকার লাগিতেছে—এমনভাবে কবিতায় ছন্দ-পরিচয়, রস-বিশ্লেষণ ও শব্দানুশীলন আর কোথাও আমাদের মাতৃভাষায় দেখি নাই। 'কবি পরিচয়' অংশটিও বিশেষ সুন্দর হইয়াছে··· সংক্ষেপে বিশেষ সরসতার সঙ্গে আলোচ্য কবিদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা কবিতা পড়ান, আপনার 'কবিতা পাঠ' তাহাদিগকে এখনি দিগ্‌দর্শন করাইবে।" (চিঠি, ১৪ ১. ১৯৪৩)।

সমস্ত প্রকার শিক্ষার মূলে তিনি মাতৃভাষা শিক্ষাকেই প্রধান বলে মনে করতেন, অথচ সেই ভাষা শিক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত আলগা। তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "আপনি কয়েকটি ব্যাকরণ দোষ দেখিয়াই এত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ব্যাকরণ দোষ ত কিছুই নয়—ভাষারই জাতিনাশ হইয়াছে। · ভাষার Idiom-ই ভাষার প্রাণ—ভাগীরথী তীরের ভাষায় যে অপূর্ব ইডিয়াম সম্পদ ছিল তাহারই বলে এত শীঘ্র বাংলা ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ সেই Idiom নষ্ট হইয়া যাইতেছে।" (পত্র ২, পৃ. ১৫১-৫২)। 'বাঙালীর ভাষা ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধেও তিনি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "সাহিত্য ভাষার অধীন; ভাষাও একটা জাতির ভাষা। ভাষাকে বাদ দিয়া অর্থাৎ ভাবের বিশিষ্ট রূপটিকে বাদ দিয়া সাহিত্য রসের ধারণা করাও যায় না। ..ভাষা ব্যক্তির নয়; জাতির সমগ্র অতীত জীবন, পরম্পরাগত সাধনা ও সংস্কৃতি যে নিয়মে গড়িয়া উঠে, ভাষাতেও সেই নিয়ম বর্তমান।···ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা জাতির স্বাস্থ্য রক্ষার মতই অত্যাবশ্যক। ভাষার শৈথিল্য শক্তিহীনতার লক্ষণ—ভাষায় অনাচার প্রবেশ করিলে জাতি-ধর্মই লোপ পায়।" (বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি)। কিন্তু ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও যেন গরজ নেই। তাই তিনি গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে বলেছেন, "ভাষাকে রক্ষা কারবার যে সকল উপায় আছে, আমাদের শিক্ষাযন্ত্র সে উপায় কখনও করিবে না—কারণ আমাদের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সেই শিক্ষার সাহায্যে গড়িয়া উঠে নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বাঁচিয়া উঠিয়াছিল—অর্থাৎ 'because of' নয় 'in spite of'। (পত্র ২, পৃ. ১৫২-৫৩)।

ঘ. ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন (পত্রসংখ্যা ১-৫৫)

মোহিতলাল বলতে এমনই এক চরিত্র সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে তাঁর মত অহঙ্কারী, দাম্ভিক, রগচটা, বদমেজাজী লোক আর দুটি নেই। কিন্তু এই পর্যায়ের চিঠিপত্র পাঠ করলে বোঝা যাবে সে ধারণা কত অমূলক— বিচিত্র ধর্মী স্নেহ-ভক্তি-ভালবাসা-শ্রদ্ধা নানা জীবন্ত চিত্র চিঠি-পত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই চিঠিগুলিতে আমাদের পাঁচজনের মতই মোহিতলালকে স্নেহময় পিতা, অকৃত্রিম বন্ধু রূপে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি নিজের মনের গোপনীয় কথা যেমন স্ত্রীকে পুত্রকে কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে লেখা যায় সে রকম চিঠি এখনও পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেলে তাঁর অন্তরঙ্গ হৃদয় মিলনের রহস্যালাপ আরও জানা যেত। তবু এই পর্যায়ের চিঠিতে তাঁর ব্যক্তি মনের আত্মঘোষণা, ব্যর্থতার বেদনা, বন্ধুবিচ্ছেদ, মান অভিমান সব কিছু জড়িয়ে একটি গোটা মানুষের অন্তর্জীবনের বিস্ময়কর তরঙ্গলীলা প্রতিফলিত হয়েছে।

সাহিত্য-সেবাই ছিল মোহিতলালের জীবন-সেবা, জীবন সংগ্রামের কাহিনী তিনি কাউকে বলেন নি। অসাহিত্যিক আবর্জনার বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম করেছিলেন সেই কাহিনীই তাঁর কাছে জীবন-সংগ্রামের কাহিনী ছিল। বিভিন্ন জনকে লিখিত চিঠি পত্রে তার প্রমাণ আছে—

"আমি নিজ জীবনে আমার জ্ঞান-শক্তি মত সারস্বত সাধনা করিয়াছি— যে সাধনায় সরস্বতী ছাড়া কোন ব্যক্তি অথবা নিজেকেও এতটুকু নির্বিচারে সম্মান দিই নাই—অর্থাৎ, আমি সাহিত্যের রস-ব্রহ্মের দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছি। আর সকলকে বিস্মৃত হইবার সাধনা করিয়াছি। লোকে অর্থ-রসে যশোরসে অথবা স্নেহ-রসে বাঁচিয়া থাকে—তোমাদের মত সাহিত্যিক তাহাদের কেহই আমার মত কেবলমাত্র সাহিত্য-রসেই বাঁচিয়া থাকিতে রাজী নহে।" (পত্র ৫, পৃ. ১৭১-৭২)।

"সাহিত্য জিনিষটা আমার কাছে একটি ধর্ম-সাধন—একটা মহাব্রত; হুজুগ, ফ্যাশন বা চা-সিগারেটের মত বৈঠকী নেশা নয়।" (পত্র ৬, পৃ. ১৭৪)। এই সাহিত্য সেবাতেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, "আমার জীবনের কোন সাংসারিক মূল্য নাই—ইহা আমি ভালরূপে বুঝিয়াছি। সামাজিক বা সাংসারিক সম্পর্কে আমার কোন আত্মীয় বা বন্ধু নাই, কারণ আমি সে সাধনা করি নাই। এবারকার জীবনটা 'হরির লুট' করিয়া

দিলাম।" (পত্র ৫২, পৃঃ ১৭৫)। সাহিত্য সেবার খাতিরে আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি, ব্যক্তিগত লাভ লোকসান প্রভৃতিকে তুচ্ছ বলে মনে করতেন, "আমি দেশের ও জাতির জন্য যাহা করিতেছি, তাহাতে কোন ফল লাভের আশা করি না—একান্ত প্রাণের দায়ে এবং ধর্ম ও কর্তব্যবোধে তাহা করিতেছি।" (পত্র ৪৬, পৃ. ২৩৭)। এই কর্তব্য পালনের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন, "আমি একজন সেবক মাত্র—বাংলাদেশে যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সেবক ও অনুরাগী আমি তাঁহাদেরই সেবক। যদি আপনাদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া থাকি, তবে আমার সেই সেবা সার্থক হইয়াছে।" (পত্র ৩৯, পৃ. ২২৬)। শেষে অবস্থা দুর্বিপাকে পুত্র পরিবারসহ বাঁচার স্বার্থে সাধনার ফসলকে অর্থ উপার্জনের কাজে লাগাতে হয়েছে বলে তাঁর প্রচুর মনস্তাপ হয়েছে, "আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে, যে বইগুলি আমার সাধনার ফল, পূজার নির্মাল্য—কোথায় কাদের কাছে কত মূল্যে বিক্রয় করিব—সে চিন্তা অনিবার্য হইয়াছে; ইহাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয়।' (পত্র ১২, পৃ. ১৮৪)।

মোহিতলাল অবিচার অনাচার দেখতে পারতেন না—পান থেকে চুণ খসলেই তিনি চটে যেতেন। হঠাৎ যেমন উত্তপ্ত হতেন তেমনি আবার নরমও হয়ে যেতেন—এটি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের দুর্বলতা ছিল, এই দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। তিনি একটি চিঠিতে এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন, "আমি মানুষটা অতিশয় অচতুর ও বুদ্ধিহীন এবং উত্তেজনাপ্রবণ; এ জন্য বৈষয়িক ব্যাপারে আমি সর্বদাই ঠকিয়া থাকি। ...কিন্তু Hebrew Prophet-দের মত আমার মন একটুও অনাচার বা অন্যায় সহ্য করিতে পারে না, একেবারে আগুনের মত উদ্দীপ্ত হয় এবং অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে চতুর ব্যক্তিদের বড়ই সুবিধা হয়—কারণ সে যে বড় একটা দুর্বলতা, তাহারা বুঝিতে পারে।" (সাহিত্য-চিন্তা ২১, পৃঃ ৫০)। বাংলার বর্তমান অবস্থায় মোহিতলাল দুঃখ পেতেন, সেই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের তিনি বাঙালীর শত্রু বলে গণ্য করতেন, কিন্তু সাধারণ বাঙালীকে তিনি কোন দিন অবজ্ঞার চোখে দেখেন নি, সাধারণকে ভালবেসে তার মধ্যে অসাধারণকেই পূজা করেছেন। অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের বিবরিক লালসার অসংযমে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁদের সত্তাকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি। তিনি বলেছেন, "সাহিত্যিকের প্রতি নির্মম হইলেও আমি 'মানুষের' প্রতি কখনই শ্রদ্ধাহীন হই নাই।" (পত্র ৫৫, পৃ. ২৫৫-৫৬)। মত-

পার্থক্যের দরুন কারুর প্রতিভাকে ছোট করে দেখেন নি। তিনি বলেছেন, "সাহিত্যরুচি বা আদর্শ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পার্থক্য যেমনই থাকুক, আমার একটু এই অভিমান আছে যে, বর্তমান লেখকগণের মধ্যে যেখানে যতখানি প্রতিভা আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত বুঝিয়াছি তাহা আমি অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতে পারি, ইহা আমার একটা বড় অভিমান।" (পত্র ৩৩, পৃ. ২১৪-১৫)। মোহিতলালের ঔদার্যের পরিচয় হল এই।

ব্যক্তি বিশেষের খোশামোদ করা, অহেতুক প্রশংসা করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া মোহিত-চরিত্রের ধাত নয়—স্পষ্টভাষিতা তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ যেমন, তেমনি দোষও, তা করতে গিয়ে অনেক বন্ধু বান্ধবকে হারাতে হয়েছে। মতানৈক্যের দরুন মনোমালিন্য হয়েছে বার বার, তবু অবস্থার বিপাকে তিনি কারও সঙ্গে আপোষ করেন নি। ব্যক্তিচরিত্রের এই বিশেষ গুণটি এই অধ্যায়ের চিঠিগুলির মধ্যে অধিকতর পরিস্ফুট। নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আত্মবিশ্লেষণ করেছেন এই ভাবে, "আমার একটা অহঙ্কার আছে তাহা এই, আমি যশ বা প্রতিপত্তির কাঙাল নই—আমি কাহারও ভক্তি বা প্রশংসাও কামনা করি না।" (পত্র ৫, পৃ ১৭১)।

সম্পাদক হিসেবেও তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "সাহিত্যব্রতটি একেবারে নিঃস্বার্থ হওয়া চাই। কঠিন অপ্রিয় উক্তি বা সমালোচনা আমি পছন্দই করি কিন্তু আদর্শনিষ্ঠা চাই, আন্তরিকতা চাই। সাহিত্যের মর্যাদা প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে—কিন্তু সাহিত্যিকের নয়। ·· দলের বিরুদ্ধে দল পাকাবার জন্য বড়র তোষামোদ এবং ছোটর লাঞ্ছনা যেন policy হয়ে না দাঁড়ায়" (পত্র ৪, পৃ. ১৭০)। 'বঙ্গ দর্শন' ও 'বঙ্গ ভারতী' সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি নিজেও এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। নানারূপ প্রতিকূল ঝড় ঝাপটাতেও তিনি আপন অন্তরের আদর্শের শিখাটিকে অনির্বাণ রেখে অবিচলিত পথে চলেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা করার বহু ঝামেলার কথা এই অধ্যায়ের অনেকগুলি চিঠিতে পাওয়া যাবে। হুজুগে পড়ে কিংবা ফ্যাশনের বশবর্তী হয়ে পত্রিকা বের করার বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন। সাধনা ও আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা না থাকলে পত্রিকা বের করে ফল নেই; তরুণদের এই ধরনের জ্যাঠামি তাঁর ভাল লাগত না। এই বিষয়ে ৬ সংখ্যক চিঠি পাঠ করলে তাঁর মনোভাব বোঝা যায়।

সাহিত্যে কেউ যদি প্রতিষ্ঠা যশঃ অর্থ পেয়েছেন তাতে মোহিতলাল খুশী হয়েছেন—সংকীর্ণ চিত্ত নন বলেই তাঁর পক্ষে খুশী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। যেমন বনফুল সাহিত্য করে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন সে সংবাদে তিনি খুশী হয়ে চিঠি লিখেছিলেন, "সুস্থ ও সবল জীবনচর্যার সহিত সাহিত্যসেবার অকৃত্রিম নিষ্ঠা থাকিলে যাহা হয়, আপনার তাহাই হইয়াছে। আমি জীবন ও সাহিত্যকে এক করিয়া দেখি বলিয়াই আপনার জীবনে তাহার প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি, আমার আনন্দের ইহাও একটা কারণ।" (পত্র ৩০, পৃ ২০৮)।

তাঁর চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব যে, তার শিষ্য ছাত্র অনুরাগী যদি কিছু প্রণামী পাঠাতেন তাতে তিনি সংকুচিত হতেন, ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি তাঁকে শ্রদ্ধা করত তাতেও তিনি খুশী হতেন না। কয়েকটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

"আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা ভক্তির কথা বার বার লিখিয়াছ তাহা যদি আমার প্রতি না হইয়া তোমাদের অন্তরের সত্য ও সুন্দরের প্রতি হয়, তবেই তাহা আমার প্রতিও সত্যকার ভক্তি হইতে পারিবে। আমার ব্যক্তিগত আমিটিকে বড় করিও না, আমার ভিতরে যদি কোন আত্মার প্রকাশ দেখিয়া থাক, তবে তাহাকেই প্রণাম করিবে কারণ সেই 'আত্মা' তোমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন।" (পত্র ১১, পৃ ১৮২-৮৩)।

"আমাকে ভালবাসিবার প্রয়োজন নাই, আমার ঠাকুরকে যিনি ভালবাসেন তিনিই আমার আত্মীয়।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ২, পৃ. ৬)।

শিষ্য-ছাত্রদের তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন—তাদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের মধ্যেই সেই অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, "আমার নিজের ছেলেরা মানুষ হইল না—হইবে বলিয়াও মনে হয় না, তোমরাই আমার পুত্র স্থানীয়; আমার দেহজ সন্তান আমার কোন কাজে লাগিবে না—যাহারা Spiritual সন্ততি—ছাত্র এবং শিষ্য ও ভক্তগণ—তাহারাই আমার ভাবজীবনের ধারা রক্ষা করিবে, এই আশা করি।" (পত্র ২২, পৃ ১৯-৯৫)।

মোহিতলালের বিরুদ্ধে অনেকেই একক কিংবা দল বেঁধে আক্রমণ করেছেন কিন্তু মোহিতলাল তার মোকাবিলা একা করেছেন। দল তৈরি করে দলপতি হবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না, প্রখর শিল্পবোধ ও রস-চেতনা এ পথ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে, একে তিনি শক্তির অপব্যয় বলে মনে করেছেন, তাতে তাঁর

ক্ষতি হয়েছে, সাধারণের কাছে হীন প্রতিপন্ন হয়েছেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেন নি—বনে একা সিংহের মত বিচরণ করেছেন, সঙ্গে চাটুকার কেউ-এর দল জোটান নি। তিনি তাঁর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন একটি পত্রে—"নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই আমাকে 'কাবু' করে না—তাই এ-পর্যন্ত আমি অন্তরের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছি—ধর্মনাশ হয় নাই। নতুবা দেখিতে আমি এতদিনে একটা মস্তবড দলপতি বা দিকপাল হইয়া রবি ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতাম—প্রতিভায় নয় শিষ্য-সম্পদে, কিন্তু আমার এমনই দুর্বুদ্ধি আমি কোন propaganda করিলাম না। এ যে কত বড় অপরাধ তাহা জানি; সেই জন্য আমাকে শাস্তিও কম ভোগ করিতে হইতেছে না—আমার বই ছাপিবার publisher নাই।" (পত্র ৫, পৃ ১৭২)। অক্ষয়কুমার সেন শর্মা, মানিকচন্দ্র দাশকে লিখিত চিঠিতে (১৯, ২২, ২৫) তিনি যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর নিজের চরিত্রেরই প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায়। তিনি যা ভাবতেন বা করতে অন্যকে বলতেন তিনি নিজের জীবনেও তাই করতেন এবং সেই অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করতেন।

মোহিতলালের চিঠিপত্র থেকে আরও একটি বিষয় জানতে পারি যে, তিনি একজন বাগান বিলাসী ছিলেন। ঢাকার রমনায় গোলাপ চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বাগান তাঁর দেখার মত ছিল। শেষ জীবনে যে বাড়ীতে ছিলেন সেখানে স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য ফুলের বাগান করতে না পারলেও ফুল তার প্রিয় ছিল। বাড়ীওয়ালার লাগানো কামিনী জুঁই বাতাবী ফুলের গন্ধে যখন চারদিক সুরভিত করে রাখত তখন মোহিতলাল পূর্ণিমার রাত্রে একা একা খোলা ছাদে কিংবা ঘাসের ওপর অনেক রাত পযন্ত হাঁটতেন।

শেষ জীবনে তাঁর বন্ধু বান্ধব বলতে তেমন কেউ ছিল না—তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। চেনা পরিচিত বন্ধু বান্ধবদেব কাছ থেকে তিনি দূরে থাকতেন, পরিচিতজনরাও তাঁর সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য সভা-সমিতি পরিহার করে চলতেন, শেষের দিকে সভা-সমিতিও তাঁকে বর্জন করেছিল, তবে নানা সূত্রে প্রত্যেকের খবরাখবর নেওয়া তাঁর নিত্যকার অভ্যাস ছিল। 'ভারতী' যুগের হেমেন্দ্র-কুমার রায়, জীবনকালী রায়, 'কল্লোল' যুগের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁদের লিখিত প্রতিটি চিঠি পড়লে মোহিতলালের বন্ধু-প্রীতির কথা জানতে পারা যায়। পরে বিভূতিভূষণ

মুখোপাধ্যায়, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের মধ্যে শারীরিক স্বাস্থ্যের উদ্বেগ প্রকাশ, নিজের বাসায় সাহিত্য-মজলিশে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানর মধ্যে বন্ধুবৎসল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরোনো বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ তাঁকে শোকাতুর করে তুলেছে, যেমন, "বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিলে, অনেক বিয়োগদুঃখই পাইতে হয়, এখন তো একে একে বিদায়ের পালা—ভাঙ্গা আসর ক্রমে শূন্য হইয়া আসিতেছে, সকলেই উঠিয়া গেল, আমার ডাক পড়িয়াছে, তবুও আরও কয়দিন হয়তো বসিয়া থাকিতে হইবে। এই বিদায়ের সুর বড়ই বেদনাময়।" (পত্র ৪৭, পৃ ২৩৯-৪০)। তবে এ কথা ঠিক তাঁর মানসিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বন্ধু হওয়ার মত উপযুক্ত লোকের একান্ত অভাব ছিল, কারণ তাঁর মধ্যে একটা দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব ছিল যাকে ভেদ করা যেমন কঠিন তেমনি তাঁর পক্ষেও ঐ স্তর অতিক্রম করে মজলিশী হয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকর ছিল। ফলে তিনি একাই কথা বলে যেতেন আর সবাই তাঁর কথা শুনে যেত। ঢাকা, বড়িশায় সাহিত্য-মজলিশ মাঝে মাঝে করতেন—তাতে সহজ হবার চেষ্টা করেছেন, সবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন কিন্তু পারেন নি; তাঁর স্বভাবের দোষই বাধাস্বরূপ ছিল। জীবনকালী রায়কে লিখিত চিঠিতে অন্তরঙ্গ হবার আকুলতা অনুভব করতে পারি। তিনি লিখেছিলেন, "আপনি লিখিয়াছেন, আপনাতে আমাতে সত্যই অনেক তফাৎ—আপনি সাধারণ মানুষ, আমি অসাধারণ। কিন্তু আমি যদি আপনার মত সাধারণ হইতাম, তবে আমার ব্যক্তিজীবন ধন্য হইত, নিজেকে পুণ্যবান মনে করিতাম। দেখুন, গয়াধামে গয়াসুর হরিপাদপদ্ম ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু গয়াসুরের উদ্ধার নাই।" (পত্র ৪৬, পৃ. ২৩৮) এই যে-মোহিতলাল সহজ হতে গিয়েও সহজ হতে পারেন নি তার কারণ হল তিনি উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। উনিশ শতকের মনীষীদের জীবনের আদর্শে নিজের মানসিক জীবন গঠন করেছিলেন সে জন্যে তিনি বলেছেন, "আমি একালের লোক নই।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ৪, পৃ. ১৩)। তিনি একটি প্রবন্ধেও এই কথা বলেছেন, "উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নূতনতর আদর্শে দীক্ষিত ও প্রভাবিত হইলেও, আমার চিত্ত সেই পিতৃ পিতামহগণের মহিমা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হয়।" (জাতির জীবন ও সাহিত্য: বিবিধ কথা)। জাগতিক পরিস্থিতির চাপে বাংলার অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়েছে—এই পরিবর্তন তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সর্বদা তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশকে

ধ্যান করতেন—ধ্যান ভঙ্গ হলে চারদিকের বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত বাংলাদেশের চেহারা দেখে আঁতকে উঠতেন। তাই তিনি চিঠি পত্রে লিখতেন শ্মশানে বসে শব সাধনা করছেন।

শেষ জীবন তাঁর আর্থিক দুঃখ কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। সৌভাগ্যের আয়নায় তিনি কখনও মুখ দেখেন নি। তার ওপর বাংলা ও বাঙালীর দুর্দশায় তাঁর মানসিক শান্তি পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছে। 'শনিবারের চিঠি'-র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ তাঁর মনোবেদনার আরও একটি কারণ। সজনী-কান্ত ও 'শনিবারের চিঠি'র যেমন প্রশংসা একাধিক পত্রে (২, ২৪) আছে তেমনি সেই পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন আকারে বিভিন্ন জনকে লিখিত পত্রে (৩০, ৩৬, ৪১) পাওয়া যায়। তাঁর লেখা অন্য কোন পত্র-পত্রিকা ছাপাত না বলে 'বঙ্গদর্শন' 'বঙ্গভারতী' কাগজ বের করেন—এ জন্যেও তাঁকে কম ঝামেলা পোহাতে হয় নি। নিশ্চিত আয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই লেখার উপর জীবিকা নির্ভর করতে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আর কোথাও চাকরী জোটে নি তাঁর—মাঝে একবার বঙ্গবাসী কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগে কিছু দিন অধ্যাপনা করেছিলেন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দুঃখ দারিদ্র্য বেদনার কথা তাঁর চিঠি পত্রের মধ্যে রয়েছে। প্রকাশকেরা তাঁকে ঠকিয়েছে—প্রাপ্য টাকা অনেক সময় দেয় নি। বই ছাপতে নিয়ে ফেলে রেখেছে দীর্ঘ দিন। প্রকাশক সম্পর্কে তাঁর ধারণা, "উহারা সংঘবদ্ধ ভাবে বাঙালী লেখক ও গ্রাহককে শিকার করিয়া বেড়ায়; আমার বন্ধু, শিষ্য, ছাত্র কেহই ঐ পাপ হইতে মুক্ত নয়। আমি উহাদের খুব ভালভাবে চিনি।" (পত্র ৩৭, পৃ ২২৪)। প্রকাশকদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর নিজেরই প্রকাশনা খোলার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাধ যত ছিল সাধ্য তত ছিল না। জীবনে ব্যথা বেদনা দুঃখ প্রচুর পেয়েছেন, একাধিক পুত্রের মৃত্যু তাঁকে আঘাত দিয়েছে তবু বিচলিত হন নি, সবকিছু নিজ সাধনার প্রাপ্য বলে মনে করেছেন, কিছু পান নি বলে উদ্বাহু হয়ে হা-হুতাশ করেন নি। তিনি জানতেন, "মানুষের জীবনের যে কণাটুকু সত্য, তাহার স্বত্বাধিকারী ভগবান—মানুষ নয়; যাহা ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা তাহা মানুষের নিজের। যদি সেই সত্যের এক কণাও আমার জীবনের সাধনায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতেই আমি ধন্য, কারণ, সেই পূর্ণের পদপরশ' তাহাতে পড়িয়াছে। ...আমার নিজের লাভালাভ চিন্তা আমি কখনও করি

নাই—এমনকি নামটা আমি অনেক সময় গোপন করিয়াছি। আজ সেই নামের জন্য—অর্থ বা যশের জন্য ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন?" (পত্র ২২, পৃ ১৯৫)।

ঙ বিবিধ [পত্রসংখ্যা ১-৭১]

বিবিধ পর্যায়ের চিঠিগুলিতে জীবনের বিচিত্র তথ্য জানতে পারি; হৃদয়বত্তার বিশেষ স্পর্শও পাওয়া যাবে কোন কোন জায়গায়। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে পত্র লেন-দেন, শিষ্য ছাত্রদের সংবাদ, রবীন্দ্র-পুরস্কারের বিচারপদ্ধতি ও সভা-সমিতির আমন্ত্রণ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের চিঠিগুলি 'বিবিধ' পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। এই চিঠিগুলিতে সাহিত্যিক তাৎপর্য কিছু নেই, তবে ব্যক্তি মোহিতলালের পরিচয় পাওয়া যায়।

নিয়মিত পত্র লিখতে ও চিঠি পেতে তিনি ভালবাসতেন। চিঠি পত্রের জবাব তিনি সবাইকে দিয়েছেন। সাহিত্য-চেতনা যার মধ্যে একটু দেখতে পেয়েছেন তাকেই তিনি আত্মীয় করেছেন, "আমার সহিত পত্রব্যবহার করিলে আমি সুখী হইব—যাহার মধ্যে সত্যকার সাহিত্যচেতনা জাগ্রত হইয়াছে—যিনি সত্যকার সাহিত্যকে ভালবাসেন, যিনি সত্যসুন্দরকে সাক্ষাৎ করিয়া হৃদয়ে উদারতা লাভ করিয়াছেন, অথচ যাহা কিছু ক্ষুদ্র, মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণ তাহার উপর যিনি খড়্গহস্ত তিনিই আমার বন্ধু।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ২, পৃ. ৬)। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত শিষ্য, অনুরাগী প্রিয়জনদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত পত্রালাপ করতেন।

তিন

চিঠি-পত্রে ব্যক্তি মোহিতলালের সদর্থক দিকটির কথা এতক্ষণ বলা হল, ব্যক্তি হিসেবে তাঁর দোষত্রুটি দুর্বলতার চিত্রও চিঠি-পত্রের মধ্যেই পাই। মোহিতলালের একটা অহং অর্থাৎ Ego ছিল যে তিনি যা করেছেন তা ভালব জন্য—তাতে ত্রুটি আছে কি নেই, অপরের ভাল হচ্ছে কি হচ্ছে না তলিয়ে তিনি দেখেন নি। দেশ ও সমাজকে জাগ্রত করার জন্য, বাংলা ও বাঙালীর হিতের জন্য তিনি যা ভেবেছিলেন, যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পালিত হচ্ছে না দেখে তাঁর অহং তাঁকে উত্তেজিত করেছে। তাঁর আত্মপ্রত্যয় তাঁর আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়েছে। তিনি অন্যকে ১৯২৩ সালে অহং থেকে মুক্ত

হবার উপদেশ দিয়েছিলেন, "মন যত মার্জিত হইবে ততই 'অহং' বৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইবে—বাস্তব হইতে দূরে গিয়া আপনার জগতে একচ্ছত্র অধিপতি হইবে—আপনাকেই সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিবে—এক অর্থে সকল সংস্কার ত্যাগ করিয়া উদার হইবে বটে, কিন্তু আসলে সেটি 'অহং'-এর দাসত্ব বই আর কিছুই নয়—সে দাসত্ব এমন দাসত্ব যে বুঝাতেও পারবে না কোথায় সে বদ্ধ ও অধীন হইয়া আছে। মুক্তি হয় প্রাণের প্রসারে, মনের পরিমার্জনায় নয়।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ৩, পৃ. ৮)। অপরকে সতর্ক করতে গিয়ে মোহিতলাল অজ্ঞাতসারে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন, পড়াশুনা প্রচুর করেছেন কিন্তু প্রাণের প্রসারের পরিবর্তে ক্রমশঃ আরও সংকুচিত হয়ে পড়েছেন।

আগেই বলেছি মোহিতলাল ছিলেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ। এই আত্মপ্রত্যয় অনেক ক্ষেত্রে দম্ভে পর্যবসিত হয়েছে তা তাঁর চিঠি থেকে পাই; যেমন, "আমার কাব্যের সমালোচনা আমি ছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমাজে আর কেহ করিবার নাই।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ৩২, পৃ. ৮২)। এই অহমিকার সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা, অন্ধতা, অনুদারতা, স্ববিরোধিতাও এসেছে। এক পত্রে তিনি লিখেছেন, "চিত্তকে মুক্ত রাখিও, জ্ঞানকে কখনও গণ্ডিবদ্ধ করিও না—সরস্বতীর সাধনায় বিশ্বরূপের রস সন্ধান করিও।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ১৪, পৃ ৪৫)। আর তিনিই বলেছেন, "ওসব পড়িও না, পড়িলেও উহাদের মতামত কিছুমাত্র মূল্যবান মনে করিও না।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ২১. পৃ. ৫২)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অতবড় অপবিত্র বিদ্যাস্থান বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই।" (শিক্ষা-দর্শন, পত্র ৬, পৃ. ১৬২)। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত সম্মানে গর্বিত হয়েছেন, "আমি সাহিত্যের শুধুই সমালোচক নই—উচ্চতম ক্লাসের ছাত্রগণের অধ্যাপক, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের P. R. S. ও Ph D. প্রভৃতি পরীক্ষার পরীক্ষক, ইহাই আপনাকে মনে রাখিতে বলি।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র, ৩৭, পৃ. ৯৫)। ভাষায় শুদ্ধতা রক্ষার বিষয়ে তাঁর সংগ্রামের কথা বলেছি অথচ তিনিই তাঁর চিঠি পত্রে সাধু চলিত ক্রিয়ার গুরু চণ্ডাল মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লিখেছিলেন, "আমি প্রাচীন বা আধুনিক—দেশী ও বিদেশী এমন উৎকৃষ্ট কাব্যরস নাই, যাহার আস্বাদন করি নাই।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ৩৫, পৃ. ৯২)। অথচ তাঁর বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়নের

পরিধি শোলোকোভ ও মমের কোন কোন লেখার মধ্যে সীমায়িত ছিল। আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না বলে মনে হয়, থাকলে গদ্য কবিতা সম্পর্কে ছেলেমানুষী মন্তব্য করতে পারতেন না, আর রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'-র পর আর ভাল কবিতা লিখতে পারেন নি এ জাতীয় মন্তব্যও আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। তিনি বলেছেন, "যাহারা গদ্য কবিতার পক্ষপাতী তাহারা লেখক হিসাবে কবি নয় এবং পাঠক হিসাবে বাংলা দেশের গ্র্যাজুয়েট, অধ্যাপক এবং পূর্বদেশীয় অতিশিক্ষিত, অতিনব্য হঠাৎ নব্যরসিকের দল।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ১৫, পৃ. ৩৭)।

একবার যে তথ্য বা তত্ত্ব তাঁর মনে দাগ কেটেছে সেটিই তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে রেখেছে। সংকীর্ণতা ও অন্ধতার জন্ম এর থেকেই। সেজন্য 'পরিচয়', 'সবুজ পত্র' বাংলা সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা মোহিতলাল অনুধাবন করতে পারেন নি আর 'মাষ্টারী মনোভাব' তাঁর সমগ্র চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'কেউ কিছু জানে না, সবাইকে তিনি শেখাতে পারেন' এই জাতীয় অহং তাঁর বিপত্তি ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে তিনি মাঝে মাঝে নিদারুণ অবিচার করেছেন যা পড়লে তাঁর প্রতি করুণার উদ্রেক করে, ঈর্ষা, রোষ, গোঁড়ামি তাঁকে এত দূর গ্রাস করেছে যে, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। যেমন, "রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সে বাংলা ভাষা, বাংলা বানান ও বাংলা ছন্দ—এই তিনের বাপান্ত শ্রাদ্ধ করিয়া তবে নিজেও মরিবেন এবং বাঙালীকেও মারিবেন।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ১৫, পৃ. ৩৭)। অথবা "কবি রবীন্দ্রনাথের খেলার ঘর, সাধন-কক্ষ, বসন্ত বাটিকা, পূজার ঘর, অধ্যাপনা-গৃহ, নৃত্যশালা, ব্যাধিমন্দির —বাংলা সাহিত্যে এই সকলই দেখিয়াছি, কিন্তু 'ল্যাভেটরী'-ও যে দেখিতে হইবে তাহা কল্পনা করি নাই।" (দেশ ও সমাজ, পত্র ২, পৃ ১১২)।

চার

বাংলা পত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে মোটামুটি তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। [১] চিঠিতে নিজেকে অসঙ্কোচে উন্মুক্ত করে দেওয়া, [২] নিজের ব্যক্তিত্বকে আড়াল করে প্রয়োজনীয় বিষয়ের উত্তর দেওয়া, [৩] চিঠিতে নিজেকে সচেতন ও সতর্কতার সঙ্গে প্রকাশ করা যেন সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পত্র লেখা। উদাহরণ চাইলে বলব প্রথম ধারার লেখক মধুসূদন, দ্বিতীয় ধারার

বঙ্কিমচন্দ্র, তৃতীয় ধারার রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র রচনায় মোহিতলাল মধুসূদনের উত্তরসাধক—উভয়ের পত্রেই আন্তরিক ব্যক্তিমুখীনতার উষ্ণ স্পর্শ পাওয়া যায়, কোন কালে তাঁদের চিঠি ছাপা হবে এই ভয়ে তাঁরা মনের রাশ টেনে রাখেন নি।

মোহিতলাল চিঠি-পত্রে কিছুমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করেন নি (বরং সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমাকেই সাবধান হতে হয়েছে, এমন অনেক কথা আছে যা দেশ কালের বিচারে বর্তমানে প্রকাশযোগ্য নয়) রবীন্দ্রনাথ যেমন চিঠি-পত্রে অতিমাত্রায় সচেতন, যাতে কোন গোপনতম দিক প্রকাশিত হয়ে না পড়ে। তিনি প্রথম দিকে অর্থাৎ ভানু সিংহের পত্রাবলী, চিঠি-পত্রের প্রথম খণ্ডে স্ত্রীকে লেখা পত্রগুলিতে, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত কয়েকটি পত্রে এবং 'ছিন্ন পত্রের' কয়েকটি চিঠিতে নিজেকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর খ্যাতি তাঁকে আত্মপ্রকাশে বাধা দিয়েছে। তিনি আর সহজ হননি, অত্যন্ত সতর্ক, অতিমাত্রায় সম্বৃত, সাহিত্যিক পোশাকে চিঠিকে জড়িয়ে দিয়েছেন, মূল মানুষটি ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। মোহিতলাল তাঁর রচনায় যেমন, পত্রেও তেমনি—সর্বত্র খোলা, পত্র ও প্রবন্ধ তাঁর কাছে co-related। রেগে গেলে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যেমন উষ্মা প্রকাশ করতেন চিঠিতেও তেমনি তাঁর ঝাঁঝ আছে। তিনি তাঁর এক পত্রে উল্লেখ করেছেন, "প্রাণ থাকিলেই উচ্ছ্বাস অবশ্যম্ভাবী—আপনার প্রাণ সকলের কাছে মুক্ত করিতে পারেন না বলিয়াই যেখানে আপনার বশে মুক্ত হয় সেখানে একটু অসংযম স্বাভাবিক। এই অসংযম আমার খুব বেশী। আমি কিছুই রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিতে পারি না, সৌজন্য ও লোকব্যবহারের নিয়ম আমি কখনও পালন করিতে পারি না, সেজন্য সকলের সহিত মিশিতে গিয়া অবশেষে প্রতিহত হইয়া আপনার মধ্যে আপনি রুদ্ধ হইয়া থাকি।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ৩, পৃ. ৭)। রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে মোহিতলালের চিঠির প্রধান প্রভেদ হচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের চিঠি যেন 'সুরচিত কাব্য কথা' বাগবৈদগ্ধগুণে তাঁর চিঠি অতুলনীয় আর মোহিতলাল তাঁর চিঠিতে মনন সমৃদ্ধ বক্তব্য সরলীকৃত করেন। মধুসূদনের চিঠি মননধর্মী নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের উচ্ছলতা চিঠির মধ্যে নেচে চলেছে আর মোহিতলালের গম্ভীর ব্যক্তিত্ব চিঠির মধ্যে ধ্রুপদরাগে গান গেয়েছে, তবে উভয়েই অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসে সাহসী। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে কী লিখবেন, বিষয় থেকে কেমন করে বক্তব্য কবিত্বময় ভাষায় সৌকর্যমণ্ডিত করবেন সেটিই মুখ্য হয়ে

দাঁড়িয়েছে, ফলে প্রাপকের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ ততটা নিকটতর না যতটা নিভৃতে নিজের মনের সঙ্গে মনের আলাপ করেছেন। মোহিতলালের বেলায় চিঠিতে কী লেখা হবে সে বিষয়টাই মুখ্য, প্রাপকের চিঠি পাশে রেখে তিনি জবাব দিতেন. সেজন্য যা লেখা হবে তা যেন পত্রপ্রাপকের সোজাসুজি মর্ম স্পর্শ করতে পারে, তার মধ্যে যেন ভাষার মারপ্যাঁচ কিছু না থাকে, সরল সুস্পষ্ট থাকে, তার মন দিয়ে তাকে বুঝেছেন। মোহিতলালের চিঠির এই নিভূর্ষণ সবলীকৃত ব্যক্তিত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই বাংলা সাহিত্যের পত্র-লেখকদের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্টতম করেছে। ভাষাকে তিনি করুণ পেলব লালিত্যময় করেন নি, ভাষাকে তিনি রুক্ষ তেজোময়, গতিশীল, করেছেন, প্রবন্ধ রচনার ভাষা ও ভঙ্গী চিঠি রচনাতেও এসেছে। গোড়া থেকেই তিনি সাধু ভাষায় সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকাশ ভঙ্গীতে চিঠি লিখেছেন কদাচিৎ চলতি ভাষা প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি চিঠিপত্রকে কবিতা করে তোলেন নি, তবে তাঁর কবি-মন চিঠি পত্রের মধ্যেও উঁকি দিয়েছে। মাঝে মাঝে শুষ্ক কথাকে রসিয়ে তিনি বলতে পারেন, পত্র রচনার শিল্প রীতিও তাঁর আয়ত্তে ছিল। যেমন—"বেলা পড়িয়া আসিতেছে, আমার জীবন-প্রাঙ্গণে গোধূলির ছায়া যেন রেখান্বিত হইয়া উঠিতেছে, কানে যেন নিষ্ফলতার বিদায়সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছি। আর কিছু দিন আগে আসিলে বোধ হয় হাতখানিতে গোপনে কিছু দিবার মত পাইতাম. আজ বসন্তশেষে কেবল শুষ্ক কথার ঝরা ফুল পড়িয়া আছে।" (সাহিত্য-চিন্তা, পত্র ৩, পৃ ৯)। অনেকেই তাঁর চিঠির রচনা রীতি প্রবন্ধধর্মিতার জন্য পত্র সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলতে দোমনা করবেন কারণ মোহিতলালের চিঠিতে 'ভারহীন সহজের রস' নেই বললেই চলে। তবে শশিভূষণ দাশগুপ্ত পত্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছিলেন, "পত্র লেখার রীতি কি? গুরু গম্ভীর চাল, না সালঙ্কার ও সাড়ম্বর ভাষা,—না সুচতুর বাক্যবিন্যাস? ইহার কিছুই নহে। নিজেকে একেবারে একটা রক্ত মাংসের গোটা মানুষরূপে প্রকাশ করা। (রচনাসাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণ: বাংলা সাহিত্যের একদিক। মোহিতলাল তাঁর চিঠিতে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। সচেতন ভাবে চিঠিকে সাহিত্যের পর্যায়ে তিনি না তুলে অকৃত্রিমভাবে নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন বলে লেখক ও প্রাপকের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তেমনি কান পেতে রাখলে তাঁর চিঠি-পত্রে একটি জীবন্ত মানুষের বিচিত্র হৃদয়স্পন্দন শোনা যায়। তাঁর চিঠিতে কবি ও ব্যক্তির মধ্যে কোন তফাৎ নেই যেমন নেই মধুসূদনের চিঠিতে, কিন্তু তাঁর সব চিঠি ইংরেজিতে লেখা। বাংলা পত্র-সাহিত্যে জীবন ও সাহিত্য সমাহারের একক উদাহরণ মোহিতলাল যাঁর জীবন ছিল সাহিত্যময় আর সাহিত্য ছিল জীবনময়।

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল

রবীন্দ্রযুগের শক্তিমান কবিদের মধ্যে মোহিতলাল একজন—যিনি শিল্পের অভিজ্ঞানে তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে উভয় দিক থেকেই স্বতন্ত্র। হুজুগপ্রিয়তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে, বাস্তবজগতের সব যন্ত্রণা থেকে, সব মতবাদ থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্যাদিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে কোনো বিশেষসূত্রে জীবনের ব্যাখ্যান বা বিশ্লেষণ না করে অন্তর্ভেদী কবিদৃষ্টি নিয়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করে শিল্পীর সাধনায় তাকে রূপায়িত করে তুলেছেন, চঞ্চল জীবন-স্রোতের মধ্যে সাহিত্যে নিত্যকালের ব্যঞ্জনাকেই গ্রহণ ক'রে সঙ্গতিবোধ ও রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে এমন একটি মর্যাদাময় ভঙ্গীকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যেখানে চিরকালের পাঠক-মন রস-উপভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে।

বাংলা কাব্যে মোহিতলাল কি দিয়েছেন তার সঠিক মূল্য নিরূপণ করতে হলে রবীন্দ্রনাথের অতি-মানুষী প্রতিভার সর্বগ্রাসী কবিকৃত্য এবং সেই সঙ্গে সমকালীনদের মনে রবীন্দ্র-সম্মোহের প্রভাব সম্পর্কে দু'চার কথা বলতেই হয়।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের কবিরা রাবীন্দ্রিক স্মৃতি-সৌগন্ধ্যে বড্ড বেশী উন্মনা ছিলেন। ফলে তাঁদের চোখও এমনভাবে তাঁর প্রভায় ধাঁধিয়ে গিয়েছিল যে তাঁরা নিজের চোখে দুনিয়াকে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখকে দেখেন নি; হালচাল তাঁর মুখ দিয়েই শুনেছেন। এতে আপত্তি করার কিছু ছিল না—রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা যে পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছেন সে-পরিমাণে সঞ্জীবিত হন নি। তাঁদের শক্তির দীনতার কথা তুলছি নে—বিচ্ছিন্নভাবে এঁরা ভালো কবিতাও লিখেছেন কিন্তু সব জড়িয়ে এমন কিছু দিতে পারেন নি যা রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত কিংবা তাকেই আশ্রয় করে কিছু মৌলিক সুরের উদ্বোধন। অবশ্য সে সম্ভাবনার উপকরণ তখন অনেক ছিল—সমাজ-জীবনের নানাদিকে ফাটল দেখা দিয়েছে, বিশ্বযুদ্ধের করাল-সংকেত সমাজ ও সাহিত্যের গতিরেখা পরিবর্তনের এক অভ্রান্ত নিশানা দিয়েছে। রবীন্দ্র-প্রাণশক্তির গভীরতার

সহিত তাঁদের পরিচয় না থাকায় রবীন্দ্রকাব্যের ভাসমান ভাবসমূহের নিছক অনুকারক ছিলেন বলে এই পরিবর্তনের সুর তাঁরা বাঁশীতে তুলতে পারেন নি। এ মন্তব্য থেকে অনেকেই মনে করতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে অনুকরণ করা ক্ষতিকর। কিন্তু একথা বলার উদ্দেশ্য আমার মোটেই তা নয় কেননা রবীন্দ্রনাথের 'ব্যর্থ' অনুকরণিকদের যেমন একাধিক উদাহরণ রয়েছে তেমনি অপরদিকে কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কবিতার মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব এমন কিছু দিয়েছেন যার জন্যে আমাদের কান ও মন এক অপূর্ব তৃপ্তিতে ভরে যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব আমাদের জীবনে যে নতুন-জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিল তার মধ্য থেকে কবি-মানসের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রথম যে তিনজন কবি দেখা দিলেন, যাঁদের রচনায় রবীন্দ্রনাথ থেকে মৌলিক ব্যবধানের সুরটি কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষভাবে ব্যঞ্জিত, যাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রানুসৃতির আত্যন্তিকতা-মুক্ত নতুন যুগের সূচনা দেখা দিল তাঁরা হলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইস্‌লাম। সমাজ ও জীবনকে নিযে অসন্তোষ এঁদের তিনজনের কাব্যেরই একটা সাধারণ লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যে এই রিয়ালিজমের হাওয়া বইবার কারণ হল মহাযুদ্ধের পর সমাজ-জীবনের ব্যর্থতাবোধ—মানুষের অনেক সুখসম্পদ, অনেক আশা তখন ভেঙে গেছে। চাকরীগত অনিশ্চয়তা, বেকার যুবকদের হতাশায় রোমান্সের নীলাঞ্জন কেটে যেতে লাগল। যতীন সেনগুপ্তের মরু চারণের মধ্যে সেই বক্র-তির্যক হতাশার সুর, নজরুলের কাব্যে এই বেদনার বেগ-দৃপ্ত আর্ত কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া গেল। মোহিতলাল জীবনের এই ঝড়-ঝাপটাকেই একটা বৃহত্তর দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেননা—

ত্রিযামা যামিনী খুঁজে খুঁজে ফিরি
মণি যে বিস্মরণী।
কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
বেদনার বন্ধনী। —বিস্মরণী : বিস্মরণী

তাই তাঁর কাছে দুঃখ যেন সমাজের নয়, দুঃখ যেন সৃষ্টিরই নীতি। তিনি 'জীবন-জিজ্ঞাসা'য় এ সম্পর্কে বলেছেন, "যতক্ষণ জীবনকে চাই ততক্ষণ ঐ মিথ্যাকেই সত্য মনে করিতে হইবে, মানুষের সঙ্গে শত্রুতা ও মিত্রতা

করিতে হইবে, কষ্ট দিতে ও পাইতে হইবে, কাঁদিতে ও কাঁদাইতে হইবে। আসল কথা, ঐ দুঃখটাকে চাই-ই।" দুঃখকে যিনি সত্য বলে স্বীকার করতে পারেন তাঁর কাছে দুঃখও অমৃত হয়ে ওঠে। যিনি দুঃখকে সুখের উপায় হিসেবে হাসিমুখে গ্রহণ করেন তিনি দুঃখের মধ্যে পরমানন্দ লাভ করেন। জীবনরসিক কবিও দুঃখের মধ্যে আনন্দকে লাভ করেছেন—

সে বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হয়ে বাজে,
ব্যথায় বৃহৎ হয়ে সে ফুল বিরাজে!
অশ্রুজলে আর্দ্র হয়ে জীবনের এ মরু-সাহারা—
প্রাণের পীরিতি মোর হয় নিরঞ্জনা।

—স্পর্শরসিক : বিস্মরণী

সৃষ্টির এই মৌল বেদনাকে তিনি অনুভব করেছেন, মধ্যবিত্তের দেউলিয়াপনা মানবিকবৃত্তির অধঃপাতের বীজকে ঐ আবরণে জড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্যে দুঃখ-বেদনা সমস্যা হয়ে আসে নি তাঁর কাছে, এসেছে জীবনের অভিজ্ঞান হয়ে। তিনি জানতেন—

হৃদয় আবেগে যদি কিছু কর জীবনের কোন পরম ক্ষণে
দুঃখ যে তার সহিতেই হয় নিত্য-দিনের সহজ মনে।

—বুদ্ধিমান : হেমন্ত-গোধূলি

এইখানেই মোহিতলালের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রভেদ। জীবনের দুঃখকে নিয়ে যতীন সেন যেখানে পরিহাস করেন মোহিতলাল সেখানে অত্যন্ত বেশী সিরিয়াস—দুঃখকে জীবনযাপনের নিদান বলে তিনি গ্রহণ করেছেন—

মৃত্যুর মোহন মন্ত্রে প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা।
...
চক্ষু বুজি অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বারবার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা।

—পান্থ : বিস্মরণী

—দুঃখজয়ের সংকল্পে সিদ্ধিলাভ করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা, মনুষ্যত্বের পরম গৌরব।

মনে রাখা প্রয়োজন, মোহিত-প্রতিভা জীবনের ক্ষণিকতাকে স্বীকার করে নি, কোন খণ্ড সত্যকে চিরন্তন বাণী বলে গ্রহণ করে নি, এক অসাধারণ

জীবনীশক্তিবলে যুগের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটিকে সজ্ঞময় নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে, কবি ও কর্মীর মৌলিক পার্থক্য ভুলে নি। এর প্রধান কারণ হল উনিশ শতকী জীবনের মধ্যে যে স্থির ও নিশ্চিত আত্ম-প্রত্যয় ছিল বিশ শতকের ভাঙনমুখী অবক্ষয়ে সেটি ধাক্কা খেলেও তাঁর কবি-জীবনের পটভূমি তার প্রাণ-প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। নজরুল ইস্‌লাম, যতীন সেনদের কবিতায় যেমনটি আত্মজিজ্ঞাসা ও বাস্তব চেতনার সূত্রপাত তেমনটি মোহিতলালের কবিতায় পাওয়া যায় নি। বিদেশী সাহিত্য থেকে জীবনীরস সংগ্রহ করে সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে যৌনজীবনে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা যে জেগেছিল তার মধ্যে মোহিতলাল নিজেকে নিরাসক্ত আত্মীয়তা সম্পর্ক পাতিয়েছেন। ব্যথা-ব্যর্থতা-হতাশা-বেদনা-বিড়ম্বিত বর্তমানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছেন কিন্তু আগুনের আঁচ তাঁর পিঠে লেগেছিল। না-লাগা ছাড়া উপায় ছিল না যে তখন—এমনি তপ্ত ছিল সেদিনকার আবহাওয়া। প্রেমের ব্যাপারে তিনি এমন এক ভোগবাদের প্রচার করলেন যা সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করল কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। 'নাদির শাহের জাগরণ', 'বেদুঈন', 'অঘোরপন্থী', 'কালাপাহাড়' জাতীয় কবিতায় জীবনের ব্যর্থতাবোধক সংস্কারকে হতাশা-ক্লান্তি-বেদনাকে ঝেটিয়ে ফেলে আত্মনিমগ্ন সাধনা থেকে উদ্ভূত প্রাণধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছকে। এই প্রতিষ্ঠার মধ্যেই বিশ শতকীয় যুগলক্ষণ (অতৃপ্তি, অবিশ্বাস) স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তবু সমষ্টিগত জীবনের অবক্ষয়ের কথা বাদ দিতে বক্তব্যের দিকে থেকে অসম্পূর্ণ থাকলেও তিনি জীবনকেন্দ্রচ্যুত উৎকেন্দ্রিক হন নি, জীবনকে তিনি সৌন্দর্যের চক্ষে দেখেন, তাকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসেন এবং সে-ভালবাসা পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত করে দেন দীপ থেকে দীপের মতো। তাই তৎকালীন 'চীৎকৃত' কবিদের পাশ কাটিয়ে সস্মিত আত্মস্থতায় তিনি নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রেম ও জীবনের অচিরস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা-কবিতায় যা দিয়েছেন তা হল আধ্যাত্মিক শুচিতায় মণ্ডিত এক অনাসক্তির স্পর্শ। এ প্রেমের ক্ষুধায় রয়েছে রোমান্টিক অতৃপ্তির সুর—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে'। আত্মার অমৃতত্বের আশ্বাস নতুন নতুন রূপের মধ্য দিয়ে সে যাত্রা করতে ব্যস্ত। আর মোহিতলালের প্রেমের মধ্যে রয়েছে এক জন্মের ভোগস্পৃহা, নিয়তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রেমের

হৃদয়বলে জয়ী হবার দুঃসাহস—'দেহই অমৃতঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান' (নারীস্তোত্র : স্মরগরল)। একজনের প্রেমের মধ্যে রয়েছে লাবণ্য আরেকজনের পৌরুষ। একটি উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য আরও পরিষ্কার হবে। প্রেমের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেন—

দাও খুলে দাও সখী ওই বাহুপাশ,
চুম্বন মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ!

—বন্দী : কড়ি ও কোমল

অথচ সে ক্ষেত্রে মোহিতলাল বলেন—

অন্ধ আমি দেহ তাই স্পর্শে হাহা করে,
ধরার ধূলায় তাই ফুল-রেণু ঝরে।
আলো—সে যে উষ্ণ শুধু, জানি কত শীতল আঁধার—
সর্বঅঙ্গ স্নান করে চুম্বন-ধারায়।

রবীন্দ্রনাথের লীলাচঞ্চলা প্রকৃতি স্বপ্ন-মাধুরী, মোহিতলালেব রূপমাধুরী (sensuousness)। রবীন্দ্রনাথের আত্মাপ্রধান প্রেমকাব্যে মোহিতলাল জুড়ে দিলেন দেহাত্মবাদ যার মূলকথা হচ্ছে দেহ ছেড়ে আত্মার মুক্তি নেই বরং প্রেমই আত্মাকে প্রাণময় করে—'ভুলেছি আত্মাব কথা মানি শুধু দেহের সীমানা'। এজন্যেই রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত প্রেমবাদের দিকে তিনি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শোনালেন জাগ্রত জৈব কামনার বাণী তাঁর পৌরুষদীপ্ত ভাষায়—

ঊর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা মাধবী,
নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি' নীরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
হে কবি—বাসব?

—মোহমুদ্গর : বিস্মরণী

তাই—

এস কবি, এস বীর, নির্মম সাধক এস, এস হে সন্ন্যাসী!
ছিঁড়ে ফেল অদৃষ্টের ফাঁসী।
দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি খুঁড়ি' লও কামনার কাচমণি-হীরা।
অন্ন খুঁটি' লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জর—
আমরা বর্বর!

—মোহমুদ্গর : বিস্মরণী

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হল। কিন্তু মোহিতলাল যে গুণে বাংলা কবিতায় বিশিষ্ট, তা অনুধাবন করার জন্যে এই উদ্ধৃতির তাৎপর্য আছে। দেহ-কামনাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি, তাকে আদর্শসিদ্ধির অন্তরায় বলে মনে করেন নি বরং মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-নিচয়কে সত্য-সুন্দরের অংশ বলেই স্বীকার করেছেন। তা বলে এই সীমিতের মধ্যেই তিনি বদ্ধ হয়ে থাকেন নি, কয়েকজন আধুনিক কবিদের মত তাকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেন নি, ইন্দ্রিয়জগতের বাইরে অভিব্যক্ত জগতের অন্তরালে রয়েছে যে প্রাণময় অতীন্দ্রিয় জগৎ, সূক্ষ্ম অন্তর্লোক তার অনুক্ত আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন নি। মহৎ কবি-মাত্রকেই দিতে হয় সে আর নতুন কথা কী! কিন্তু মোহিতলালের মৌলিকতা এই যে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখালেন ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের সিঁড়ি ভেঙেই দিব্য-প্রেমের অমরাবতীতে যাওয়া যায়—জীবনের ভোগবাসনাকে অস্বীকার করে অতীন্দ্রিয় প্রেমের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকখানি ফাঁকি থেকে যায়, কেন না দেহ-বাস্তবের ক্ষুদ্র অনুভূতির ওপরই তো বৃহত্তর অধ্যাত্ম অনুভূতির ভিত্তি—নারীর রূপভোগই যে আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান। প্রেমের পরিপূর্ণ রূপটি অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগ উভয়কেই অঙ্গীকার করে একটি পূর্ণাঙ্গ রসসৃষ্টি যাতে অকারণ তত্ত্ব দেবার প্রয়াস নেই, আধ্যাত্মিকতার জাল-বোনা নেই—বাংলা সাহিত্যে এটিই হোল তাঁর সবচেয়ে বড় দান। এই সমন্বয়ের মধ্যেই প্রতিভাত হয়েছে শৌর্য, বীর্য ও প্রেমের প্রকাশ—ভাব ভাষা ও ছন্দের উজ্জ্বল স্বকীয়তা। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থাতেই নতুন কিছু করার আন্দোলন যাঁরা আরম্ভ করেছিলেন মোহিতলালের মধ্যে

তার সূচনা দেখতে পেয়ে তাঁকে তাঁরা সাদরে লুফে নিলেন। তাঁরা সেদিন সগর্বে বলেছিলেন, 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হবার পর একথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই।" (দ্রঃ কালি-কলম, বৈশাখ ১৩৩৪ ; প্রগতি : পৌষ ১৩৩৪)।

কিন্তু আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সেদিন বুঝতে পারি নি। যখন বুঝতে পারলুম যে মনোবৈভবে তিনি একটি ছোটখাট রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাব্যের স্টাইল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব মনস্বিতার মুদ্রাচিহ্নে অঙ্কিত তখন অনাধ্যাত্মিক জীবন-প্রেম, সংগ্রামলিপ্সু ভোগবাদের জন্যে তাঁকে রোমান্টিক কবির পর্যায়ে ফেলেছিলুম, ক্রমশঃ পরিচয়ে বুঝলুম যে তাঁর মধ্যে রোমান্টিসিজমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ক্লাসিসিজম্। ক্লাসিক রীতির Poetic seriousness যা উনবিংশ শতকের স্বর্ণযুগে দেখেছিলুম তাকে মোহিতলাল সম্পূর্ণ নতুন-ভাবে পরিবেশন করলেন—গীতি-কাব্যের সুকুমার শিল্প-কল্পনা এপিক-গাম্ভীর্য লাভ করল তাঁর হাতে। তাঁর কাব্য-রচনায় ভাবকল্পনা এমন একটি সুষমিত সমগ্রতা ও ধ্বনি-গাম্ভীর্যে অভিব্যক্ত হয়েছে যে তার মধ্যে অনুভূতিব সূক্ষ্মতা আমদানি করায় বক্তব্যের এলায়িত ভাব সঙ্কুচিত হয়ে এল, নিছক রোমান্টিক কবিদের মত চিত্তের চাপল্য না থাকায় পাঠকের ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ুকে সক্রিয় করে তুলল। ক্লাসিক ঠাটে রোমান্টিক কল্পনা আমাদের বাংলা সাহিত্যে তিনি ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া এ পর্যন্ত আর কেউ করেছেন বলে মনে পড়ছে না আমার। কাজেই বাঙালী কবিদের ওপর তাঁর প্রভাব ভাবের দিক থেকে কিংবা রূপের দিক থেকে তেমন পড়ে নি যা একটু পড়েছে শব্দ-চয়নে বাণী-বিন্যাসে ভাবনায়-ধারণায় তা সুশীল দে'র কাব্যের ওপর। তিনিই তাঁর কাব্যের একমাত্র তুলনীয় হয়ে রইলেন—যাঁর কাব্যের একপ্রান্তে উনিশ শতকী ঐতিহ্য অপর প্রান্তে বিশ শতকী বিদ্রোহ। তৎকালীন কল্লোলীয় তরুণ কবিরা যাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে পাশ কাটাতে চেয়েছিলেন তাঁরা তাঁর কবিতার মধ্য থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন এই দিক দিয়ে যে, যৌবনের ভোগাকাঙ্ক্ষার বাণী যা পশ্চিমী রক্ত-মাংসের প্রেম তৎকালিক কবিকুলকে মাতিয়ে তুলেছিল তার সপক্ষে একটা প্রবল প্রচণ্ড প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া তাঁদের মনের সামিয়ানায় একটি প্রধান স্তম্ভরূপে কাজ করেছিল। অবশ্য একথা কবুল করতে বাধা নেই যে মোহিতলালের কাব্য-ভাবের ওপরে ওপরেই তাঁরা ঘুরেছেন, গভীরে প্রবেশ করেন নি বা পারেন নি। কেননা মোহিতলাল ছিলেন বিশ্ববৈচিত্র্য

কবি। তাঁর মানস-গঙ্গায় নানা দেশীয় সাহিত্যের রসধারা যা একতারার সুর নয় সপ্তস্বরা বীণার উদ্দীপ্ত ঝঙ্কার—শাক্ত, বৈষ্ণব, চার্বাক, সাংখ্য ইত্যাদি লোকায়ত মতের সর্বসমর্পণের স্বস্তিবাদের সঙ্গে আছে ইউরোপীয় জীবনাদর্শের সমন্বয়। তাঁর কাব্যে যেটুকু বিদেশী আদর্শ আছে তা আমাদের সংস্কারের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। অকারণে কোনোটাকে অযথা emphasis দিয়ে রসের মধ্যে আবের মত করে তোলেন নি। এইখানেই তাঁর মৌলিকতা, এইখানেই তিনি বঙ্গভারতীর কাছ থেকে অমরত্বের চরম পুরস্কার লাভ করবেন।

তাঁর এই মৌলিক ভাবরূপের উত্তরসাধক গড়ে ওঠে নি বলে দুঃখিত হওয়া চলে না কিংবা তাতে তাঁর কৃতিত্ব খাটো হয় নি। আমাদের গর্ব যে এরূপ একজন উঁচু শ্রেণীর কবিকে হাস্যাস্পদ অনুকরণ করে রবীন্দ্র-সমকালীন কয়েকজন কবিদের মত বর্তমান পাঠকদের কাছে করুণার পাত্র হয়ে উঠি নি। তাঁকে আমরা পুরোভাগে রেখে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের সেদিন এই কথাই বলতে চেয়েছিলুম যে রবীন্দ্রনাথের যুগন্ধর কবি-প্রতিভায় দেশের সমকালীন ভাবনা-ধারণা বিধৃত হয়ে সাহিত্যের একটি বর্ধিষ্ণু বনেদ গড়ে ওঠার মধ্যেও যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে কিছু নতুন সৃষ্টি করা সম্ভব এবং সে-সম্পর্কে পাঠক-সমাজে ঔৎসুক্য জাগাতে চেয়েছিলুম। আজকের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি পাঠক-সমাজের অভিনন্দনে আমাদের সেদিনের প্রয়াস যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। দোষ-ত্রুটি যাই থাক সাফল্যের ফসল বেশ কিছু আমরা ঘরে তুলেছি এবং তা দিয়ে দেখিয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা-কাবতা কিছু নতুন ভূমি অধিকার করেছে। সেদিনের তরুণ কবিদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার এই হল হিসেবের খাতায় লাভের অঙ্ক। আজকের দিনে পাঠক-সমাজের মুখে মুখে তাঁর কবিতার লাইন আবৃত্তি হয় না সত্যি, আজ তাঁরা যে নাটোরের বনলতা সেনের কাছে দু'দণ্ড শান্তি পাচ্ছেন এতে আফশোষ করার কিছু দেখছি নে কারণ স্ট্রেচির ভাষায়, সাহিত্যিক শেয়ার-বাজারে সাংঘাতিক ওঠা-পড়া হয়। বুদ্ধিজীবী মানুষের মন স্থবির হতে পারে না—সব সময়ে গতিশীল। রবান্দ্রনাথের অমিত রায়ের জবানবন্দীতে বলা যেতে পারে, তাঁদের মনটা আয়না, নিজেদের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মত যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতেন তাহলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না। কোন কবির একজনই চিরদিন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন না, একজন পাঠকের কাছে কোন বিশেষ জন চিরদিন প্রিয়

কবি হয়ে থাকেন না। পরিবর্তনশীল জগতে সবই পরিবর্তিত হয়—মানুষের মনেও পরিবর্তন আসে। খতিয়ে দেখতে গেলে সাহিত্যের সচলতাই প্রমাণ করে। একদিন মোহিতলালের কবিতার লাইন তখনকার যুবকসমাজ আজ যাঁরা প্রৌঢত্বের শেষ সীমায় উপনীত তাঁরা আবৃত্তি করেছেন, আজকে যাঁরা পাঠক-প্রিয় কবি তাঁরা তাঁর কাছ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন নতুন দৃষ্টি দিয়ে জীবন ও জগৎকে দেখার। তাই তিনি আধুনিক কবিদের কবি—গুরুর গুরু। পরে মোহিতলাল প্রগতিবাদী শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে উনবিংশ শতাব্দীর জীবনবেদের মধ্যে পলায়ন করেছিলেন। এ হেতু কয়েকজন গায়ের জোরে তাঁকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিকথা তাঁদের যুক্তিকে প্রশ্রয় দেবে না কারণ মোহিতলালের কবি-কীর্তির ঔজ্জ্বল্যে তার গোড়ার পাতা কয়টি যে আলোকিত হয়ে আছে।

আধুনিক কবিতা যে ক্রমশঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য হচ্ছে, কবিতার পাঠককে যে বিদগ্ধচিত্ত হতে হবে, কবিতা যে আর পদ্যের পর্যায়ে নেই, অবকাশরঞ্জনের ঘুমিয়োপ্যাথি নয়, রীতিমত সশ্রম অনুশীলন করতে হয় তা আধুনিক বাংলা কাব্যের পাতা ওলটালে মালুম হবে। কবিতায় হৃদয়াবেগের সঙ্গে বুদ্ধিজাত আবেদন, বুদ্ধিপ্রাখর্যের সঙ্গে চিত্রকল্পের (picturesque) ঐশ্বর্যের সূত্রপাত মোহিতলালের হাত দিয়েই প্রথম হয়েছে। আমাদের কান ও মনের চিরাচরিত অভ্যাসগুলো প্রথম তাঁর কাছেই ধাক্কা খেয়েছিল, তিনি তাঁর কাব্যের ইমারতকে এমন শক্ত জমাট করে তৈরি করেছেন, শব্দ সৃষ্টি ও নির্বাচনে, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে তাঁর সতর্কতা এতই অপরিসীম যে তার নিগূঢ় রস উপলব্ধি করতে হলে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়। কেননা, তাঁর ভাবের পিছনে একটি চিন্তার সুস্থিরতা আছে—তাঁর জ্ঞানমার্গই যে তাঁর কাব্যমার্গ। এজন্যে ভাব-বৈদগ্ধ্যে এবং বিন্যাসের সচেতন কারিগরিতে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্য অতুলনীয় এবং ভক্ত পাঠকের সংখ্যা আশানুরূপ না হবার এটিও একটি প্রধান কারণ। কাব্যরস উপলব্ধি করতে যাঁরা বুদ্ধি খরচ করতে নারাজ তাঁরা মোহিতলাল ও আধুনিক খ্যাতিমান কবিদের ওপর বীতশ্রদ্ধ। আধুনিক বাংলা কবিতার মাথা নেয়ার জন্যে যাঁরা এতদিন তরোয়াল চালনা করেছেন, আধুনিক কবিতার সমাদর দেখতে পেয়ে এঁরাই আজ আবার ধুয়ো তুলেছেন যে এখনকার কবিতা কবিতাই নয়, দুর্বোধ্য। অথচ এঁরাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেকচারের প্রয়োজনে

আধুনিক ইংরেজি কবিতা বোঝার জন্যে যে-পরিমাণ গলদঘর্ম পরিশ্রম করেন কিমাশ্চর্য বাঙালী কবির ক্ষেত্রে তাঁরা তা করেন না। করলে এ অভিযোগ তাঁরা তুলতেন না। শ্রমশীলতার সঙ্গে ধৈর্য শ্রদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হলে মোহিতলালের কবিতা দুর্বোধ্য বলে ঠেকবে না, সেখানে সামান্য শ্রান্তির অসামান্য পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পরবর্তী কালে মোহিতলালের কবি-জীবন সমালোচকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। তার সাহিত্য-জীবনের এই রূপান্তরকে কেউ কেউ সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁদের মতে কবি মোহিতলাল নাকি স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না—কবি মোহিতলালের পরিণতি হচ্ছে সমালোচক মোহিতলাল। যিনি প্রথম শ্রেণীর কবি তিনিই হন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক। আবেগের বশবর্তী না হয়ে তাকে বুদ্ধিমার্জিত ফলকে যাচাই করে নিয়েছেন। এই যাচাইয়ের মধ্য থেকে সমালোচনা-শক্তি উৎপন্ন হয়েছে। বাংলা-কাব্যে মোহিতলাল যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে সমালোচনা-সাহিত্যে বেশী করে দিয়েছেন।

আজকাল সাহিত্য-সমালোচনার নামে বাঙলাদেশে রাজনীতির দলাদলির ভূত আমাদের সমালোচকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। এর ফলে ডান-বাম, নরম-গরম, লাল-নীল নানারকম রাজনীতিক মতবাদের ছকে সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু মোহিতলালের সমালোচনা-সাহিত্য বাঙলার প্রাণধর্মের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে রচিত হয়েছে। যে-সাহিত্যে বাঙালী-প্রাণের স্পন্দন নেই তাকে তিনি সাহিত্যের আওতায় আনেন নি। তাঁর এই সমালোচনা-রীতির যেমন ভালো দিক রয়েছে তেমনি এই নতুন রীতিটির কালো দিক অর্থাৎ তাঁর অত্যধিক বাঙালী-প্রীতি সমালোচনার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা এনেছে। তাঁর ত্রুটির কথা এখানে আলোচ্য নয় অন্যত্র আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শুধু আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে তিনি কী দিয়েছেন সেইটুকুই আজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার কথা। গণ্ডুষ জলে শফরীর মত অল্প বিদ্যার পুঁজি নিয়ে সাহিত্য-সমালোচনা করেন নি কিংবা সমালোচনার মধ্যে তিনি কারোর পিঠ চাপড়িয়ে মন রাখার কথা বলেন নি। এক আশ্চর্য দৃঢ়চেতা, যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ মনে, সুতীক্ষ্ণ যুক্তিনিষ্ঠায় ও অতুলনীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমাদের বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—আমাদের এ দশকের পাঠক-সমাজে কবির চেয়ে

তিনি এই পরিচিতিতেই অধিক খ্যাতিমান। তাই এ সম্পর্কে কিছু না বলাই হচ্ছে অনেক কিছু বলা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালের কবি হিসেবে এক বিশিষ্ট স্থান থাকলেও পাঠক-সমাজে সেটি একটি নামমাত্র। সাধারণ পাঠক-সমাজকে হয়ত এর জন্যে দোষ দেওয়া যায় না, রস উপলব্ধি করার সামর্থ্য প্রত্যেকের থাকে না কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্যক্ ও যথার্থ সমাদর আমাদের গুণী সমাজে এখনো হয় নি, বরং তিনি কৃতিত্বের দরুন ঈর্ষা অনাদর ভোগ করে গেছেন। তিনি আজ উপেক্ষিত কিন্তু অপেক্ষিত, কারণ সাহিত্য-বিচারে পলিটিক্যাল মায়ামৃগের চাতুরী যেদিন শেষ হবে, দল-মত-গোষ্ঠী নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের বিচার যেদিন শুরু হবে সেদিন চিনে নেবে তাঁরে, চিনে নেবে আজ যিনি রয়েছেন অনাদরে কুণ্ঠিত॥

প রি শি ষ্ট

আমি ও শনিবারের চিঠি

জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—জরা নয় ব্যাধিতে আমি জীর্ণ হইয়াছি। তাহার উপর সংসার-যুদ্ধ আছে। কিন্তু মনে হয় বাহিরের এই প্রাকৃতিক বা আধিভৌতিক দুঃখই নয়, আমাকে বিশেষ করিয়া কাবু করিয়াছে, এমন কি প্রায় মৃত্যুমুখে ফেলিয়াছে আর এক প্রকার শক্তিশেল, তাহা আধ্যাত্মিক—প্রাণমূলে আঘাত করিয়াছে।

জীবনের প্রায় শেষ পর্বে, মানুষ যখন একটু বিশ্রাম ও শান্তি প্রার্থনা করে, তখন আমার ভাগ্যে ঘটিল নির্বান্ধব নিরাশ্রয় অবস্থা। এ অবস্থা দারুণ হইয়া উঠিবার প্রধান কারণ, তখন দেশে মহামন্বন্তর উপস্থিত—সে দুর্যোগ ক্রমেই অন্য আকারে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এই কালে আমি আশ্রয়চ্যুত ও কর্মহীন হইয়া এক অপরিচিত স্থানে পথিপ্রান্তে আশ্রয় লইলাম। মনে তখনও আমার চিরদিনের স্বভাবসিদ্ধ নৈরাশ্যহীনতা ছিল—শরীর ভাঙিয়াছে, কিন্তু আমার অদম্য আত্মবিশ্বাস বা ভাগ্যের সহিত যুদ্ধে অপরাজয়ের আশ্বাস ঘুচে নাই। যিনি জন্ম হইতে আমার শিরায় শোণিতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, যে শক্তি আমাকে—এই তুচ্ছ ব্যক্তিকে—সত্য ও সুন্দর, ন্যায় ও নিঃস্বার্থের অকুতোভয় মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া, এক সমাজের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি আমাকে সর্ব বিপদ ও সকল শত্রুতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং যাঁহার নির্দিষ্ট কার্যের কিঞ্চিৎ মাত্র আমি সম্পন্ন করিয়াছি, এখনও, এই কালেও, আরও অনেক কিছু করিবার আছে—আমি অহরহ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমার জীবনের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনের আশায় সকল ক্ষতি ও সকল দুঃখকে তখনও তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলাম। সেই ব্রত কি—আমার সারা জীবনের একমাত্র সাধনা ও সেই সাধনায় আমার অনন্যপরায়ণতা যাহারা লক্ষ্য করিয়াছে তাহারাই জানে।

আমি গত ১৬।১৭ বৎসরেরও অধিক কাল আমার পূর্ব সাহিত্যিক-জীবন—কবি-জীবন—স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া, যেন ভিতর হইতে এক দৃঢ় প্রত্যাদেশের তাড়নায়, বাংলা সাহিত্যকেই আশ্রয় করিয়া, সকল অসত্য ও অ-সুন্দরের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলাম। হঠাৎ আমি যেন একটা শক্তিলাভ করিলাম—হৃদয়ে যেমন, মস্তিষ্কেও তেমনই, যেন একটা নূতন আলোক জ্বলিয়া উঠিল। আমার নূতন প্রাণশক্তি ও চিন্তাধারার বাহন হইল একটা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পত্রিকা; সে পত্রিকার জন্ম হইয়াছিল কয়েকটি যুবকের আমোদ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য; তাহার পশ্চাতে কোন গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল না, ব্যবসায় ত নহেই, এমন কি সূতিকাগারে তাহার মৃত্যু হইলেও কেহ দুঃখিত বা নিরাশ হইত না। কিন্তু যাহারা সেই পত্রিকার জন্মদাতা তাহাদের সেই অতি লঘু আমোদ-প্রমোদের অন্তরালে একটা বীজাঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ছিল—সর্ব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীনতা, এবং অদম্য প্রাণশক্তি। 'শনিবারের চিঠি' নাম দিয়া তাহারা প্রতি সপ্তাহে গদ্যে-পদ্যে এমন সকল রচনা প্রকাশ করিত যাহাতে 'ভদ্রলোকের তকমা তাবিজ ছিঁড়ে মদোন্মত্ত হাওয়ায়' নিজদিগকে উড়াইবার একটা দুরন্ত শক্তির পরিচয় ছিল। ইহার অধিক কিছু ছিল না, অবশ্য সেই বিদ্রোহের উপযোগী একটা ভাষা ও ছন্দ তাহারা আয়ত্ত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বাঙলা সাহিত্যের তদানীন্তন অচলায়তনকে নাড়া দিবার কোন আশাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। কিছুদিন এই যুবজনোচিত আমোদ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার পর উৎসাহ হ্রাস পাইতে লাগিল। ঐ সাপ্তাহিক 'অভিযান' ক্রমে অনিয়মিত ও হীনবীর্য হইয়া পড়িল। বালক যেমন খেলা শেষে খেলনা পরিত্যাগ করে তেমনই উহা পরিত্যক্ত হইবার উপক্রম হইল। যদি ঐ সময়ে ঐ রূপেই ঐ পত্রিকার মৃত্যু হইত তবে উহার সেই সাপ্তাহিক জীবনলীলা কেহ স্মরণও করিত না; বস্তুতঃ এখনও তাহার সেই আদি রূপটির সংবাদ প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তুবড়ী বা পটকার আতসবাজী যতই চমকপ্রদ হউক ক্ষণিক বিস্ফোরণের পর তাহার আর কোন চিহ্নই থাকে না; তাছাড়া ঐ সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রচার একটা বন্ধুদলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; অথবা কলিকাতার সাহিত্যিক বৈঠকে উহার সেই বেপরোয়া আক্রমণে কাহারও কৌতুক, কাহারও ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছিল।

যখন ঐ নূতন সাহিত্যিক উপদ্রবটি বেশ একটু উৎসাহ সহকারে আত্ম ঘোষণা করিতেছে তখন আমি প্রবাসী পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই যুবকটির চরিত্র আমাকে অতিশয় আকৃষ্ট করে—এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক যৌবন, বাঙালী যুবকের জীবনে অল্পই দেখিয়াছি।

ইনি 'শনিবারের চিঠি'র জনক—দুষ্ট সরস্বতীর সেবক হইলেও, সর্ববিধ রাগদ্বেষ মুক্ত, উদার ও নিস্পৃহ পুরুষ। এই সময়ে আমি ইঁহাদের বৈঠকে বসিতাম বটে, কিন্তু ঐ পত্রিকায় কিছু লিখি নাই; আমার বয়সের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ইঁহারাও আমাকে দলে টানিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। আমি তাঁহাদের সেই বৈঠকে বসিয়া এই বন্ধুমণ্ডলীর যে হাস্যরস-রসিকতার পরিচয় পাইতাম তাহাতে পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ রচনার অন্তরালে যে নিছক দুষ্ট সরস্বতীর প্ররোচনা আছে, কেবল ক্ষেপাইয়া দিয়া মজা দেখিবার প্রবৃত্তিই যে প্রবল, তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতাম, অন্ততঃ ঐ একজনের যে আর কোন অভিপ্রায় ছিল না, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ কয় সপ্তাহের আতস বাজীর পরে যখন আমোদ-পর্ব ফুরাইয়া আসিল, তখন দেখা গেল, উহাদের কয়েকটির মধ্যে স্থায়ী দাহ্য পদার্থ আছে,—বিদ্রূপ করিবার যে শক্তি, তাহাও একটা শক্তি বটে এবং সেই শক্তি অন্ততঃ একজনের মধ্যে যেরূপ প্রকাশ পাইযাছে, তাহা সহজে নির্বাপিত হইবার নয়,—ইঁহার নাম সজনীকান্ত দাস। তাই 'শনিবারের চিঠি'র সেই আদি জীবনলীলা সাঙ্গ হইলেও—ঐ যে শক্তি তাহার একটা আধার চাই, অথচ উহাকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া একটা পত্রিকা স্থায়ীভাবে প্রচার করার যে মনোভাব—ঐ ভাবে—কেবল মন্দকেই আঘাত করিয়া মূল সাহিত্যিক আদর্শকে ঘোষণা করাব মধ্যে যে একটা মযাদাবোধের অভাব আছে, ইহা ঐ দুষ্ট সরস্বতীর বরপুত্ররাই অন্তরে অনুভব করিল। ইতিমধ্যে কোন একটি ঘটনার সাক্ষাৎ তাডনায়, আমি 'শনিবারের চিঠি'র সেই সাপ্তাহিক হুল্লোডের মধ্যে একরূপ নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি, আমিও কয়েকটি কবিতা শেষের দিকে উহাতে লিখিয়াছিলাম; এই কারণে আমার সহিত একটা যোগসূত্র ঘটিয়াছিল। ক্রমে ঐ মণ্ডলীতে উপদেষ্টার আসনও লাভ করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে শ্রীমান সজনীকান্ত অন্য কারণেও আমার অতিশয় নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। তখন পত্রিকাখানিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং উহার আদি প্রবর্তনাকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়াই সাহিত্যের গুরুতর দিকটিকে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া এক অভিনব উদ্দেশ্যমূলক পত্রিকার পত্তন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অশোকবাবু উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। সেজন্য একটি সভারও অধিবেশন হইল, এবং আমি মুখ্যতঃ সেই আদর্শ রক্ষার ভার লইতে প্রতিশ্রুতি দিলে, অর্থাৎ আমিই ঐ পত্রিকার সাহিত্যিক কর্ণধার হইতে স্বীকৃত হইলে, অতঃপর 'শনিবারের

চিঠি'র নব জন্ম ও নবকলেবর বিধান হইল—চিঠি মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হইল।

দুই

ইহার পর 'শনিবারের চিঠি'র পত্রিকা-জীবনের ইতিহাস অতিশয় রোমাঞ্চকর, ঝড়-জল-তুফানের মধ্যে ডুবি ডুবি করিয়াও যে ইহা ডোবে নাই, তাহাতে মানুষের অসম সাহস ও ধৈর্য, অদম্য আত্মপ্রত্যয় যেমনই প্রমাণিত হউক—আমি বিশ্বাস করি যে, উহা একরূপ দৈবের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীমান্ সজনীকান্তই উহার সারথিরূপে উহাকে সচল রাখিবার যে প্রায় একক চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও যেমন সত্য, তেমনই আমিও উহার রথীরূপে সেকালের সেই কুরুক্ষেত্রে ভীমার্জুন, ভীষ্ম-কর্ণের সহিত সম্মুখরণে উহাকে অটল রাখিয়াছিলাম। বাস্তবের দিকটির ভার ছিল সজনীকান্তের উপরে, কিন্তু উহার আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলাম আমি; কোনটাই প্রয়োজনের দিক দিয়া অপরের তুলনায় ন্যূন ছিল না; যদিও ঐরূপ ব্রতের উদ্‌যাপনে যে শক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক, তাহা শুধু হস্ত পদের দৃঢ়তা নয়—প্রাণ বা আত্মার উন্নত ও অবিচলিত অধিষ্ঠান। সকল বাদ-বিসম্বাদ, কুৎসা ও কোলাহলের ঊর্ধ্বে তাহার সেই অতিদৃঢ় আদর্শ ও নীতি নিষ্ঠা যদি বজায় না থাকিত, তবে তাহার বাঁচিবার যেমন প্রয়োজনও ছিল না, তেমনই সে বাঁচিতেও পারিত না।

কারণ 'শনিবারের চিঠি'র যে অংশের ভার সজনীকান্ত লইয়াছিলেন, সেই বিদ্রূপ ও খোলাখুলি আক্রমণের ফলে—সম্পূর্ণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ অর্থাৎ অতিশয় অসামাজিক ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফলে, সে সময়ে সারা বাংলার সাহিত্যিক সমাজ—শুধুই তরুণের দল নয়—তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া, আহত বৃদ্ধের দলও—'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। শেষে এমন হইল যে, ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে 'শনিবারে চিঠি'র নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। যদিও ক্রমেই 'শনিমণ্ডলী'র বহির্ভূত নানা দল হইতে যথেষ্ট উৎসাহ আসিতে লাগিল; এবং ঐ পত্রিকায় রসরচনা-দক্ষ কয়েকটি নবীন লেখকেরও অভ্যুদয় হইল, তথাপি, বাংলার যাবতীয় সাহিত্যিক সভ্য সমাজ উহার উপরে তাঁহাদের বৈঠকখানার দরজা রুদ্ধ করিয়া দিলেন। শেষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অপ্রকাশ্যে, পরে

প্রায় প্রকাশ্যে উঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র জীবনে এই কালটা সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ; আমি এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছিলাম। সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অতি বিপন্ন অবস্থায় সজনীকান্ত কেবল অটুট ধৈর্যের পরিচয় দিতেছিলেন; কিন্তু আমি দূরে অন্তরালে থাকিয়া ক্রমাগত ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলাম। এই কালে আমি খাঁটি সাহিত্যের আদর্শ ও নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ অবারিত লেখনী চালনা করিয়াছিলাম তাহার প্রমাণ সেই কালের 'শনিবারের চিঠি'র প্রায় সর্বাঙ্গে পাওয়া যাইবে। একদিকে যেমন অপরপক্ষের কুতর্ক ও মূর্খতার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দান, অপরদিকে তেমনই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা এবং সাহিত্যিক রসতত্ত্বের আলোচনা, এই দুই জাতীয় রচনা দ্বারা আমি বাংলার সাহিত্যরসিক শিক্ষিত সজ্জনের শ্রদ্ধাআকর্ষণে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছিলাম। সজনীকান্ত তখনও সাহিত্যের মহারথী বা মহাসমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। তিনি ঐ অপর কার্যটি অতি সুনিপুণভাবে করিয়া যাইতেছিলেন, 'শনিবারের চিঠি'র যাহা কিছু মর্যাদা ও প্রতিপত্তি, তাহা একমাত্র আমিই রক্ষা করিতেছিলাম। আমার প্রবন্ধ পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে সজনীকান্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন—প্রতিমাসে আমার রচনার জন্য কিয়দংশ বাদ রাখিয়া পত্রিকার ছাপা আরম্ভ করিতে হইত, যদি বেশী বিলম্ব হইত তবে টেলিগ্রামে তাগিদ আসিত; সজনীকান্ত বলিতেন, আমাকে সম্মুখে না রাখিলে, তিনি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সাহস করেন না; সে সকল পত্র এখনও আমার নিকটে আছে।

এইরূপে আমি 'শনিবারের চিঠি'কে জয়যুক্ত করিবার জন্য আমার সকল শক্তি, আমার মনের ও প্রাণের সকল আকূতি নিয়োগ করিয়াছিলাম। 'চিঠি'র জীবনে সে যে কী দিন গিয়াছে তাহা একমাত্র আমি ও সজনীকান্ত জানেন; একরূপে 'একঘরে' অবস্থা, কেবল আমার দুর্দান্ত সাহস ও সাহিত্যিক ধর্ম-নিষ্ঠাই সেদিন ঐ 'নদামার কাগজখানা'কেও সকল শুচিবায়ুগ্রস্ত 'কালচার'-অভিমানী পাঠকের রুচি ও রসবোধের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'র আত্মা ও আত্মমর্যাদাকে সেদিন আমিই সর্বস্বপণ করিয়া বাঁচাইতে পারিয়াছিলাম।

ইহার পর ক্রমে 'চিঠি'র প্রতিষ্ঠা বাড়িল; সজনীকান্ত তাঁহার চতুষ্পার্শে কয়েকটি উদীয়মান সাহিত্যিককে সমবেত করিয়া তুলিলেন; আমি যেমন দূরে তেমনই দূরে আছি: 'শনিবারের চিঠি'র বৈষয়িক উন্নতি বা অবনতি

কোনটারই সংবাদ রাখি না, রাখিবার প্রয়োজনও ছিল না ; 'চিঠি' আমারই 'মানসকন্যা', তাহাকে আমার বুকের রক্ত দিয়া আমি লালন করিয়াছি, সে যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহাতেও আমার যেমন নিঃস্বার্থ আনন্দমাত্র হইবার কথা তেমনই সংসারে সে যদি ধনধান্যবতী হইয়া উঠে, তাহাতে কন্যার ঐশ্বর্যদর্শনে পিতার যে আনন্দ তাহাই হইবার কথা। কিন্তু কন্যার মতিগতির পরিবর্তন হইতেছিল, তাহা আমি জানিতাম না। আমি ততদিনে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার কল্যাণ চিন্তাই করিতেছিলাম, এবং যতদূর সাধ্য তাহারই লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলা সাহিত্যের ফুল-পল্লব চয়ন করিয়া নব নব মাল্য রচনা করিতেছিলাম।

ক্রমে সজনীকান্তই 'শনিবারের চিঠি'র শুধু স্বত্বাধিকারী নয়—উহার একমাত্র গৌরবভাগী মহামনীষী সম্পাদকরূপে খ্যাতি অর্জন করিলেন। এই খ্যাতি লাভের আয়োজন অনেক পূর্ব হইতে হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা সুযোগ করিয়া দিয়াছিলাম আমিই। সজনীকান্ত যখন সাহিত্যে সাবালক হইয়া ওঠেন নাই—তখন তিনি আমাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া, আমার উপদেশ ও আলোচনা এবং আমার প্রদত্ত বিধি-নিষেধ ও আমার রচনাবলী প্রভৃতি হইতে, তাঁহার নিজস্ব প্রখর বুদ্ধিবলে একটা Journalistic সাহিত্যজ্ঞান গড়িয়া লইতেছিলেন—তখন 'শনিবারের চিঠি'র রচনায় আমার নাম স্বাক্ষর থাকিত না, পরেও অনেক রচনা নামহীন থাকায় তাহা সম্পাদকের রচনা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপে একদিকে যেমন তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তেমনই অপরদিকে তিনি একটি সাহিত্যিক ভক্ত-শিষ্য ও বন্ধুদল গঠন করিয়া লইতেছিলেন। ইহার আভাস আমি বহুপূর্বেই পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই, আমার সাহিত্যিক-জীবনের সাধনমন্ত্র বুঝিতে পারিলে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। সেই কথা এইবার বলিতেছি। কিন্তু এইখানেই আর একটি কথা বলিয়া রাখি ; সজনীকান্তের সাহিত্যিক খ্যাতির কারণ যতই যথার্থ হউক—তিনি একটা বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, যে সাহিত্যিক বন্ধুমণ্ডলী তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া অতঃপর বাংলার সাহিত্যাকাশে গ্রহ-উপগ্রহের মত ঘূর্ণ্যমান ও দীপ্যমান হইয়া উঠিল, তাহারা তাঁহাকেই 'শনিবারের চিঠি'রও একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাহাদের চক্ষে আমি একজন অন্যতম বিশিষ্ট লেখক মাত্র। ইহার একটি প্রমাণ দিব। সজনীকান্তের পক্ষে

ইহার বোধ হয় প্রয়োজন ছিল,-কারণ ব্যবসায়ের দিক দিয়া স্বত্বাধিকার নির্বিঘ্ন হওয়া সত্ত্বেও যে খ্যাতির উপরে ঐ ব্যবসায় নির্ভর করে তাহাও প্রয়োজন; এবং সেজন্য 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠা ও তাহার যাহা কিছু সাহিত্যিক গৌরব তাহা যে প্রধানতঃ তাঁহারই প্রতিভার ফলে ঘটিয়াছে এই বিশ্বাস ঐ নূতন সাহিত্যিক ভক্তমণ্ডলীর মনে দৃঢ় করিতে পারিলে তাহাদেরই সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যের এই ভাঙা হাটে বা অরাজক মূর্খতা ও ধর্মহীন দুর্বলতার দিনে, একটা উচ্চাসন লাভ করা দুরূহ হইবে না। হইলও তাহাই। সজনীকান্ত ঐ পত্রিকা এবং তাহার ঐ লেখকগোষ্ঠীর খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের গোষ্ঠীপতি-রূপে সারাদেশের ভক্তিভাজন হইয়া উঠিলেন। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, এইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে তাঁহার নিজস্ব যোগ্যতা ছিল না—প্রচুর পরিমাণেই ছিল; সজনীকান্তের মত সামাজিক দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আমি অল্পই দেখিয়াছি—সে বিষয়ে তাঁহাকে একটি অসাধারণ জিনিয়াস বলিলেই হয়। রাজা জমিদার ও উচ্চতম রাজকর্মচারী হইতে নিম্নতমস্তরের মনুষ্যজীব পর্যন্ত সকলকেই,—যাহাকে যে-মন্ত্রে বশীভূত করা যায়—তাহার আশ্চর্য প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁহার আছে। মানুষের দুর্বলতা বুঝিবার এবং তাহার রস উপভোগ করিবার রসিকতাও যেমন, তেমনই সেই দুর্বলতাকেও কাজে লাগাইবার আশ্চয প্রতিভা তাঁহার আছে। ইহার উপরে আছে একরূপ সাহিত্যিক লেখনী চালনা-শক্তি—গদ্যে ও পদ্যে তিনি সেই ধরণের সাহিত্য রচনা করিতে পারেন, যাহা সেই কাল বা মুহূর্তের বড়ই উপযোগী—সাহিত্যাভিমানী অর্ধ-শিক্ষিত পাঠকমণ্ডলী যাহার চটকে মুগ্ধ হয়; এককথায় সজনীকান্ত একজন খাঁটি ও শক্তিমান Journalist; সাহিত্যের মজুরবৃত্তি এমন নিপুণ ও সুচতুরভাবে একালে আর কেহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র পূর্বলব্ধ ও বহু কষ্টার্জিত যে খ্যাতি, সেই খ্যাতিই হইল পরে তাঁহার প্রধান সম্বল; Journalist সজনীকান্ত, সাহিত্যব্যবসায়ী সজনীকান্ত জনচিত্তে বা বারোয়ারী বৈঠকখানায় যে আসনের অধিকারী হইয়াছেন, তাহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছে, সেই 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত—যে 'শনিবারের চিঠি' আমার ধর্ম ও আদর্শের অনুপ্রাণনায় এবং আমার লেখনীর দৃপ্ত ও সদাজাগ্রত সারস্বত উদ্দীপনায়, সকল কুৎসা ও সকল গ্লানির ঊর্ধ্বে একটি নিজস্ব মহিমায় সকল চিন্তাশীল রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সজনীকান্ত আমার সেই সাধনা ও তপস্যার কথা যেমন অবগত আছেন তেমন আর কেহ নয়। কিন্তু শেষে

তাহাই হইল তাঁহার খ্যাতির অন্তরায়; এজন্য তিনি যে সাহিত্যিক মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তাহাদের নিকটে আমার কাহিনী শুধুই গোপন নয়, একেবারে তুচ্ছ ও অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিলেন। ইহার একটি প্রমাণ দিব।

'বনফুল' ঐ সজনী-সহচর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর একজন খ্যাতনামা লেখক, তিনি 'জঙ্গম' নামে একখানি আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রচনা করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তিনি সজনীকান্তকেই নায়ক করিয়া—তাঁহার সংশ্লিষ্ট যত ক্ষুদ্রতর মানব চরিত্রের দ্বারা ঐ নায়ক চরিত্রের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছেন,—তাহাদেব চরিত্র চিত্রণও করিয়াছেন। ইহা যে সত্য, অর্থাৎ ঐ গ্রন্থখানি যে সজনীকান্তেরই চরিতাখ্যান তাহা শ্রীমান নিজেই সর্বত্র বন্ধুমহলে প্রচার করিযা থাকেন। ঐ পুস্তকখানি পাঠ করিলে, যাঁহাবা এককালে 'শনিবারের চিঠি'র অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, সজনীকান্তের মধ্যলীলায় সেই সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাঁহার অসাধারণ চরিত্র ও প্রতিভা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করেন। ঐ কাহিনীর একটি চরিত্রের নাম লোকনাথ ঘোষাল—চরিতামৃতকার ঐ চরিত্রে আমাকেই চিত্রিত করিয়াছেন, এবং সজনীকান্তের তুলনায় সে চরিত্র যে কত দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত, 'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ, এবং শেষ পর্যন্ত সে চরিত্র যে কিরূপ কৃপার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অতিশয় দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। চাপিয়া ধরিলে ইহার উত্তর অবশ্য আছে। তাহা এই যে, উপন্যাস উপন্যাসই, বাস্তবের কিঞ্চিৎ ছায়ামাত্র থাকা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়; কিন্তু কল্পনায় তাহাকে রসরূপে পরিণত করিবার জন্য কবির যথা-ইচ্ছা পরিবর্তন করিবার অধিকার আছে। ঐ চরিত্রগুলির রসরূপ যে কিরূপ হইয়াছে এবং তাহাতে রসরূপের পরিবর্তে লেখকেব নিজেরেই ব্যক্তিগত মতামত ও বাস্তব নিষ্ঠার যে অভিমানমূলক ঘোষণা আছে, তাহা যে কোন পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, বাঙালী পাঠক যদি একবার ঐ কল্পনার বাস্তব সূত্রটির সন্ধান পায়, তবে ঐ চরিতাখ্যানটিকে যে সর্বাংশেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের মত 'ভূয়োদর্শন' সম্পন্ন ব্যক্তিরও অবিদিত নাই। সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ যে কিরূপ ভয়ানক তাহা কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে—

"A lie that is half a truth is the blackest of lies,
That a lie which is all a lie may be met and fought with out-right.
But a lie which is part a truth is a harder matter to fight."

সজনীকান্তের বৈঠকেও বন্ধুগণ এখন আমাকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন—ইহাও শুনিয়াছি। 'জঙ্গমের' লেখক তাঁহার ঐ সুবৃহৎ চরিত্রাখ্যানটির জন্য যতকিছু ঐতিহাসিক মালমশলা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

তিন

ইহাই যে ইদানীং ভিতরে ভিতরে চলিতেছিল তাহার বহু ইঙ্গিত-আভাস আমি পূর্ব হইতেই পাইয়াছিলাম; তথাপি আমি তাহার জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই—হইলে আমি 'শনিবারের চিঠি'তে পূর্বাপর ঐরূপ একাগ্র ও একনিষ্ঠভাবে লিখিতাম না। মধ্যে দুই একবার অল্পকালের জন্য যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল,—তাহা ব্যক্তিগত কারণে নয়—পত্রিকার পরিচালনায় সম্পাদক-সজনীকান্তের আদর্শচ্যুতি বা স্বৈরাচারই তাহার কারণ। আমার বেনামী বা নামহীন রচনা—পাঠকগণের সহিত পত্র ব্যবহারে তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে—নিজ নামে আত্মসাৎ করার কথা একবার আমার কানে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি সম্পাদকের ঐ দুর্বলতা দেখিয়া কষ্ট পাইয়াছিলাম, সেই ঘটনার পরে সজনীকান্ত 'চিঠি'র সহিত আমার সম্পর্ক যে কি তাহার স্বীকারোক্তিমূলক এক বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমার নিজের সম্বন্ধে এতকথা লিখিবার তাৎপর্য এই যে, আমি মাসিক পত্রিকারূপে 'চিঠি'র সেই নবজন্ম হইতে, বাংলা সাহিত্যের যে আদর্শ রক্ষা এবং অনাচার নিবারণের জন্যই তাহাকে আমার জীবনেরই একটা ব্রতরূপে সেই যে অবলম্বন করিয়াছিলাম—তাহাতে আমার কোন ব্যক্তিগত বা বৈষয়িক স্বার্থচিন্তার লেশমাত্র ছিল না, সে ছিল আমার ধর্মসাধনার মুখ্য সহায়। এই ধর্মসাধনাও যে সবাংশে ধর্মসম্মত হইতে পারে নাই, তাহার একটা কারণ, চতুর্দিকে মিথ্যাচার ও বিরোধিতা, খুব সাত্ত্বিক শুচিতা পালনের দ্বারা, ভব্যতা ও শিষ্টতার অতিশয় নিরীহ নীতির দ্বারা, সেই অনাচারের উগ্রতা কিছুতেই প্রশমিত করা যাইবে না—ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল। সে বিশ্বাস মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন অনেক অকারণ ও অন্যায় আক্রমণ থাকিত যাহা সমর্থন না করিলেও সহ্য করিতে হইত; কারণ সববিষয়ে কঠিনতা অবলম্বন করিলে—আর একটা যে শক্তিকেও বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেই শক্তি স্ফূর্তির অভাবে

হতোদ্যম হইয়া পড়ে; একটা দিকে স্বাধীনতা না দিলে আমার কার্যও উপযুক্ত উৎসাহ লাভে বঞ্চিত হইতে পারে। তাছাড়া 'শনিবারের চিঠি'র যে আদি প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছি—তাহার সেই নিজস্ব ধর্ম একেবারে ত্যাগ করিবার কথাও ছিল না; সেই আদি প্রেরণা আমার নয়, আমি উচ্ছেদ সাধন করিবার অধিকারী নই—যখন তাহার কর্ণধার হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম—তখন তেমন কোন সর্ত উত্থাপন করিলে ঐ পত্রিকার সহিত আমার সম্বন্ধই ঘটিত না।

অতএব, 'চিঠি'র ঐ দিকটার সঙ্গে একটা রফা পূর্ব হইতেই ছিল—ঐ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শক্তি এবং তাহার প্রয়োজনও আমি পূরা স্বীকার করি, তবে তাহার মাত্রা নির্দেশ করিবার শক্তি আমার ছিল না, ইচ্ছা থাকিলেও আমি তাহা পারিতাম না। ধর্মনীতির ও কার্যনীতির মধ্যে এই যে আপোষ ইহা আমি সজ্ঞানেই করিয়াছিলাম, ইহার জন্য আমাকে অনেক অভিযোগ এমনকি দুর্নামও সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ সকলই সহ্য করিয়াছিলাম সেই কারণে, যে কারণে আমি আমার নিজেব ব্যক্তিগত সকল স্বার্থকে বিসর্জন দিয়াছিলাম। আমার সেই ধর্ম বা আদর্শনিষ্ঠা, আমার সাহিত্যিক চরিত্রের সেই নিঃস্বার্থতা আধুনিক বাঙালী সমাজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়া আমাকে অনেকে ভুল বুঝিয়াছিল। আমি যে বর্তমান সাহিত্যের এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রায় এককভাবে যুদ্ধ করিতে নামিয়া, কত দিকে কত মমতা কত হৃদয়াবেগ সবলে রুদ্ধ করিয়াছিলাম সেই সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হই নাই, বন্ধু বিচ্ছেদ, গুরুদ্রোহ কিছুই আমাকে নিরস্ত করিতে পাবে নাই, ভক্তের ভক্তি, শুভার্থীর স্নেহ সকলই আমি বিমুখ করিয়াছি—ঐ একখানি পত্রিকাকে জয়ী করিবার জন্য আমি নিজের জীবনের সকল পরাজয় সকল ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়াছি—সে যে কত বড় আত্মোৎসর্গ—সেদিন আমি নিজেও তাহা বুঝি নাই। একটা যেন কোন উর্ধ্বস্থ শক্তির প্রবল প্ররোচনায় আমি দীর্ঘ ১৬।১৭ বৎসর যেন এক অসম্ভবের রাজ্যে স্বপ্নসঞ্চরণ করিয়াছি। সজনীকান্তও এই কালে, তাঁহার অন্তরের অন্তরে যে বাসনাই প্রচ্ছন্ন থাকুক—তাঁহার গুরুরূপে আমার অনুসরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই শ্রদ্ধা ও সেবা তাঁহার প্রতি আমার ব্যক্তিগত স্নেহ ও প্রীতির কারণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার স্খলন-পতন-ত্রুটির মূলে যে আর কিছু ছিল অর্থাৎ আমার ধর্ম যে সত্যই তাঁহার

ধর্ম নয়, তাই তাহা পালন করিবার ভাণ, সর্বদা রক্ষা করা সম্ভব হইত না, এমন সন্দেহও আমার হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতেও আমি ভ্রূক্ষেপ করি নাই এইজন্য যে, যতদিন 'চিঠি'র দ্বারা আমার সেই আদর্শ প্রচার করার কোন সাক্ষাৎ বিঘ্ন না ঘটে, ততদিন সেইটুকুই পরম লাভ। আমি যে নিরঙ্কুশভাবে আমার চিন্তারাজি প্রচার করিতে পারিতেছি, সজনীকান্তের ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় যেমনই হোক তিনি যে উপস্থিত তাহার ভারবহন করিতেছেন ইহাই যথেষ্ট। 'চিঠি'র ব্যবসায়ের দিকটা তাঁহারই—সে পক্ষে তিনি 'চিঠি'র দ্বারা যতটা লাভবান হন তাহাতে আমার কিছুই বলিবার নাই, এবং উহাকে আশ্রয় করিয়াই যদি তিনি শ্রীমান ও ধনবান হইয়া উঠিতে পারেন তাহাতে আমারই আনন্দ হইবার কথা ; কারণ আমার জন্যই—আমার ঐ আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিতে তিনি যদি জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে সে যেন আমারই তাঁহার নিকটে ঋণী হইয়া থাকা।

কিন্তু সজনীকান্তের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র নয় তিনিও 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্' মন্ত্রের উপাসক। হইবার কারণ অবশ্যই আছে। তিনি যেমন কর্মকুশল তেমনি বুদ্ধিমান ; লোকব্যবহারে যেমন অসাধারণ পটুত্ব, তেমনই দেশের বর্তমান অবস্থায়—সাহিত্যিক, শিক্ষানৈতিক ও অর্থনৈতিক, সর্ববিধ দুর্বলতার বিষয়ে তাঁহার একটি প্রখর বাস্তব-বুদ্ধিও আছে। ইহার ফলে যদি তাঁহার কখনও এমন বাসনা হয় যে—

> কত বড় আমি—একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
> অধীর হয়েছে বক্ষকারায় শুধু সেই কামনাই !"

তবে সেই বাসনা চরিতার্থ করার মত সহজাত শক্তিও যেমন তাঁহার আছে, তেমনই দেশের ঐ অরাজক ও বেওয়ারিশ অবস্থা তাহার বড় অনুকূল হইয়াছে। অতএব শুধুই অর্থ নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তির পিপাসাও প্রবল হইয়া উঠিল, আবার তাঁহার পক্ষে ঐ দুয়েরই সাধনা একই পন্থায় সম্ভব হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধিলাভও সহজ হইয়াছে।

'শনিবারের চিঠি'র প্রথম পর্বকে 'যুদ্ধপর্ব' বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় পর্ব 'জয়পর্ব' এবং তৃতীয় ও শেষ পর্ব 'শান্তিপর্ব'। এই তিন পর্বকে একত্র করিয়া এখন যে অর্থ সুগোচর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ঐ সমগ্র কাহিনীকে 'সজনীপুরাণ' নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম পর্বে সজনীকান্ত অর্থ ও খ্যাতির কোনটার জন্যই চিন্তিত ছিলেন না ; আমিই ছিলাম তাঁহার প্রধান

খুঁটি. সেই খুঁটি ধরিয়া তিনি যে লড়াই করিতেন তাহাতে তিনি কেবল তাঁহার অস্তিত্বটি ভাল করিয়া ঘোষণা করিতেন। দ্বিতীয় পর্বে, আমি পূর্ববৎ বৃহন্মুখ রক্ষা করিতেছিলাম বটে, কিন্তু ঐ কালে সজনীকান্ত, সাক্ষাতে না হইলেও পরোক্ষে, কয়েকজন উদীয়মান ও শক্তিমান সাহিত্যিককে দলভুক্ত করিয়া নিজের পৃথক নায়ক-পদের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। 'চিঠি'র সাহিত্যিক খ্যাতি তখন সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে—সেই খ্যাতির প্রধান কারণ কি এবং তাহা প্রধানতঃ কাহার জন্য—সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেই খ্যাতির সবটুকুই নিজের ভাগে টানিয়া লইবার কৌশলও তখন সফল হইতে চলিয়াছে। এ পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি' ব্যবসায়ের দিক দিয়া কিছুই করিয়া উঠতে পারে নাই—করিবার উপায়ও ছিল না; কারণ তাহা হইলে উহার ঐ প্রতিপত্তি মুহূর্তেই বিনষ্ট হইত—ন্যায় ও সত্যের জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রামের সেই মহাব্রত লোকচক্ষে তেমন বিস্ময়কর হইয়া উঠিত না। তাই প্রথম পর্বে সজনীকান্ত সন্ন্যাসীর কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে দূরদর্শিতার সংযম ও ব্রত ধারণের সহিষ্ণুতা। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্বে তিনি ধীরে ধীরে বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন—কৌপীনের উপর আলখাল্লা চড়াইলেন, একটি বড পাগড়ীও পরিধান করিলেন। সাহিত্যের উদ্ধার ও দেশহিতব্রতের নামে তিনি তাঁহার শনিরঞ্জন প্রেসটিকে পুস্তক প্রকাশের বদরিকাশ্রম করিয়া তুলিলেন—উহা হইতে সুপক্ব ও সাত্ত্বিক সাহিত্য-বদরী ভিন্ন আর কিছুই নির্গত হইবে না। 'শনিবারের চিঠি'ও অতঃপর সুলভ গল্প-উপন্যাসের দিকে ঝুঁকিল, হীনযান ত্যাগ করিয়া মহাযানে পদার্পণ করিল। এই সময়েই সজনীকান্তের ভবিষ্যৎ ব্যবসাযটির ভিৎপত্তন হইল। বাহিরে তখনও 'শনিবারের চিঠি'র সেই ভেক বজায় আছে বরং তাহাঁরই দৌলতে সেই ধমকের জোরে পূর্বের সেই শত্রু-সমাজ কাবু হইয়া আসিল; ক্রমেই তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া সজনীকান্তকে সমাজপতি পদে বরণ করিতে আর আপত্তি করিল না; যাহারা তখনও অবাধ্যতা করিতেছিল তাহাদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য 'শনিবারের চিঠি'র দণ্ড তখনও আস্ফালিত হইতে লাগিল।

ইহা বাহিরের ব্যাপার, আমি তখনও ভিতরে থাকিয়া সেই আদর্শই ধরিয়া আছি; সজনীকান্ত তখন নিজের খ্যাতি ও ধনমান বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ তাহাকে কাজে লাগাইতেছিলেন মাত্র। পূর্বে বলিয়াছি, 'চিঠি'র প্রথম পর্বে তিনি একরূপ কৌপীনকন্থা ও উপবাসকেই বরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্যবসায়ের

আলখাল্লা তাহাতে যুক্ত হইল, 'চিঠি' গল্পে ও উপন্যাসে ভরিয়া উঠিল, এবং আমার ঐ আদর্শটিকে কোনরূপে বজায় রাখিয়া সে এক্ষণে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহাজন-পন্থায় নূতন অভিযান সুরু করিল। সাহিত্যের যে অনাচার নিবারণে সে এতদিন ধুন্ধুমার কাণ্ড করিতেছিল, এক্ষণে সেই অনাচার সম্পর্কে অতিশয় উদারতা প্রদর্শন করিতে লাগিল—যৌনব্যাধির দুর্নীতিকেও যেমন, কম্যুনিজমকেও সে তেমনই রথে তুলিয়া লইল, যদিও বৈঠকখানায় ফরাসে বসিয়া তাহাকে গালি দিতে নিবৃত্ত হইল না। আসলে সে এক্ষণে সর্বজন-বন্ধু হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে 'চিঠি'র আর্থিক অবস্থার যেমন দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল, তেমনই সজনীকান্ত বাংলা সাহিত্যের মহামুরুব্বি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সকলের মূলে যে প্রখর বুদ্ধি, কর্মকুশলতা ও লোক-ব্যবহার-পটুতা এবং সর্বোপরি তাঁহার লেখনীর নিরঙ্কুশ বাচালতা ও চতুরতা ছিল, তাহাই তাঁহার ভাগ্যোদয়ের প্রধান কারণ—ইহা অস্বীকার করি না। সেও যে একটা বড় প্রতিভা এবং তাহা যথাসময়ে ও যথাসুযোগে পূর্ণ প্রস্ফুরিত হওয়ায় তিনি যে শনিবারের চিঠি'র তৃতীয় পর্বে অন্যান্য পত্রিকাধিকারীর মত তাহাকেও বাংলার জনগণমনের অধিনায়ক করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। বাঙালীর চরিত্র ও মস্তিষ্ক এই উভয়ের যে অবস্থা বর্তমানে ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে, সজনীকান্তের প্রতিভার পক্ষেও তাহা যে কতখানি সুবিধাজনক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ অন্য সকল ক্ষেত্রেও মিলিবে, সজনীকান্তও কোন লগ্নকে ভ্রষ্ট হইতে দেন নাই, সর্বশেষে তিনি গান্ধীকংগ্রেসের জয়ঢাক পিটাইয়া এবং কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসায়-বুদ্ধির চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িলেন। ইতিপূর্বেই তিনি বাংলার সকল সাহিত্যসভার একচ্ছত্র সভাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে গান্ধীবাদী ব্যবসায়ীগণের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া সাহিত্য ও সুবিধাবাদ, সভাপতি ও ধনপতি এ দুইয়ের বিরোধভঞ্জন করিলেন। বর্তমানে তিনি বাঙালী সাহিত্যিকসমাজের যেমন সমাজপতি, তেমনই জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তা ধর্মের সঙ্কট-ত্রাণ-যজ্ঞেরও যজ্ঞেশ্বর ত্রিকালদর্শী ঋষির পদে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

এইরূপ যখন অবস্থা, অর্থাৎ ঐ তৃতীয় পর্ব যখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখন আমি নিয়তির অজলীলার বশে সেই দূরাবস্থান ত্যাগ করিয়া 'চিঠি'র 'প্রত্যাসন্ন' হইয়া পড়িলাম। সজনীকান্ত তখনও 'চিঠি'তে আমার সেই লিখিবার অধিকারটুকুই বরদাস্ত করিতেছিলেন। সে কেমন অধিকার? আমি আমার

সেই এক ধর্ম ও এক আদর্শের যে নির্বোধ ভাবালুতা তখনও বর্জন করি নাই এবং কখনও করিব না, সজনীকান্ত আমার সেই মূঢ়তার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এবং হয়ত বা কোথায় কি যেন একটা বিবেকের অস্বস্তি দূর করিবার জন্য, প্রথম প্রবন্ধের স্থানটুকু ('প্রসঙ্গকথা' তখন প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি) আমাকে পূর্বের মত অধিকার করিতে দিলেন। পয়সা দিতে হয় না—কখনও চাহিবে না, তাহা জানিতেন; আহা, বেচারী যদি একটু লিখিয়াই সুখ পায়, না হয় লিখুক; ও লেখা আর এখন কে পড়িবে? যাহারা পড়ে তাহারাও 'জনগণমনের' প্রতিনিধি নয়; বরং ঐরূপ লেখা এই জনমনো-মোহিনী পূর্ণ যৌবনা সরস্বতীর গণ্ডে চতুর্মুখের শ্মশ্রুকন্টকময় চুম্বনের মত। তাছাড়া উহার ঐ মূর্তি 'চিঠি'র সেই পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়, আধুনিক ভক্ত পাঠকগণের সম্মুখে তাহার আবির্ভাব আদৌ নীতিসঙ্গত নয়। আপদই বটে! এ যেন সেই সিন্দবাদের স্কন্ধে বুড়াটার মত—কিছুতেই নামিবে না! আমি তখনও ভাবখানা ঠিক বুঝিতে পারি নাই; তার কারণ সজনীকান্তের বাহ্যিক আচার, ব্যবহারের যথাযোগ্যতা ও অনিন্দনীয়তা সম্বন্ধে সাবধানতা প্রকৃতই মহাপুরুষসুলভ। তিনি বাহ্যতঃ আমার সহিত আত্মীয়তার সেই পুরাতন ভঙ্গিটি যথাসাধ্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন. প্রথম প্রথম আমার দূর নিবাসে কয়েকবার যাতায়াতও করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমেঃ অতি ধীর ও অলক্ষ্যভাবে তাঁহার ব্যবহারে পরিবর্তন সুরু হইল। প্রথম বুঝিতে পারি নাই, পরে আমার এই স্থূলবুদ্ধিকেও তাহা সচেতন করিয়া তুলিল; আমিও তখন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অতিশয় প্রচ্ছন্ন যে একপ্রকার অবজ্ঞা আছে. যাহা অনুভব করা যায়, অথচ স্বীকার করানো যায় না, সেইরূপ অবজ্ঞা ক্রমেই নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। পরীক্ষাচ্ছলে আমি আমার প্রবন্ধ রচনারই প্রয়োজনে দুই একটি তুচ্ছবস্তুর অভাবের কথা জানাইলে, তিনি সেই অভাব পূরণের ছলে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সজনাকান্তের মত শিষ্টাচার-নিপুণ সৌজন্যকলাবিদ্ ব্যক্তির পক্ষে অভাবনীয় বলিয়াই মনে হইবে। আরও লক্ষণ ক্রমেই দেখা দিতে লাগিল। আমার প্রবন্ধের জন্য আর তাগিদ আসিত না, নিজেই পিতৃমাতৃদায়ের মত লোক মারফৎ পৌছাইয়া দিতে হইত। এমন কথাও (তাঁহার মুখে নয়) তাঁহার প্রেসের পরিজনদের মুখে শোনা যাইতে লাগিল যে, এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের শাসনে পত্রিকার কলেবর যেরূপ শীর্ণ হইতে চলিল, তাহাতে আমার ঐ দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য প্রবন্ধের জন্য স্থান সঙ্কুলান একটা সমস্যা হইয়া

পড়িয়াছে। তখন 'চিঠি'তে 'বাংলার নবযুগ' চলিতেছে, আমি তাহা শেষ করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলাম। সেই সময়ে আমার স্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি সেই অবস্থাতেও কেমন করিয়া ঐ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলাম তাহা অন্তর্যামীই জানেন। ইহার উপর বাহিরের ঐ সম্বর্ধনা! কারণটি অতিশয় জটিল ও গভীর সন্দেহ নাই—আমি তখন 'শনিবারের চিঠি'র আদ্যন্ত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ ও চিন্তন করিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ মাত্র এই প্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছি—বাকি যাহা তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত করিবার নয়।

চার

'নবযুগ'ই 'শনিবারের চিঠি'তে আমার শেষ অনধিকার চর্চা। আমি বুঝিয়াছিলাম—ঐ লেখাটি কোনরূপে শেষ করিতে পারিলে, আমার প্রাণ না হউক মান বাঁচাইতে পারিব। উহার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সহসা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। প্রায় দুই সপ্তাহকাল অতিশয় আশঙ্কার মধ্যে কাটাইলাম। সজনীকান্তকে ইহার সংবাদ পাঠাইলেও তিনি পত্রযোগে দুইছত্র লিখিয়াও আমার কোন সংবাদ লন নাই। সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম কিন্তু দেহ সত্যই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাই আমি 'নবযুগে'র শেষে পাঠকগণের নিকটে যে বিদায় লইয়াছি তাহাতে একসঙ্গে তিনরূপ বিদায় ছিল —প্রথম, ঐ গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে বিদায়, দ্বিতীয়, 'শনিবারের চিঠি' হইতে বিদায়, তৃতীয়, বাংলা সাহিত্য হইতে বিদায়, কারণ আসন্ন মৃত্যুর ভয়ও ছিল। ইহার বেশ কিছুদিন পরে, বোধ হয় শিষ্টাচার-ভঙ্গের অপবাদ দূর করিবার জন্য, সজনীকান্ত আর একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি যে আর অন্ততঃ কিছুকাল লিখিব না সে বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত হইয়াছিলেন কি না তাহা তখনই নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারি নাই—পরে পারিয়াছিলাম, কারণ ভাব গোপন করিবার এবং ব্যবহারে বাহ্যিক ত্রুটি নিবারণ করিবার তাঁহার যে কলাকুশলতা আছে তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ।

কিন্তু এমন অবস্থা আর কতদিন চলিতে পারে? কথায় আছে 'খেদাই না, তোর উঠান চষি'—অর্থাৎ আমি তোমাকে তাড়াইয়া দিতেছি না, কেবল তোমার উঠানে লাঙল চালাইতেছি মাত্র। সজনীকান্ত এতদিন এই নীতিই

অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু তবু কেমন যেন কোথায় একটা ভবিষ্যৎ আশঙ্কা রহিয়া গেল, অঙ্কুরটিও বিনষ্ট করিতে না পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। উভয়পক্ষেই যে সন্তাপের ভাগ তখনও রহিয়া গেল—কেমন করিয়া তাহা হইতেও মুক্ত হওয়া যায়? সজনীকান্ত আমার সহিত সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করিতেই উৎসুক, এমন কি কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু ব্যাপারটি এমন করিয়া সাধন করিতে হইবে যেন, তাবার সব কিছু দোষ আমারই উপরে পড়ে—অন্ততঃ কেন যে এমনটা হইল বাহিরে তাহা প্রকাশ না পায়, পাইলে তাঁহার সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তির একটু হানি হইতে পারে। যদিও তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু সজনীকান্ত সেটুকু হানিও এড়াইতে চাহিলেন। প্রায় ৪ ৫ মাস আমি আর লিখি না, সজনীকান্ত তাহার একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইলে দিতে পারিতেন, তাহা এই যে, আমি অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি এখন আর লিখিতে পারিব না। কিন্তু আমার লেখা একেবারে বন্ধ করাই ছিল তাঁহার নিজের ও পত্রিকার পলিসির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমি দেখিলাম, তিনি আমার এই দীর্ঘ লিখন বিরতির কোন কৈফিয়ৎ তাঁহার পাঠকবর্গকে দিলেন না—যদিও অনেকের তাহাতে বিস্মিত হইবার কথা, কারণ 'শনিবারের চিঠি' যে একাংশে আমারই সৃষ্টি, আমার সহিত তাহাব আর্থিক সম্বন্ধ না থাকিলেও একটা পরমার্থিক সম্বন্ধ অতিশয় সত্য—তাহ 'চিঠি'র বহু পাঠক– বিশেষতঃ যাহারা আদি হইতে উহার গ্রাহক—তাহারা জানে। অতএব আমার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদের কারণ তাহারা জানিতে চাহিবে। সজনীকান্ত বাঙালী সমাজকে ভালোরূপেই জানেন, তাই তাহাদের সেই কৌতূহল তৃপ্ত না করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেওয়াই সুবুদ্ধিসঙ্গত মনে করিলেন। পরে এ সম্বন্ধে বহু পাঠকের পত্র আমি পাইয়াছি এবং বাধ্য হইয়া নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়াছি।

চারি-পাঁচ মাস পরে একদা সজনীকান্ত কলিকাতায় আমার এক বন্ধুর বাসায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—তাহার কারণ আ ন আর তাঁহার দ্বারস্থ হইতে ইচ্ছুক ছিলাম না। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় ব্যাপারটাকে গোপনে ধামাচাপা দেওয়া—আমার মনে যাহাতে কোন ক্ষোভ না থাকে। সেজন্য অনেক বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন এবং আমি যে আর লিখিব না তাহা বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন। সেখানে আরও দুই একজন উপস্থিত ছিলেন, আমি সেই সুযোগে সাক্ষী প্রমাণ ঠিক রাখিবার জন্য সজনীকান্তের আন্তরিকতা

পরীক্ষাচ্ছলে একটা অভিযোগ করিলাম। এ অভিযোগ পূর্বেও অনেকবার করিয়াছি, তাহাতে সজনীকান্তের ধর্মবুদ্ধির পরিচয় বহুবার পাইয়াছি। 'শনিবারের চিঠি'তে আমার রক্ত জল করা বহু প্রবন্ধ আমি চিরদিন দান করিয়া আসিয়াছি—তাহার প্রতিদান আমি কখন কামনা করি নাই—ইহা পূর্বে বলিয়াছি; কিন্তু তথাপি সামান্য একটু অধিকার দাবী করিয়া আমি আমার বইগুলির একটা বিজ্ঞাপন উহাতে নিয়মিতভাবে দিবার অনুরোধ বহুবার জানাইয়াছি। সে অনুরোধ কখনও সম্যক্ বা নিয়মিতভাবে পালিত হয় নাই। আমি এইবার পুনরায় সেই কথা উত্থাপন করিলাম এবং 'চিঠি'তে আমার বইগুলির বিজ্ঞাপন যেন নিশ্চিত দেওয়া হয় ইহাও বিশেষ করিয়া জানাইলাম আমি জানিতাম এ অনুরোধ রক্ষিত হইবে না—বিশেষতঃ এই অবস্থায়; কারণ সজনীকান্ত এখন আমাকে প্রায় স্পষ্টভাবেই 'চিঠি' হইতে বিদায় হইতে বলিতেছেন—কেবল মুখে একটা ভদ্রতার ভাণমাত্র না করিলে নয়, তাই এইসব অভিনয়। আমি সেই সাক্ষীদিগকে তখনই বলিয়াছিলাম—সজনীকান্ত এইবার একটা বড় সুযোগ পাইবেন, আমার ঐ অনুরোধ লঙ্ঘনের দ্বারাই তিনি পরোক্ষে আমাকে জানাইয়া দিবেন—তিনি সত্যই আমার সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। অথচ মুখে কিছুই বলিতে হইল না—এতদিনে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিতের সুযোগ পাওয়া গেল। আমি তাহাই চাহিয়াছিলাম—মুখে তিনি কিছুই বলিতেন না। এইবার আচরণঘটিত একটা অতিশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলিবে এবং তাহা কাহারও নিকট ঢাকা দেওয়া যাইবে না। সজনীকান্ত সেই বিজ্ঞাপন দিলেন না অর্থাৎ আমার মুখের উপরে চাবুক মারিলেন। কেহই কিছু জানিল না—'শনিবারের চিঠি' এতদিনে আমাকে পদাঘাতের দ্বারা বহিষ্কার করিয়া দিল। ততদিনে সজনীকান্ত কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ গঠন করিয়া জনগণচিত্তে উত্তুঙ্গ আসন অধিকার করিয়াছেন: 'শনিবারের চিঠি'তে 'গান্ধী পরিকল্পনা' ও 'হরিজন সেবা র মোচ্ছব লাগিয়া গিয়াছে।

এই বিবৃতি যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারা এই ঘটনায় আমার যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমার ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির দুঃখ ইহাতে নাই—আমার নিজের জীবন বলিয়াও নহে, ইহা যে জীবনের আঘাত, তাহা আমার একার জীবন নহে। আমার সাহিত্যিক জীবনের যাহা কিছু কামনা ও সাধনা তাহা ঐ পত্রিকাখানিকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ব্যক্তিগত সকল

স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছিলাম; আমার সেই আদর্শ অটুট ও অবিচলিত রাখিবার জন্ত আমি সকল সম্মান, সকল সামাজিক বন্ধন, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের দাবী, সকলই অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, করিয়াছিলাম বলিয়াই 'শনিবারের চিঠি' বাংলা সাহিত্যে একটা নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা এবং সাহিত্যিক স্থিরদৃষ্টির (গভীর না হউক) জন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। আমিই বঙ্কিম-মধুসূদন প্রভৃতির প্রতি রস-পিপাসু ও ধর্মনিষ্ঠ বাঙালীর শ্রদ্ধা পুনরুজ্জীবিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের স্বধর্ম ও তাহার ঐতিহ্য বিষয়ে বাঙালীকে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আধুনিক সাহিত্যের আধুনিক দৃষ্টি-সম্মত বিচার আমিই প্রবর্তন করিয়াছিলাম এবং তাহারই আলোকে সবপ্রকার কুসংস্কার, কু-রীতি ও কু-প্রবৃত্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলাম। এই কাজ সমাপ্ত হয় নাই, আশা করিয়াছিলাম, আরও বিশেষ ও ব্যাপকভাবে সৃষ্টিমূলক সমালোচনা দ্বারা আমি আমার জীবনের ঐ ব্রতটি আরও সুসম্পন্ন করিতে পারিব—তজ্জন্য ঐ পত্রিকাই আমার উপযুক্ত সহায় হইবে। যাঁহারা আমার 'বাংলার নবযুগ' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, আমি অতঃপর বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে কিরূপ গভীরতররূপে ধরিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এই সকল চিন্তা কেবল পুস্তকে নিবদ্ধ করিলেই চলিবে না—যতদূর সম্ভব প্রচারিত করার যে প্রয়োজন আছে, তাহার জন্ত ঐ 'শনিবারের চিঠি'কেই আমি কি কারণে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিয়াছিলাম, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমার জীবনের সেই ব্রত পালনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রিকার উন্নতি ও অভ্যুদয় হইয়াছিল। শেষে উহার ধর্মান্তর গ্রহণ যে কারণে ঘটিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস-ভঙ্গ জনিত দুঃখ যেমনই হোক—ইহাই বুকে শেলের মত বাজিয়াছে যে, সজনীকান্ত আমার সেই বুকের রক্তে গড়া বেদীটির উপরই তাঁহার ব্যবসায়ের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছেন, আমার সেই তপস্যার যে ফলটুকু তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া একসঙ্গে গাছের পাড়িতেছেন তলারও কুড়াইতেছেন। সজনীকান্ত যে এক্ষণে বাংলা সাহিত্যের মহারথী হইয়াছেন, একটি বিরাট যজমান-সম্প্রদায়ের পুরোধাপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন—তাহার সাক্ষাৎ কারণ আছে জানি, সে কারণ পূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, বাঙালী সমাজকে মুগ্ধ ও ভক্তিভারাবনত করিবার—বিশেষ করিয়া তাহার snobbery-প্রীতি চরিতার্থ করিবার যতকিছু গুণ সবই তাঁহার আছে; যজমান ও পুরোহিতের মধ্যে এমন পরিপূর্ণ সাযুজ্য অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। তথাপি, তাঁহার এই

আচার্যত্ব লাভের মূলে বা তাহার তলদেশে আমারই মস্তক ও আমারই বক্ষঃস্থল যে পাদপীঠরূপে বিরাজ করিতেছে, ইহা সত্যই আমার পক্ষে মৃত্যুর অধিক হইয়াছে। তার কারণ, আমার ব্রতই যে অর্ধপথে পণ্ড হইয়াছে তাহা নহে, তাহার সেই পুণ্যটুকুই মূলধন করিয়া এই কারবার অতি সহজে বিস্তার লাভ করিয়াছে; মুনাফার বিপুলতায় এখন তাহা আর যেমন লক্ষ্যগোচর হয় না, তেমনই আমার সেই ধর্ম একটি মুখোসের মত সজনীকান্তের ঐ অপর ধর্মকে সাত্ত্বিকতায় মণ্ডিত করিয়াছে। যে সত্যের বেশে মিথ্যা আজ দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিতেছে, তাহা যে আমিই তৈয়ারী করিয়াছিলাম—এই চিন্তাই মর্মান্তিক হইয়াছে।

এই ঘটনা খুব বড় ঘটনা নহে; ইতিহাসের কাহিনীতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন আছে। তথাপি, আমি ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম এইজন্য যে, বাংলাদেশে বাঙালী সমাজে যে নিদারুণ অধর্ম ও মিথ্যাচার এই কালে যেন তাণ্ডবলীলায় মাতিয়াছে, তাহা রোধ করিবার যেমন কেহ নাই, তেমনই একটা বিশেষ ক্ষেত্রে তাহা রোধ করিতে গিয়া আমি কি শাস্তি পাইয়াছি তাহার একটু পরিচয় হয়ত ভবিষ্যতে এ জাতির আত্ম-পরীক্ষার কাজে লাগিতে পারে। আমি কোন বড় প্রতিভা বা বিশিষ্ট শক্তির দাবী করিতেছি না, কিন্তু একটা বস্তু আমার ছিল, তাহা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-নিষ্ঠা; তার সঙ্গে হয়ত একটু মনন শক্তিও ছিল। এ সকলের দ্বারা আমি যেটুকু সাময়িক সফলতা লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে আশা ছিল, আমি এ-কালে এই জাতির এই সমাজে একটুকুও চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিব, তাহাতেও মঙ্গল হইবে। কিন্তু বিধি বাম; যে আত্মহত্যার পথে চলিয়াছে তাহাকে বাঁচাইবে কে? সেই পথ প্রশস্ত করিবার জন্য এ-কালে যাহাদের অভ্যুদয় হইতেছে, সজনীকান্ত তাহাদেরই একজন। এখন কেহ তাহা মানিবে না, কিন্তু একদিন বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে এ কাহিনী স্মরণ করিতেই হইবে, তখন আমার এই কথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আর থাকিবে না; আমি জানি, যে সত্যকে আমি আশ্রয় করিয়াছিলাম তাহার বিনাশ নাই।

১২.৫.১৯৩৭

গ্রন্থ পরিচয়

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত মোহিতলালের রচনাগুলির প্রয়োজনীয় পরিচয়সহ একটি তালিকা তৈরি করে দিলাম। এর বাইরে তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে এবং কিছু কিছু প্রকাশিত রচনা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় নি। সবগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশিত করলে এখনও স্বচ্ছন্দে তিন-চারখানি গ্রন্থ বেরুতে পারে। বাংলাদেশের রসিকবৃন্দের সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—

ক. কাব্য :

১. দেবেন্দ্র-মঙ্গল। প্রথম প্রকাশ—১৩১৯, ১লা কার্তিক। ষোলটি সনেট।

২. স্বপন-পসারী। প্রথম প্রকাশ—শ্রীপঞ্চমী ১৩২৮। উৎসর্গ—তোমাকে।

"প্রথম বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই; গত দশ বৎসরে যাহা লিখিয়াছি তাহারই কতক বাদ দিয়া বাকি কবিতাগুলি একত্র করিয়া দিলাম। 'উচ্চৈঃশ্রবা' শীর্ষক কবিতাটি ভিক্টর হিউগোর অনুসরণে লিখিত।" (গ্রন্থকারের নিবেদন)।

সূচী :—উৎসর্গ-কবিতা, স্বপন-পসারী; রূপ তান্ত্রিক, দিল্‌দার, চোখের-দেখা; পুরূরবা; বসন্ত-আগমনী: চূত-মঞ্জরী, কিশোরী; নারী; শ্রাবণ-রজনী; চুড়ির আওয়াজ; ভাদরের বেলা; পরম-ক্ষণ, কবি-ভাগ্য; সাগর ও শশী; একখানি চিত্র দেখিয়া, তারকা ও ফুল: মৃত্যু; ক্ষ্যাপা; অমৃতের পুত্র; অ-মানুষ; অঘোর-পন্থী, পাপ, নাদিরশাহের জাগরণ; নাদিরশাহের শেষ; মহামানব; আবির্ভাব, দেবেন্দ্রনাথের সনেট; কবি করুণানিধানের প্রতি: উচ্চৈঃশ্রবা; কলস-ভরা, ঘরের বাঁধন; গজল্‌-গান; হাফিজের অনুসরণে, ইরাণী; শেষ-শয্যায় নূরজাহান, বেদুঈন, পূর্ণিমা-স্বপ্ন; কল্পনা; প্রেত ও সতীধর্ম; কর্মফল মুক্তি, লীলা ভ্রান্তি-বিলাস; বিদায়-বাদল; পরাজয়; জন্মান্তরে; কেতকী, আঁধারের লেখা, কামনা॥

৩. বিস্মরণী। প্রথম প্রকাশ—শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৩। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিবরেষু।

সূচী :—উৎসর্গ কবিতা, মানস-লক্ষ্মী, ব্যথার আরতি, স্পর্শ-রসিক; মোহমুদ্গর, পান্থ; কালাপাহাড়, শব-সঙ্গীত সুইনবার্নের অনুসরণে; অকাল-সন্ধ্যা; দীপ-শিখা, অগ্নিবৈশ্বানর, নূরজহান ও জহাঙ্গীর, মাধবী; কন্যা-শরৎ, শিউলির বিয়ে, বাদল-রাতের-গান; বাঁধন, পথিক, মৃত-প্রিয়া, মৃত্যু-শোক, ঘুঘুর ডাক, সত্যেন্দ্র-বিয়োগে, নবতীংকর, মৃত্যু ও নচিকেতা, বিস্মরণী॥

৪. স্মর-গরল। প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে বন্ধুবরেষু।

"এই কবিতাগুলি 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী'র ক্রমানুবন্ধী– একই ধারার পরিণতি। 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী' যদি কাহারও ভাল লাগিয়া থাকে, তবে এই কবিতাগুলিও তাঁহাদের কৌতূহল উদ্রেক করিবে, ইহাই মনে করিয়া 'স্মর-গরল' প্রকাশিত করিলাম।" (লেখকের নিবেদন)

সূচী —উৎসর্গ-কবিতা, স্মর-গরল, মিলনোৎকণ্ঠা, রূপ-মোহ; বিভাবরী, রতি ও আরতি, দেবদাসী, নারীস্তোত্র, রুদ্র-বোধন বসন্ত-বিদায়, চাঁদের বাসর, নিশি-ভোর, দিনশেষে; জোৎস্না-গোধূলি, নির্বাণ; নতুন আলো, শেষ-শিক্ষা, প্রেম ও জীবন, বুদ্ধ, কবি-বরণ, বিদায়-বাসনা; শেষ আরতি। প্রেম ও ফুল: প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব। সনেট-সমূহ: পয়ার, কবিধাত্রী, ত্রিস্রোতা, বঙ্গলক্ষ্মী, আহ্বান, জন্মাষ্টমী, রুপার্ট ব্রুক; বিবেকানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এক-আশা শ্রাবণ-শবরী, বন-ভোজন, চৈত্র-রাতে, পৌর্ণমাসী, নিশুতি, নিশান্তে, বিদায়॥

৫ হেমন্ত-গোধূলি। প্রথম প্রকাশ–শ্রাবণ ১৩৩৮। উৎসর্গ–মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে।

"যেসকল কবিতা পূর্বে লিখিত হইলেও প্রকাশিত অথবা সুপ্রচারিত হয় নাই এবং আবও যেগুলি সর্বশেষের রচনা, সেইগুলিকে এই পুস্তকে সঞ্চয় করিলাম।

"এবারে আমি এই সঙ্গে কতকগুলি বিদেশী কবিতার অনুবাদও মুদ্রিত করিলাম, এগুলির অধিকাংশ বহুপূর্বে রচিত ও বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার এরূপ অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা অল্প নয়;

ইচ্ছা ছিল সবগুলিকে একখানি পৃথক পুস্তকে সংগ্রহ করি। নানাকারণে তাহা এ পর্যন্ত সম্ভব না হওয়ায় এবং বর্তমানে কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ায়; আমি নিজের ও পরের কবিতা একই মলাটে একই বাঁধনে বাঁধিয়া দিলাম।...

"এই কবিতাগুলির সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার অনুবাদ যেমন মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ নয়, তেমনই, ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়। অর্থ অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্য দিলেও আমি মূলের বাণীছন্দকে যতদূর সম্ভব বাংলায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা আমারই, এবং তাহা বাংলা বলিয়া যেটুকু রূপান্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্য এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনা হিসাবেই অধিক—এরূপ দাবী আমি করিব না; পাঠকগণকে কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে বলি—এগুলি বাংলা এবং কবিতা হইয়াছে কিনা, তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে ইহাদের কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস, সবগুলি সমান না হইলেও, কতকগুলি—অনুবাদ এবং কবিতা, দুই-ই হইয়াছে।" (ভূমিকা)।

সূচী:—উৎসর্গ কবিতা; হেমন্ত-গোধূলি, স্বপ্ন-সঙ্গিনী, অকাল-বসন্ত, ফুল ও পাখী, বিধাতার বর, অশান্ত, দুঃখের কবি, প্রশ্ন, বনস্পতি, কালবৈশাখী, অন্তিম, রবির প্রতি, মধু-উদ্বোধন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, ফেরদৌসী, রূপকথা, বাংলার ফুল, বুদ্ধিমান, কন্যা-প্রশস্তি, উষা; বধূ-বাসন্তী, শ্রীপঞ্চমী, প্রীতি-উপহার, যৌবন-যমুনা, বালুকা-বাসর, শুভ-ক্ষণ; রূপ-দর্পণ; নির্বেদ; প্রকাশ, উপমা, গঙ্গাতীরে; মিনতি, স্বপ্ন নহে, অজ্ঞান, যাত্রাশেষে; পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে; বাণীহারা, সার্থক।

বিদেশী কবিতা: প্রারম্ভিক কবিতা; নমস্কার, আবেদন; কবি-গাথা, গন্ধ ও পদ্ম, সৃষ্টির আদিতে; নাগার্জুন; প্রেতপুরী; অন্তর-দাহ, প্রেমহীন, নিঠুরা-রূপসী; শ্যালট-বাসিনী, ভাগবত-পাঠ, গান, মনে রেখো; বন্দি, জন্মদিন; দুর্গম; প্রেমের পাঠ; আমার প্রিয়তমা, এমন রবে না; দ্বিতীয়বার; চরম দুঃখ; জীবন-মরণ; ঘোষণা, প্রেমের স্বরূপ; গুপ্তকথা, কৈফিয়ৎ; পত্নীহারা; মরা-মা; খেলনা; অন্ধ কবি; শরাবখানা; গজল, ফার্সি-ফরাস; মৃত্যুর প্রতি; মৃত্যুর পরে, নিশীথ-রাত্রি, সোমপায়ীর গান, সন্ধ্যার সুর; অন্ধকার; নিদালি।

৬. রূপকথা। কিশোর কাব্য। প্রথম প্রকাশ—১৩৫২। উৎসর্গ—অমিয়া ও অরুণা।

"…এই কবিতাগুলি ঠিক শিশুপাঠ্য নহে; ইহাদের কাব্য-রস কিশোর বা বালক-মনের উপযোগী। ভাব ও ভাবনার যেটুকু প্রসার ইহাতে আছে তাহা অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ, এবং ভাষাও কুত্রাপি কঠিন নহে; এজন্য কাব্য-রসপিপাসু কিশোর ও কিশোরীদের হাতে আমি এই ক্ষুদ্র কবিতা-গুচ্ছ নির্ভয়ে তুলিয়া দিলাম।" (নিবেদন)।

সূচী:—উৎসর্গ কবিতা; রূপকথা; জাগো, ঘুমভাঙানি; মায়ের প্রতিমা; পূজার পোষাক; চালাক জগাই; আড়ি ও ভাব; শান্ত খোকা; ভোলানাথ; পুষ্প-জীবন; শ্রাবণের কবিতা; বীর-গাথা; শিউলির বিয়ে; রাজ-বেশ; ঘুম-পাড়ানি॥

৭. ছন্দ-চতুর্দ্দশী। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৫৮। উৎসর্গ—কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন স্মরণে।

এই কাব্যের সমস্ত সনেট কবির পূর্বে প্রকাশিত 'স্বপন-পসারী' 'বিস্মরণী' 'স্মর-গরল' 'হেমন্ত-গোধূলি' থেকে সংকলিত।

সূচী:—উৎসর্গ-কবিতা, পয়ার, কল্পনা; অমৃতের পুত্র; ত্রিস্রোতা, উপমা; স্বপ্ন নহে, প্রণয়-ভীরু; আহ্বান; অন্তিম; বুদ্ধিমান; বিবাহ-মঙ্গল; শ্রাবণ-শর্বরী; বন-ভোজন, চৈত্র-রাতে; পৌর্ণমাসী; নিভৃতি; নিশান্ত; উষা; প্রকাশ। জন্মাষ্টমী; দ্রৌপদী ১-২: দুর্গোৎসব ১-২; বঙ্গলক্ষ্মী ১-২; বঙ্কিমচন্দ্র ১-৬; বিবেকানন্দ; রবির প্রতি; শরৎচন্দ্র ১-৩; সত্যেন্দ্রনাথ; নট-কবি শিশিরকুমার: কপাট ক্রক ১-৬। কবিধাত্রী ১-৩, তীর্থ-পথিক; প্রেম ও কর্মফল ১-২, মুক্তি; কবির প্রেম; এক-আশা ১-৬; দীপান্বিতা; যৌবন-যমুনা; স্মর গরল; ফুল ও পাখী ১-৩; স্বপ্ন-সঙ্গিনী ১-৩; স্মরণ; নির্বেদ ১-৩; মরণ; যাত্রাশেষে ১-৩, বিদায়। অন্তর-দাহ; প্রেমহীন; মনে রেখো; মৃত্যুর প্রতি; মৃত্যুর পথে; মহানিদ্রা; বন্ধু: অন্ধকার॥

৮. মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা। প্রথম প্রকাশ—৭ই আষাঢ় ১৩৬৩। ভূমিকা লেখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'স্বপন-পসারী' থেকে শুরু করে 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল', 'হেমন্ত-গোধূলি'—এই চারখানি কাব্য-গ্রন্থেরই বাছাই করা স্বরচিত ও অনুবাদিত কবিতা এই সংকলনে সংগৃহীত হ'ল। ভাব ও ভঙ্গির প্রচুর বৈচিত্র্য এই সমস্ত কবিতায় বর্তমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহিতলালের অসাধারণ কবিসত্তার স্বাক্ষর তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই পরিস্ফুট। (ভূমিকা)।

সূচী :—মনে ভাবো, চূত-মঞ্জরী, ভাদরের বেলা, কবি-ভাগ্য, অঘোর পন্থী, পাপ, নাদিরশাহের জাগরণ, মহামানব, গজল-গান, ইরাণী, মানসলক্ষ্মী, কালাপাহাড়, শিউলির বিয়ে, ঘুঘুর ডাক, নূরজহান ও জহান্গীর, পয়ার, কবিধাত্রী, বিবেকানন্দ, বনভোজন, মিলনোৎকণ্ঠা ; বিভাবরী, বসন্ত-বিদায়, নিশি-ভোর, জ্যোৎস্না-গোধূলি রুপার্ট ব্রুক অকাল-বসন্ত, দুঃখের কবি, বনস্পতি, কাল বৈশাখী, ফেরদৌসী, উপমা : গঙ্গাতীরে, পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে, নমস্কার, গদ্য ও পদ্য, নাগার্জুন, প্রেমহীন মনে রেখো, যদি, গজল মৃত্যুর পরে, সোমপায়ীর গান, সন্ধ্যার সুর, নিদালি॥

৯. মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ড ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ— চৈত্র ১৩৭৬, মার্চ ১৯৭০।

"নিজের কবিতা সম্বন্ধে মোহিতলাল বলতেন, তাঁর চারখানি কাব্যই সমান মূল্যবান। তাদের মধ্যে সংকলিত সব কবিতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ ক'বতা। তিনি লিখেছেন অনেক কবিতাই, ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্য বইতে স্থায়িত্ব দিয়েছেন সামান্যই। মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা বাছাই করবার সময়ে কবির সতর্ক বাণী মনে পড়ে।" (ভূমিকা)।

সূচী —দেবেন্দ্র-মঙ্গল : দেবেন্দ্রনাথের সনেট। স্বপন-পসারী, বসন্ত-আগমনী, অঘোর-পন্থী, নাদিরশাহের শেষ, উচ্চৈঃশ্রবা, কলস ভরা গজল-গান, হাফিজের অনুসরণে, শেষ-শয্যায় নূরজাহান। বিস্মরণী. তীর্থ-পথিক, মানস-লক্ষ্মী, ব্যথার আরতি, স্পর্শরসিক, মোহমুদ্গার, পান্থ, কালাপাহাড়, নূরজহান ও জহান্গীর, বাঁধন, মৃত্যু ও নচিকেতা। স্মর-গরল : স্মর-গরল, নারীস্তোত্র, রুদ্র-বোধন, বসন্ত বিদায়, শেষ-শিক্ষা, বুদ্ধ ; শেষ আরতি, পয়ার, বঙ্গলক্ষ্মী, শ্রাবণ-শর্বরী, বিদায়। হেমন্ত-গোধূলি : হেমন্ত-গোধূলি, দুঃখের কবি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, শুভ-ক্ষণ, রূপ দর্পণ। অনুবাদ ও অনুলিখন : নাগার্জুন, প্রেতপুরী, অন্তর-দাহ, মনে রেখো, নিশীথ রাতে ; সন্ধ্যায় সুর, নিদালি॥

খ. নিবন্ধ ও সমালোচনা :

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৪৩। উৎসর্গ— স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণোদ্দেশে।

"প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই গ্রন্থ আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতিমূলক গবেষণা নহে, অর্থাৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'থীসিস্' নহে। এই যে সাহিত্য—মধুসূদনে যাহা প্রথম পূর্ণ উন্মেষ, এবং রবীন্দ্রনাথে যাহার অন্তিম পরিণতি, যাহাকে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে অভিহিত করা যায়—তাহা যে 'আধুনিক' হইলেও 'বাংলা' সাহিত্য, ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

" আমি এই সাহিত্যের ভিতরেই বাঙ্গালীর যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য—ভাব ও ভাবনার যে-কয়টি প্রধান লক্ষণ ধরিতে পারিয়াছি, তাহারই সূত্র অবলম্বন করিয়া এই যুগের কয়েকজন কবি-লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা, কবি-মানস ও কাব্য-কীর্তির আলোচনা করিয়াছি। এই সাহিত্যের কালক্রমিক ধারা এবং সেই ধারা-অনুযায়ী লেখকগণের পুরুষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত রচনাই আমার অভিপ্রায় নহে—আমি এই সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর ভাব-শরীরের প্রতিকৃতির সন্ধানই করিয়াছি।...

"কিন্তু অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই রচনাগুলি একটি যুগবিশেষের বাংলা সাহিত্যের কথা হইলেও এ সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য নির্ণয়ে আমি সর্বকালের সাহিত্যের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছি, এবং আলোচনা প্রসঙ্গে বহু স্থলে কাব্য-সৃষ্টির মূলতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছি।" (মুখবন্ধ)।

সূচী—মুখবন্ধ আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, শরৎচন্দ্র; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আধুনিক সাহিত্যের ভাষা, আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম (তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত), পরিশিষ্ট: রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবধারা॥

২ সাহিত্য-কথা। প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫। উৎসর্গ—শ্রীমান সজনীকান্ত দাসের করকমলে।

"গত দশ বৎসরেরও অধিককাল বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং যেগুলির মীমাংসা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হইয়াছে সেইগুলির আলোচনা প্রবন্ধ-পরম্পরায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম; বিভিন্ন দিক দিয়া বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিলেও, আশা করি, সাহিত্য বিচারের মূল সূত্রটি সর্বত্র অক্ষুণ্ণ আছে;...

"...সাহিত্য-সমালোচনায় কোনও তত্ত্বকে মুখ্যভাবে আশ্রয় না করিয়া নানা দিক দিয়া সেই এক তত্ত্বের ইঙ্গিতই বার-বার ধরাইয়া দিতে পারিলে আলোচনা আরও ফলপ্রদ হইতে পারে। বিশেষকেই আশ্রয় করিয়া যেমন সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তেমনই সাহিত্য-বিচারও বিশেষের মধ্য দিয়া হইলে তাহা হৃদয়গ্রাহী হয়। কোনও একটা system খাড়া করিতে পারিলে পণ্ডিতগণের তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু রসজিজ্ঞাসু পাঠক-সমাজের পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক নয়, বরং বিপরীত,—ইহা আমার কৈফিয়ৎ নহে, নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা সত্য বলিয়া মনে করি।...

"সর্বশেষের প্রবন্ধটির সম্বন্ধেও আমার একটু কৈফিয়ৎ আছে। অন্যগুলিতে সেরূপ মৌলিকতার দাবী না থাকিলেও, সেগুলি যে অনেক পরিমাণে আমারই চিন্তালব্ধ, এমন কথা বলিলে মিথ্যা হইবে না। কিন্তু এই সর্বশেষের প্রবন্ধটিতে আমি মূলে বিদেশী পণ্ডিতের উক্তি আশ্রয় করিয়া টীকা-ভাষ্য যোজনা করিয়াছি। সাহিত্য-সমালোচনার আধুনিক পদ্ধতি যে তত্ত্বটিকে স্বীকার করিয়াছে, বিদেশী সমালোচকের মুখ হইতে সেই তত্ত্বটি উদ্ধার করিয়া আমি তাহাকে বাংলাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

". সত্যকার সমালোচনা আমাদের সাহিত্যে এখনও আবির্ভূত হয় নাই—আমি নিজেও সে পক্ষে বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। এই গ্রন্থে আমি যে কয়টি প্রশ্ন লইয়া যে ধরণের আলোচনা করিযাছি, তাহাতে যদি এই ইঙ্গিতটুকুমাত্র পরিস্ফুট হইয়া থাকে যে, আমাদের সাহিত্যে এ যাবৎ যে সমালোচনা-নীতি প্রচলিত আছে তাহা যথার্থ নহে, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে মনে করিব। (মুখবন্ধ)।

সূচী :—মুখবন্ধ ; সাহিত্যের আদর্শ ; নিত্য ও সাহিত্য ; সাহিত্য-বিচার ও সাহিত্যের আয়ুষ্কাল ; কাব্য ও জীবন ; সাহিত্যের ছোট ও বড়, রস ও রূপ, কবিতা ও বৈরাগ্য ; সাহিত্যের স্বরাজ, সাহিত্যে সমস্যা, সাহিত্যে সুনীতি ; সমাজ ও সাহিত্য ; সাহিত্যে অশ্লীলতা ; কাব্য-পাঠ ; সাহিত্যের স্টাইল ॥

৩. বিবিধ কথা। প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৪৮।; উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু।

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনকালে, আমি 'বাঙালী জাতির সংস্কৃতি ও সাধনার এবং তাহার অতিশয় বর্তমান লক্ষণ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে

যে সকল ভাবনা ভাবিয়াছি, এবং যাহা এতদিন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ পাঠক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছিল, তাহারই কতকগুলি উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে সংগ্রহ করিলাম। এ আলোচনাও সাহিত্য-চিন্তার বহির্ভূত নয়, কারণ, প্রথমত, যে কোন সাহিত্যের সহিত পরিচয় করিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার—সেই কালে সেই সমাজের অন্তস্তলে প্রবাহিত সর্ববিধ ভাবধারার সংবাদ লইতে হয়। শুধুই কবি ও সাহিত্যিক নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সকল বিশিষ্ট ভাবুক, মনীষী ও কর্মীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাঁহাদের সাধনা ও ব্যক্তি-চরিত লক্ষ্য না করিলে জাতির সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকেও বুঝিয়া লওয়া যায় না।" (মুখবন্ধ)।

সূচী:—জাতির জীবন ও সাহিত্য, সত্য ও জীবন, অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাংলার নবযুগ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শরৎ-পরিচয়; রবি-প্রদক্ষিণ; মৃত্যু-দর্শন, বাঙালীর অদৃষ্ট।

৪ বিচিত্র কথা। প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৪৮। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় সুহৃদ্বরেষু।

"'বিচিত্র কথা' নাম দিয়া যে কয়টি প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকা হইতে তুলিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইল সেগুলির অধিকাংশই নানা সমস্যামূলক, এবং অপর দুই-একটি জল্পনা ও কল্পনা মূলক হইলেও একই সাহিত্যিক মনের সাহিত্যিক চিন্তা সেগুলির মধ্যে নানা আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা ইহাতে আছে তাহার প্রসঙ্গ সাময়িক হইলেও আমি অনেক স্থলে সাহিত্যের মূলনীতি ও আদর্শের আলোচনাও করিয়াছি, এ জন্য এ গ্রন্থ এক অর্থে সাহিত্য-সমালোচনাও বটে।" (মুখবন্ধ)।

সূচী:—অতি পুরাতন কথা, পুঁথির প্রতাপ; সংবাদপত্র ও সাহিত্য; সাহিত্যের শিরঃপীড়া; জাতীয় জীবন-সঙ্কটে; বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম; সত্যেন্দ্রনাথ-স্মরণে; কাব্যে আধুনিকতা; অতি আধুনিক প্রতিভা; রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ; বিচিত্র কথা॥

৫. সাহিত্য-বিতান। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৪৯। উৎসর্গ—সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিক স্বর্গত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে।

'ইতিপূর্বে 'সাহিত্য-কথা' নামক গ্রন্থে আমি মুখ্যত সাহিত্যের তত্ত্বঘটিত আলোচনা করিয়াছিলাম—সেখানে বিশেষ অপেক্ষা নির্বিশেষের দিকেই দৃষ্টি ছিল, এই গ্রন্থে আমি—সাহিত্যের শুধুই তত্ত্ব নয়—নানাবিধ সৃষ্টিকর্মের সাক্ষাৎ রস সন্ধান এবং কবি ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয়ও করিয়াছি। এই হিসাবে সাহিত্য-বিতান'কে 'সাহিত্য-কথা'-রই উত্তর ভাগ বলা যাইতে পারে। সেই যোগরক্ষা হইয়াছে ইহার প্রথম প্রবন্ধটিতে।

বর্তমান প্রবন্ধে (প্রথম প্রবন্ধ) আমি একটি নূতন তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার দুঃসাহস করিয়াছি, আমি খাঁটি আর্ট ও খাঁটি কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদ নির্দেশ করিয়াছি—এ দুঃসাহস এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। তত্ত্ব হিসাবে ইহাতে যে দোষই থাকুক—আমার বিশ্বাস, নিছক আর্ট-কর্মকে কবি-কর্ম হইতে পৃথক না রাখিলে কাব্য-বিচার সমস্যা জটিল হইয়া পড়ে, যে রূপ-কর্মকে আমরা বাণী রচনা বলি, এবং যাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলিতে জীবন ও জগতের বিশিষ্ট রূপকেই রসোজ্জ্বল হইতে দেখি—তাহার মূল্য ও কাব্যের সেই বিশেষ অধিকারটিকে অগ্রাহ্য করিতে হয়।·

' 'সাহিত্যের আসর' প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধের সহিত পড়িতে বলি। বাকি প্রবন্ধগুলিতে আমি অধিকাংশ স্থলে তত্ত্ব বিচার নয়—রস নির্ণয় করিয়াছি, ইহাই এ গ্রন্থের মুখ্য অভিপ্রায়।" (মুখবন্ধ)।

"এই সংস্করণকে প্রায় নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, কারণ এবার বইখানিকে একটা নির্দিষ্ট অভিপ্রায় অনুসারে পুনঃসংকলিত করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এই গ্রন্থকে আমার 'সাহিত্য কথা নামক গ্রন্থের উত্তরখণ্ড বলা হইয়াছিল· এবারও কতকটা সেইরূপ বলা যাইতে পারে বটে, তথাপি, এবার ঐ কবি ও সাহিত্যিকগণকে উপলক্ষের পরিবর্তে লক্ষ্যস্থানীয় করা হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা যে পর্যন্ত আসিয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, সেই শেষের দিকের কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের বিস্তারিত সাহিত্যিক পরিচয় প্রায় কালানুক্রমিকভাবে ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, এ জন্য এই গ্রন্থকে একাধারে 'সাহিত্য-কথা' ও 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের' পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে, প্রথম সংস্করণের কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনই অন্যত্র হইতে দুই-একটি তুলিয়া আনিয়া এইখানে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ—দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশে বিলম্ব না হইলে এগুলিকে পাওয়া যাইত না। (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা বৈশাখ ১৩৫৬)।

সূচী :—মুখবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, সাহিত্য-বিচার; সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর; রবীন্দ্রকাব্যের কবি-পুরুষ; রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা; মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; শরৎ-পরিচয়; কবি করুণানিধানের কবিতা, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক; কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র, দুইখানি উপন্যাস; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'কবি' উপন্যাস; অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা, বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি, হাস্যরস ও হিউমার, সাহিত্য-সেবা ও সাহিত্যের ব্যবসায, সাহিত্য ও যুগধর্ম; সাহিত্যের আসর, কবি ও কাব্য, বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য ॥

['বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য' বর্তমান সংস্করণে পরিত্যক্ত।]

৬ বাংলা কবিতার ছন্দ। প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৫২। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু সোদরপ্রতিমেষু

'বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিবার অভিপ্রায় আমার পূর্বে কখনও ছিল না; আমি সাহিত্যের যে দিকটা লইয়া আজীবন বৃথা ব্যাপৃত আছি তাহা যদি 'চণ্ডীপাঠ'-এর সহিত তুলনীয় হয়, তাহা হইলে, এই 'জুতা-সেলাই'-এর কাজও আমাকে করিতে হইবে, ইহা কখন ভাবি নাই। কিন্তু বাংলা ছন্দের সূচ্যগ্র পরিমিত একটু ভূমি লইয়া ক্রমেই যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিল, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শেষে শরশয্যায় শুইয়াও যখন তাহার শান্তিপর্ব রচনা করিতে পারিলেন না, যখন দেখিলাম, মহা মহা ছান্দসিকগণ বাংলা ছন্দ তত্ত্বকে এমন একটি ব্রহ্মতত্ত্বে ঠেলিয়া তুলিয়াছেন যে, বাংলা কবিতার ছন্দোময় রসরূপ নিতান্তই মায়া—অতএব উহ্য—হইয়া পড়িয়াছে, এবং আরও যখন দেখিলাম, বাংলা-সাহিত্যের নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীগণের উপরে সেই ব্রহ্মসূত্র এমনই কঠিন শাসন বিস্তার করিয়াছে যে তাহাদের কানে বা প্রাণে, বাংলা কবিতার সহিত বাংলা ছন্দের যোগরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে—তখন একরূপ লোকহিত-ব্রতের মতই আমাকে এই ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করিতে হইল, কারণ শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়—শিক্ষকগণেরও আর্তনাদ আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল।

"আমার এই গ্রন্থের নাম—'বাংলা কবিতার ছন্দ', এই নাম হইতেই

বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কোন তত্ত্ব-ঘটিত আলোচনা নয়, যাহাকে ইংরাজীতে Prosody বলে, আমি সেইরূপ 'ছন্দ-পরিচয়' লিখিয়াছি—বাংলা কবিতার ধ্বনি-রসরূপ যাহাতে একটু বুঝিয়া লইতে পারা যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছি। ধ্বনিবিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস বা বিজ্ঞান জানা না থাকিলেও, বাংলা ছন্দের একটা সম্পূর্ণ পরিচয় যে রচনা করা যাইতে পারে—ছাত্রগণকে বিভীষিকাময়ী গবেষণার মাহাত্ম্যবোধ করাইতে হয় না, অর্থাৎ বাংলা ছন্দ-বিজ্ঞান আসলে একটা অসাধারণ কিছু নয়—তাহারই প্রমাণ ইহাতে মিলিবে। যে ছন্দগুলি এ পর্যন্ত বাংলা কবিতায় দেখা দিয়াছে, তাহাদের সেই বৈচিত্র্যকেই ভালরূপ আস্বাদন করিবার জন্য আমি কয়েকটি সুস্পষ্ট ও সহজগ্রাহ্য নিয়ম নির্দেশ করিয়াছি, এ জন্য কোন জবরদস্তিপূর্ণ 'থিয়রি'র শরণাপন্ন হইতে হয় নাই, তথ্য-প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া তত্ত্বকে প্রাধান্য দিবার প্রয়োজন হয় নাই। (ভূমিকা)।

সূচী :—ভূমিকা, প্রথম ভাগ—বাংলা ছন্দের সাধারণ পরিচয় (প্রথম—ষষ্ঠ অধ্যায়)। দ্বিতীয় ভাগ—বাংলা পয়ার ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর (প্রথম—অষ্টম অধ্যায়)। পরিশিষ্ট—বাংলা পদবন্ধ, বাংলা সনেট, বাংলা ছন্দে মিল, নির্দেশিকা ॥

৭ বাংলার নবযুগ। প্রথম প্রকাশ—শ্রীপঞ্চমী ১৩৫২। উৎসর্গ—শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অচলপ্রতিষ্ঠেষু।

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে একটা বড় যুগ কেন, তাহাই এই প্রবন্ধগুলির সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিষয়টি ঐতিহাসিক, সে কারণে আলোচনাও খাঁটি ইতিহাসসম্মত হওয়াই উচিত, কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নহি, বরং ইতিহাস রচনায় অধুনা যে কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পালনীয় হইয়াছে, তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই।

" বাঙালী যে মরিবে না—বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী যে ভারতের ইতিহাসে ব্যর্থ হইবার নয়, এ বিশ্বাস কখনও আমি ত্যাগ করি নাই, করিলে এ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন থাকিত না।' (ভূমিকা)।

সূচী :—ভূমিকা, প্রথম অধ্যায়. নবযুগের সূচনা—রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভাব বিপ্লব—বিভিন্ন ধারা, নবমানব-ধর্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নবজাগরণের গভীরতর কারণ; বাঙালীর জাতিগত প্রবৃত্তি—তন্ত্রধর্ম।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বঙ্কিমের কবি-জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা; বঙ্কিম-সাহিত্যের দুই ধারা; বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শন ও স্বজাতিপ্রেম; নবযুগের ধর্মতত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বঙ্কিম-সাহিত্যের মূলপ্রেরণা—বাঙালী ও ভারতীয় সংস্কার; ধর্ম-তত্ত্বে সনাতন ও যুগ-ধর্মের সমন্বয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা-মন্ত্র ও তৎপ্রচারিত মানব-ধর্ম-বাদের সারমর্ম; যুগনায়করূপে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও সৃষ্টি-গৌরব।

সপ্তম অধ্যায়ঃ বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ; যুগবন্যার শেষে বাঙালী-জীবন ও বাঙালী-সমাজ—প্রতিক্রিয়া; বিবেকানন্দ-চরিত্রে যুগধর্মের অভিনব প্রকাশ।

অষ্টম অধ্যায়ঃ বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের ইতিহাস: সেই জীবনের গূঢ়তত্ত্ব, ভারতীয় সাধনায় কালের প্রভাব—সামঞ্জস্যের অভাব, যুগোচিত সত্য-সন্ধানে ব্যাকুলতা।

নবম অধ্যায়ঃ বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ; শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বা সাধন-তত্ত্বের মৌলিকতা, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

দশম অধ্যায়ঃ নবযুগের মানবধর্ম ও বিবেকানন্দ; বিবেকানন্দের জগৎ-প্রীতি ও ভাবত-প্রীতি।

একাদশ অধ্যায়ঃ বিবেকানন্দের বাণী, তাঁহার মানব-প্রীতির বিশেষত্ব; কয়েকটি উক্তি।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ বিবেকানন্দ-প্রচারিত মানব-ধর্মের দুই একটি মূলতত্ত্ব; সেই ধর্মের ব্যাবহারিক মূল্য বা সাধন যোগ্যতা; বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা—বঙ্কিমযুগের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ, উপসংহার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ নবযুগের গতিরোধ—আকস্মিক পন্থাপরিবর্জন; রাজনৈতিক ভাবোন্মাদ, তাহার কারণ: রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়, রবীন্দ্র-জীবনে ও চরিত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব; দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন; রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য; তাহার পরিণাম।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানব-পূজা, তথা জীবনের নূতন আদর্শ—বাংলা সাহিত্যের ধারা পরিবর্তন; সনাতন ভারতীয় আদর্শের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা—মহা-মানববাদ ও বিশ্বপ্রেম, বঙ্কিম বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম-তত্ত্বের বিপরীত, রবীন্দ্র-সাধনায় ভাবান্তর, রবীন্দ্রনাথের কবি কীর্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়: শেষ কথা, গ্রন্থকারের বিদায়।

পরিশিষ্ট: আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাংলার নবযুগ॥

৮. জয়তু নেতাজী। প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৩। উৎসর্গ—নেতাজীর পরম প্রিয়, পরমাত্মীয় ভারতের সর্বজাতি ও সর্বসম্প্রদায়ের স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্দেশে।

"ভারত-ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত একজন পুরুষের আবির্ভাব কেমন করিয়া সম্ভব হইল ও তাহার কি প্রয়োজন ছিল, এই পুস্তকে তাহাই বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। (গ্রন্থকারের নিবেদন)।

"'জয়তু নেতাজী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক যে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনও ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয় নাই, স্বাধীনতার সিংহদ্বারে তখন সে ঘা দিতে সুরু করিয়াছে।" (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১৩৫৭)।

সূচী:—নিবেদন, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, জয়তু নেতাজী, নব-পুরুষসূক্ত বা নেতাজী বরণ, স্বামীজী ও নেতাজী, গান্ধীজী ও নেতাজী, নেতাজী। পরিশিষ্ট: আদর্শ নেতা সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি ও মন্তব্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ, নেতাজীর বেতার-বার্তা, গান্ধী ও গান্ধী-কংগ্রেস সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র, নেতাজীর জন্মদিনে॥

৯. কবি শ্রীমধুসূদন। প্রথম প্রকাশ—১৬ই কার্তিক ১৩৫৪। উৎসর্গ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের করকমলে স্নেহ-উপহার।

"গ্রন্থখানির সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপ দুই একটি কথা বলিবার আছে। ইহার বিষয় হইতেছে—কবি শ্রীমধুসূদনের কাব্য ও কবি-চরিত্র। কথাটার একটি বিশেষ অর্থ আছে। আমি এই গ্রন্থে মেঘনাদ-বধ কাব্যেরই বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি, তার কারণ, উহাই মধুসূদনের একমাত্র কাব্যকীর্তি—যাহা শুধুই তাঁহার কবি-প্রতিভার নয়, তাঁহার কবি-জীবনের বা তাঁহার অন্তরস্থ সেই কবি-পুরুষেরও পূর্ণ পরিচয় বহন করিতেছে। অতএব এই গ্রন্থ শুধু মধুসূদনের কাব্য-সমালোচনা নয়, ইহাকে কবি-চরিত্র-কথা হিসাবেও পাঠ করা যাইবে।

"তথাপি মধুসূদনের কবি-প্রতিভা ও কাব্য-নির্মাণশক্তির পরিচয়টি সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমি এই গ্রন্থে আরও দুইটি অঙ্গ যোজনা করিয়াছি। একটি তাঁহার নূতন ছন্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ;...আমি মধুসূদনের একটি 'কাব্য-প্রদর্শনী'ও ইহাতে যুক্ত করিয়াছি। আমি জানি, মধুসূদনের কাব্য একালে নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কেহ আর পড়েন না; পড়িলেও আদ্যন্ত পাঠ করিবার ধৈর্য সকলের নাই। ইহাও জানি যে, আজকাল সকল কবিরই কাব্যগুলি হইতে 'সঞ্চয়ন' করিয়া না দিলে, কবিদের পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় না; মধুসূদনের জন্যও তাহা না করিলে. কবি ও পাঠক উভয়ের প্রতি অন্যায় করা হইবে।" (গ্রন্থকারের নিবেদন)।

সূচী:—প্রথম খণ্ড—মেঘনাদ-বধ কাব্য পাঠ (প্রথম—একাদশ অধ্যায়)। দ্বিতীয় খণ্ড—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ (প্রথম—সপ্তম অধ্যায়)। তৃতীয় খণ্ড—মধুসূদনের কাব্য-প্রদর্শনী (মেঘনাদ-বধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য. চতুর্দশপদী কবিতাবলী)। প্রসিদ্ধ ও স্মরণীয় কাব্যপঙ্‌ক্তি। নির্দেশিকা॥

দ্বিতীয় সংস্করণে (অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৫) মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও কাব্যপ্রদর্শনী পরিত্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের নূতন ছন্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে যোজিত হয়েছে—পূর্বে বইটি ছাপা না থাকার জন্যে 'কবি মধুসূদন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। 'কাব্য প্রদর্শনী' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিতব্য। দ্বিতীয় সংস্করণে মোহিতলালের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে (আগষ্ট ১৯৭১) প্রথম সংস্করণকে অনুসরণ করা হয়েছে।

১০. সাহিত্য-বিচার। প্রথম প্রকাশ—১৩৫৪। উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভিন্নহৃদয়েষু।

"সাহিত্যের রস ও সাহিত্যের রূপ এই দুই লইয়া সাহিত্যের স্বরূপ। সাহিত্যের এই স্বরূপ সম্বন্ধে, আমি আমার বিভিন্ন গ্রন্থে, আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী যে সকল আলোচনা করিয়াছি তাহার এমন কয়েকটি এই পুস্তকে একত্র করিয়া দিলাম—যেগুলি সাহিত্য-শিক্ষার্থী বাঙালী পাঠক ও ছাত্রগণের কাজে লাগিতে পারে।

"এই পুস্তকের তিনটি প্রবন্ধ নূতন—পূর্বে কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে 'কবি ও কাব্য'-শীর্ষক প্রবন্ধগুলির রচনা-ভঙ্গিও নূতন: 'কাব্য-

'কথা' নাম দিয়া একদা যে একখানি গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এগুলি তাহারই একটি অংশ। এই গ্রন্থ যদিও পরে আর সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি এই চতুরঙ্গ-আলোচনাটিতে কবি ও কাব্য-ঘটিত কতকগুলি মূল প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা আছে।" (গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন)।

সূচী :—কবি ও কাব্য, কাব্য ও জীবন, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, সাহিত্যের স্টাইল, নাটকীয় কথা, আধুনিক সাহিত্যের ভাষা, সাহিত্যের আসরে, সংবাদপত্র ও সাহিত্য। পরিবর্ধিত সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৭৩। এই সংস্করণে 'সাহিত্য ও জীবন', 'নাটকীয় কথা : দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'সাহিত্য-সেবা' ও 'কবিতা-বিচার' প্রবন্ধ চারটি সংযোজিত হয়েছে॥

১১ বঙ্কিম-বরণ। প্রথম প্রকাশ—১৬ই কার্তিক ১৩৫৬। উৎসর্গ—শ্রীমান্ মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী কল্যাণীয়েষু।'

"বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমি এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছি সেই সব প্রবন্ধ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা এই গ্রন্থে একত্র সংগ্রহ করিয়া দিলাম,…বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার নানাবিধ আলোচনা এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে, সকলের পক্ষে তাহা এককালে পাঠ করা সহজসাধ্য নয়, অথচ সেই আলোচনার দিক একসঙ্গে না দেখিলেও আমার বঙ্কিম পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে না। তাই আমি এইরূপ একটি সংগ্রহ অত্যাবশ্যক মনে করিয়াছি।

'বঙ্কিম-বরণ' নামটির সার্থকতা এই যে, আমি এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে নানা প্রসঙ্গে ও নানা উপলক্ষে বরণ করিয়াছি,

"এই গ্রন্থে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একটি দিক—তাঁহার মনীষা ও ঋষিত্বের দিকই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি, তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে কবি-বঙ্কিমের পরিচয়ও ইহাতে আছে, কিন্তু সে পরিচয় আংশিক।" (গ্রন্থকারের নিবেদন)।

সূচী :—গ্রন্থকারের নিবেদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা, কপালকুণ্ডলা, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রসঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য, বঙ্কিম-চন্দ্রের জাতি-প্রেম, বঙ্কিম-সাহিত্যে রসবিচার, অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব বিচার॥

১২ রবি-প্রদক্ষিণ। প্রথম প্রকাশ—পৌষ ১৩৫৬। উৎসর্গ—কল্যাণীয় শ্রীমান্ জগদীশ ভট্টাচার্য করকমলেষু।

'রবি-প্রদক্ষিণ' নাম দিয়া এই যে লেখাগুলি আমি এই একটি গ্রন্থে সংকলন করিয়া দিলাম, ইহার উদ্দেশ্য—আমি এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে ও উপলক্ষে যত রকমের আলোচনা করিয়াছি তাহার একটি সংগ্রহ বাংলার পাঠক-সমাজের সম্মুখে স্থাপন করা। এগুলি এতদিন আমার অন্য কয়েকখানি গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে 'বিবিধ কথা' ও 'বিচিত্র কথা' আর পুনর্মুদ্রিত হইবে না, অপর দুই একটি গ্রন্থে ইহার কয়েকটি যে এখনও রহিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের, তথা বাঙালী কবিগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ বাদ দিবার উপায় নাই। তথাপি, যাঁহারা বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার আলোচনা ও চিন্তাধারা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই একখানি পুস্তকেই তাহা পাইবেন।·

"···কোন কবির কবিশক্তির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হইলে তাঁহার শক্তির দুই দিকই দেখিতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে, তিনি যে কারণে রবীন্দ্রনাথ, ঠিক সেই কারণেই তিনি যে আর কিছু নহেন, অর্থাৎ অন্যবিধ কবিশক্তি তাঁহার নাই, ইহাও নির্দেশ করা সমালোচকের কাজ। অতএব আমার এই আলোচনায় কোন সত্যকার স্বমতবিরোধ নাই—রবীন্দ্রকবির আলেখ্য-রচনায় আমি আলো ও ছায়া দুয়েরই সমাবেশ করিয়াছি।" (মুখবন্ধ)।

সূচী :—রবীন্দ্রনাথ; বাংলার নবযুগ ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কাব্যের কবি-পুরুষ, মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কাব্য-প্রসঙ্গ: ১। চিত্রাঙ্গদা, ২। উর্বশী, ৩। এবার ফিরাও মোরে, ৪। রবীন্দ্র-কাব্যে ট্রাজেডি, 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ'; ভাষা-সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ; রবি-প্রদক্ষিণ, বাংলার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কাব্যে আদর্শ ও বাস্তব। পরিশিষ্ট: রবীন্দ্র-জন্মদিনে; রবীন্দ্র-বিয়োগে, পদ্মা-বক্ষে রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহে রবীন্দ্র স্মৃতি॥

১৩. জীবন-জিজ্ঞাসা। প্রথম প্রকাশ—২৮শে আষাঢ় ১৩৫৮। উৎসর্গ—শ্রীমান্ ভূমীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু।

"'জীবন-জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলি পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের অধিকাংশই লেখকের স্বকীয় ভাব-চিন্তা ও কল্পনা প্রসূত,· সকল রকমের চিন্তাই ইহাতে আছে—সাহিত্যও আছে, কাব্যও আছে, হয়তো ধর্মতত্ত্বও আছে কিন্তু সকলই লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা, অর্থাৎ এগুলি—ইংরেজীতে

যাহাকে বলে 'Personal Essays'—তাহাই।...ঐ প্রবন্ধে (অতি-পুরাতন কথা) আমার সাহিত্যিক-জীবনের অন্তরতর আত্মকথা আছে।

"'জীবন-কাব্য' নামক একটি পৃথক খণ্ডে যে রচনাগুলি স্থান পাইয়াছে, তাহার অধিকাংশই Imaginative Prose বা গদ্যকাব্য। এগুলি আমার প্রথম বয়সের রচনা,..

"...তৃতীয় খণ্ডে 'মন-মর্মর' নামে যে চিন্তাগুলি সংকলিত হইয়াছে, সেগুলিরও একটু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। মাঝে মাঝে ডায়েরীর মত নোট-বহিতে আমি আমার মনের যে কথাগুলি ধরিয়া রাখিতাম—নিজের মনের সহিত নিজেরই পরিচয়ের মত যে চিত্ত চমকগুলি ভাল লাগিত—তাহা হইতেই, এই গ্রন্থের উপযোগী কয়েকটি চিন্তা, আমি ঐ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।" (মুখবন্ধ)

সূচী:—জীবন-জিজ্ঞাসা: সত্য ও জীবন, কাব্য ও জীবন, কবিতা ও বৈরাগ্য, রস-রহস্য, দুঃখের স্বরূপ, মৃত্যু-দর্শন, অভয়ের কথা, পুঁথির প্রতাপ, অতি-পুরাতন কথা, রূপ-রহস্য, মৃত্যুর দান বিচিত্র কথা ১। জীবন ও জিজ্ঞাসা, ২। প্রশ্ন ও তাহার উত্তর, ৩। আমার কাব্য সাধনা। জীবন-কাব্য: জীবন-কাব্য, ব্যর্থ-জীবন, আমি, সন্ধ্যাতারা, চতুঃসন্ধ্যা, স্বপ্ন-মহানাটক। মন-মর্মর: জীবন-প্রভাতে (১৩১৯-১৩২৮), জীবন-মধ্যাহ্নে (১৩৪১-১৩৫০), জীবন-সন্ধ্যায় (১৩৫১-১৩৫৭)॥

১৪. শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র। প্রথম প্রকাশ—জন্মাষ্টমী ১৩৫৭। উৎসর্গ—শরৎচন্দ্রকে (কবিতায়)।

"..আমি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-উপন্যাস অবলম্বনে এমন একটি চিন্তা ও ভাবের জগৎ বাংলার পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছি, যাহা আজিকার শিক্ষিত সমাজেও অপরিচিত, সাহিত্যের রস-বিচার উপলক্ষে আমি জীবন-দর্শনের কয়েকটি মূলতত্ত্ব—বিশেষ করিয়া বহুকালগত সাধনায় যাহা বাঙালীর স্বভাব-সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল—তাহাই নানা দিক দিয়া, দেশ ও বিদেশী কাব্যের ও ভাবচিন্তার সাক্ষ্য সহকারে, সাহিত্যিক প্রণালীতে হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য, ইংরাজীতে যাহাকে thought provoking বলে তাহা তো বটেই—সাহিত্যের রস আস্বাদনে হৃদয়-মনের যত গভীরতর জিজ্ঞাসা আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত করে, পাঠক-চিত্তে সেই অস্পষ্ট অনুভূতিকে স্ফুটতর করিয়া তোলা। জানি না, ইহাতে আমি কতটুকু সফল

হইয়াছি, অথবা, খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনায় এইরূপ ভাবুকতার অনধিকার-প্রবেশ একালের রসজ্ঞ ও রসপিপাসু পাঠকের কতখানি মনঃপূত হইবে।" (পূর্বভাষ)।

সূচী: পূর্বভাষ, অবতরণিকা: আত্মকাহিনী আত্মকাহিনী বনাম উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের কৈফিয়ৎ।

শ্রীকান্তের বাল্যজীবন: ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ, অন্নদা দিদি; অন্নদা ও শ্রীকান্ত।

নারীর প্রেম: পরিচয়, প্রাক্কন, ব্যাখ্যা-সূত্র -নাটকরূপ, প্রস্তাবনা—বাল্য-প্রণয়, প্রথম অঙ্ক—পিয়ারী বাইজী দ্বিতীয় অঙ্ক—নিয়মচারিণী; দ্বিতীয় অঙ্কের জের—দুর্ভাগিনী, তৃতীয় অঙ্ক—দণ্ডিতা, তৃতীয় অঙ্কের জের 'স্বখাত সলিলে', চতুর্থ অঙ্ক—তপস্বিনী, চতুর্থ অঙ্কের জের হৃদয়-যমনা।

নেপথ্য-কাহিনী: গহর কমললতা ও শ্রীকান্ত কমলতা, প্রেমের দেহতত্ত্ব।

নারীর প্রেম (পূর্বানুবৃত্তি): পঞ্চম অঙ্ক—পূর্ণাহুতি, পঞ্চম অঙ্কের জের—ভাব-সম্মিলন।

উপসংহার: রাজলক্ষ্মী ও কমললতা, শ্রীকান্তের পরাজয়; রাজলক্ষ্মীর শেষ অভয়া; অন্যায়ের প্রতিকার ও মানুষের দুঃখ-নিবারণ।

পরিশিষ্ট: শ্রীকান্ত-কাহিনী ও পুনর্বিচার, ফলশ্রুতি, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র॥

১৫. বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি। প্রথম প্রকাশ—১৯৫১ (১৩৫৮)

"বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্য একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক রচনা করিয়া দিতে প্রকাশক আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন।...আমি নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের জন্য যদি একখানি স্বতন্ত্র জলযান নির্মাণ করিয়া দিই, যাহাতে দুই কাজ চলিতে পারে—শুধুই খেয়াপার নয়, তাহারা ইচ্ছা ও অবসরমত ঐ নদীতে একটু ভ্রমণও করিতে পারে - তবে, সম্ভবতঃ পরীক্ষার দায়-উদ্ধার ছাড়াও, আমি তাহাদিগকে এই প্রবন্ধ-রচনার উপলক্ষে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, এবং উচ্চশিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় নানা বিষয়ে স্বাধীন আলোচনা ও সমালোচনার পথে অন্ততঃ কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারিব। বস্তুতঃ এ-গ্রন্থের মুখ্য অভিপ্রায় তাহাই।" (মুখবন্ধ)।

সূচী:—মুখবন্ধ। প্রথম খণ্ড: প্রবন্ধ ও রচনা, প্রবন্ধ-পরিচয়;

প্রবন্ধের শ্রেণীভাগ; পরীক্ষার্থীর প্রবন্ধ-রচনা; রচনার ভাষা; রচনার ভাষায় বর্ণাশুদ্ধি; বানান-ভুলের তালিকা; বাংলা বাগ্‌ভঙ্গি ও চলতি বুলি; ভাষার কয়েকটি দোষ। দ্বিতীয় খণ্ড: সত্য; অধ্যয়ন, শিক্ষা; সভ্যতা (ভারত কি সভ্য?); প্রগতিবাদ ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা; স্বাধীনতা, হিন্দু ও মুসলমান—মিলন-সমস্যা; রাষ্ট্রীয় ঐক্য-সাধন, অস্পৃশ্যতা, পরিশ্রমের মর্যাদা, 'পরধর্মো ভয়াবহঃ', সত্য ও মিথ্যা, পাপ (১), পাপ (২); ধর্ম; অহিংসা; ক্ষমা; কৃতজ্ঞতা, স্ত্রীশিক্ষা; প্রাদেশিকতা (ও ভারতের জাতীয়তা); আন্তর্জাতিকতা; সমাজতন্ত্রবাদ; স্বদেশপ্রীতি; আদর্শ-জীবন ও জীবনের সার্থকতা; জীবন-যুদ্ধ; দারিদ্র্য, মৃত্যু, ইতিহাসপাঠ; জীবন-চরিত; কাব্য কি?, গীতি-কবিতা; সনেট; হাস্যরস ও হিউমার, ছোটগল্প; আধুনিক সাহিত্যে উপন্যাস, জীবন ও সাহিত্য (১); সমাজ, জীবন ও সাহিত্য (২), পুঁথির প্রতাপ; বাংলার বর্ষা ও বর্ষার গান, শারদীয়া (বাংলার শরৎ); বাংলা কাব্যের ধারা, বৈষ্ণব-কবিতা; ভারতচন্দ্র, কবি শ্রীমধুসূদন; বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান; বাংলা নাটক; রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতি; রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী; তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বাংলা কাব্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-বিদ্রোহ বানান-বিভ্রাট; বানান-সংস্কার বাংলা প্রবাদ, বাঙালীর ভাষা ও বাংলা সাহিত্য; সংবাদপত্র: ভারতে ইংরেজ-অধিকার, ভারতের রাষ্ট্রভাষা; বাস্তুহারা সমস্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর; বাঙালীর ভবিষ্যৎ। পরিশিষ্ট: যুদ্ধ; ছাত্র ও রাজনীতি, শিক্ষাসঙ্কট ও শিক্ষা-সংস্কার; সাধুভাষা ও চলতিভাষা, সাধারণ পাঠাগার, গ্রন্থ-সংগ্রহ, সাংবাদিকতা, বৃত্তিশিক্ষা, বেতার-বার্তা সিনেমা বা চলচ্চিত্র, বাংলার পল্লীজীবন; বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ও বাঙালীর চরিত্র; কুটির-শিল্প; লোক-সাহিত্য; অতি আধুনিক বাংলা কবিতা; সাহিত্যে আদর্শবাদ; সাহিত্যে নীতি, ভারতের নারী; বিজ্ঞান ও ধর্ম; ধ্যান ও কর্ম॥

১৬. বাংলা ও বাঙালী। প্রথম প্রকাশ—১৩৫৮। উৎসর্গ—কাব্যানুরাগী ও কবিবৎসল কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায় সুহৃত্তমেষু।

"এই গ্রন্থ কি উদ্দেশ্যে, কোন্ প্রেরণায় লিখিত আশা করি, পাঠকমাত্রেই তাহা পাঠকালে বুঝিতে পারিবেন।...

" আমি এই অবস্থাতেও—কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই—একটা শেষ কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম—এই মৃত্যুকালেও বাঙালীর কানে

তাহার কুল-মন্ত্র জপ করা, তাহার জাতি-পরিচয় ও জাতিধর্ম কি, তাহারই একটা চৈতন্যরশ্মি তাহার অন্তরে উদ্ভাসিত করা। যে-ইতিহাস সে জানে না—যাহার কেবল বিদ্বান-সুলভ গবেষণায় পণ্ডিতের উপাধিলাভ হয়, এবং তাহার ঢক্কানাদে সে মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয় মাত্র, সেই তাহার জাতি-জীবনের কাহিনী—অতি-সংক্ষেপে ও সরল পদ্ধতিতে এবং ভিতরের দিক হইতে—তাহাকে শুনাইব। এই গ্রন্থে প্রথম পর্বে আমি সেই প্রয়াস পাইয়াছি। উহাতে তাহারা বিদ্যালাভ করিবে না, কেবল অন্তরগভীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া, আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করিবে।...

"গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বাঙালীর বর্তমান পরিচয় আছে—সে পরিচয় যেমন শোকাবহ, তেমনই গ্লানিকর।"... (গ্রন্থকারের নিবেদন)।

সূচী :—গ্রন্থকারের নিবেদন। প্রথম পর্ব বাংলা ও বাঙালী ; বাঙালীর মাতৃপূজা ; বাংলার গঙ্গা, শারদীয়া। দ্বিতীয় পর্ব : বাঙালীর কর্মফল ; ভারত-সভায় বাঙালী , বাঙালীর বর্তমান অভিশপ্ত বাঙালী ॥

১৭. কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য। প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম প্রকাশ—যথাক্রমে ১৩৪৯, ১৩৫০। উৎসর্গ—কবিগুরুর এক প্রাচীন শিষ্য ও মুক্ত-সঙ্গ ভক্তের সাত্ত্বিক ভক্তি-অর্ঘ্যস্বরূপ এই গ্রন্থ বঙ্গের বাণী মন্দিরে রবীন্দ্র-পূজায় নিবেদিত হইল।

"এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'-নামক কাব্য-সংগ্রহের কবিতাগুলিকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার কবি-প্রতিভার স্বরূপ-সন্ধান এবং সেইসঙ্গে অধিকাংশ কবিতার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা থাকিবে।... আমি রবীন্দ্রকাব্যের এই যে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি, তাহাতে কবির ব্যক্তিগত ভাব-জীবনের ধারা অনুসরণ করা আমার কর্তব্য হইবে না ; আমি মুখ্যত কাব্য-পাঠই করিব, কবিকে পাঠ করিব না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের মত আত্মস্বতন্ত্র কবির কাব্যরস বিচারে, কাব্যের অন্তরালে কবি-মানসের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কবির ব্যক্তি-ধর্ম যেমনই হোক, তাঁহার সেই ব্যক্তি-জীবনের ভাবনা-চিন্তা, সংশয়-বিশ্বাস যেমনই হোক, সেই সকলের ভাষ্যরূপে কবিতা পাঠ করিব না ; অথবা কবিতার মধ্যে তাহারই সন্ধান করিব না। তৎপরিবর্তে আমি দুইটি কাজ করিব—(১) কবিতার ভাব হইতেই কবি-প্রকৃতি তথা কবি-মানসের পরিচয় করিব ; (২) কবিতার রস-নিবেদন ও বাণীরূপ-দর্শন করিব।...কেবল কতকগুলি কবিতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিচার থাকিবে, বিশেষতঃ প্রথম বয়সের

কবিতাগুলির ; তাহার কারণ, সেইগুলি হইতেই আমি রবীন্দ্র কাব্য-পরিচয়ের কয়েকটি মূলসূত্র নির্ণয় করিব।" (প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়)।

সূচী: প্রথম খণ্ডের 'প্রথম পর্বে' ভানুসিংহের পদাবলী, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল আলোচিত। 'পর্বশেষে' এই পর্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রথম অধ্যায়ে' মানসী সম্বন্ধে আলোচনা ও মানসী পাঠান্তে মন্তব্য আছে॥ 'দ্বিতীয় অধ্যায়ে' সোনার তরী সম্বন্ধে আলোচনা, সোনার তরী পাঠান্তে মন্তব্য, বিদায় অভিশাপ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। 'তৃতীয় অধ্যায়ে' চিত্রা ও চৈতালি সম্বন্ধে আলোচনা, চৈতালি পাঠান্তে ও পর্বশেষে মন্তব্য আছে॥

[তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে গেছেন, এখনও প্রকাশিত হয় নি।]

১৮. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী ১৯৫৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ভূমিকা লেখেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচী:—'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিবক্তৃতা' পর্যায়ের পাঁচটি বক্তৃতার সংকলন।

প্রথম বক্তৃতা: বিষয়ের গুরুত্ব, দেশ ও কাল, বঙ্কিম-প্রতিভার উদয়; বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-মানস ও কাব্য-প্রেরণার উন্মেষ, প্রথম রচনা—'দুর্গেশনন্দিনী'।

দ্বিতীয় বক্তৃতা: বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-প্রেরণা ও জীবন-জিজ্ঞাসা; 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'—জীবন-রহস্য, পাশ্চাত্য কবি-দৃষ্টি ও হিন্দু-চিন্তা, উপন্যাসের প্লট ও সমগ্র-দৃষ্টি, 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'; বঙ্কিম-প্রতিভার মধ্যাহ্নকাল—'বিষবৃক্ষ'।

তৃতীয় বক্তৃতা: বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক কল্পনা—'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্ত'—দাম্পত্য-প্রেম ও রূপতৃষ্ণা; 'কৃষ্ণকান্তে' রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আতিশয্য, 'চন্দ্রশেখরে' কবি-মানসের দ্বন্দ্ব—আদর্শ-বিরোধ, রজনী'—আত্মভাব-প্রধান কবি-দৃষ্টির দিক-পরিবর্তন ও কবিহৃদয়ের ভাবান্তর।

চতুর্থ বক্তৃতা: বঙ্কিম-উপন্যাসের শেষ পর্ব; জীবন-জিজ্ঞাসার নূতন তত্ত্ব সন্ধান; পরবর্তী তিনখানি উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম'; শেষ উপন্যাস—'রাজসিংহ', বঙ্কিম-উপন্যাসের রচনা-রূপ ও তাহাদের অন্তর্গত ট্র্যাজেডি।

পঞ্চম বক্তৃতা: বঙ্কিমী-উপন্যাসের ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব; বঙ্কিমচন্দ্র ও শেক্সপীয়র; উপসংহার॥

[মোহিতলাল পরে আরও পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেন। পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।]

১৯. বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। প্রথম প্রকাশ—মাঘ ১৩৬৯।

"'বাংলার নবযুগে' স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং তাঁহাকে স্বামীজির অবদান সম্বন্ধে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন এই কাযে তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের পৌরুষ, চরিত্রবল ও হৃদয়বৃত্তির কথা বলিতে বলিতে দ্রষ্টা মোহিতলাল আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তাঁহার নানা গ্রন্থে ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তিনি এই বিরাট পুরুষের বিবিধ অবদান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রচনা হইতে 'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' সঙ্কলিত হইল। আবশ্যকবোধে কোন কোন রচনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন অথবা স্থান বিশেষে কোন কোন রচনার কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন করিয়া পাঠক্রম অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।" (সঙ্কলয়িতার নিবেদন)।

সূচী:—স্মরণ (কবিতা)। মানুষ-পূজা।

প্রথম অধ্যায়: নবযুগের সূচনা: বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ; বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: অন্তর্জীবনের ইতিহাস ও বৈরাগ্যের সংস্কার; সংসার ত্যাগ ও তাহাকে বক্ষে ধারণ; বিবেকানন্দ ও গীতার কর্মযোগ; প্রেম ও বৈরাগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়: বিবেকানন্দের অসাধারণত্ব আত্মপ্রেম বনাম মানব-প্রেম, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনতত্ত্বের মৌলিকতা; শ্রীরামকৃষ্ণের নবমন্ত্র; পুরাতন সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের বাণী নয়, শৈবশক্তির মূলে বৈষ্ণবীশক্তির রসসিঞ্চন।

চতুর্থ অধ্যায়: মানবধর্ম ও বিবেকানন্দ, নরেন্দ্রনাথের দ্বিজত্ব লাভ, বিবেকানন্দের ভারতদর্শন ও স্বদেশপ্রেম, বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য।

পঞ্চম অধ্যায়: বিবেকানন্দের মানবপ্রীতির বিশেষত্ব, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ; বিবেকানন্দের কণ্ঠে সমগ্র বিশ্বের নবযুগের বাণী।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিবেকানন্দের প্রচারিত মানবধর্মের কয়েকটি মূলতত্ত্ব; বিবেকানন্দের ধর্মশাস্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ।

সপ্তম অধ্যায়ঃ বিবেকানন্দের উত্তর সাধক, অরবিন্দ, গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র।

অষ্টম অধ্যায়ঃ বিবেকানন্দ ও লোকমাতা নিবেদিতা।

নবম অধ্যায়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ॥

গ্রন্থের প্রারম্ভে মোহিতলালের সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে।

গ. অনুবাদঃ

১. বিদেশী ছোটগল্প সঞ্চয়ন। প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৫৭। উৎসর্গ—খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অশেষ প্রীতিভাজনেষু।

"এই অনুবাদ কর্মের মূলে সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন প্ররোচনা ছিল না। গল্পগুলির অধিকাংশ মূলের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়াছিলাম, যখন যে-গল্পই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল তখনই সেটিকে অনুবাদ না করিয়া পারি নাই। প্রথমতঃ, বাংলা ভাষায় তাহাদের রস কতখানি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠককে তাহা আস্বাদন করাইতে হইবে—ইহাই ছিল আমার সাক্ষাৎ প্রেরণা।

"...আমি এই যে গল্পগুলি ভাগ্যক্রমে—আদৌ কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের বশে নয়—নিজেরই রস-পিপাসার বশে অনুবাদ ও সঞ্চয়ন করিতে পারিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে খুব জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বিদেশী গল্পের এমন সঞ্চয়ন—একই স্থানে এতগুলি উৎকৃষ্ট গল্পের সমালোচনা কোন ইংরেজী সঞ্চয়নেও এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই, আরও দাবি এই যে, ভাষায় ইডিয়াম ও রস যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া, যে আদর্শে আমি এই অনুবাদ ও সঞ্চয়ন করিয়াছি তাহাতে এই গ্রন্থখানি বাংলা গল্প-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইবে এই বিশ্বাস অসঙ্গত নয়—অনুবাদক হিসাবে নয়—সমালোচক হিসাবেই আমি এই উক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।" (ভূমিকা ও সমালোচনা)

সূচী :—ভূমিকা ও সমালোচনা; নর্তকী; লায়লা-মজনুঁ; ক্রৌঞ্চমিথুন; ধর্ম-প্রচার; জল্লাদ; বিচার, ডাক্তারের কীর্তি; *সোনা-পোকা; বসন্তদিনের

স্বপ্ন; তারাহারা; দম্পতি; দেয়াল-ভাঙা; খোলা-জানলা; *পিঁপড়ায়-মানুষে; মরুর মায়া; সাগরিকা; *শাস্তি; অধঃপতন ॥

[* মোহিতলালের উপদেশ ও তত্ত্বাবধানে তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দি অনুবাদ করেছেন।]

২. বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন। প্রথম প্রকাশ—কার্তিক ১৩৫৯। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দি বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। তাঁর ভূমিকা থেকে জানা যায় 'একবক্তার বৈঠক' 'বঙ্গভারতী'তে এবং বাকী প্রবন্ধগুলি ১৩৫৪ হতে ১৩৫৬ সালের মধ্যে নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল।

সূচী: শিল্পী ও সমালোচক (অস্কার ওয়াইল্ড); সভ্যতা (ক্লাইভ বেল); একবক্তার বৈঠক (অলিভার ওণ্ডেল হোমস): গ্রন্থরচনা ও রচনা-রীতি (শোপেনহাউয়ার); কথাসাহিত্যে প্রকৃতি-পন্থা (এ'মল-জোলা); প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব (শোপেনহাউয়ার) ॥

৩. বিদেশী কাব্য-সঞ্চয়ন। (যন্ত্রস্থ)

ঘ. সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ:

১. বঙ্কিম স্মৃতি (শ্রীশচন্দ্র দাশ সহযোগে) ১ ৪৬।
ঢাকা বঙ্কিম-শতবার্ষিকী-সমিতির পক্ষ হতে প্রকাশিত।

২. কাব্য-মঞ্জুষা। প্রথম প্রকাশ—১৩৪৯।

"আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষার উপযোগী কবিতাই সংকলন করি নাই; আমার উদ্দেশ্য—তাহারা, কবিতা কি বস্তু, তাহাও যেন বুঝিবার সুযোগ পায়। এজন্য আমি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, যতদূর সম্ভব, নানা প্রকারের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি। আরও একটি কথা এই যে, আমি কবিতা-নির্বাচন করিয়াছি—কবি-নির্বাচন করি নাই; কোন্ কবিকে বাদ দেওয়া হইল, সে ভাবনা না করিয়া, কয়টি উপযুক্ত কবিতার স্থান করা যাইতে পারে, সেই চিন্তাই করিয়াছি।...আমার সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হইয়াছে—কবিতার সমুচিত পঠন-পাঠন। আমি জানি, কেবল জানা কবিতা চয়ন করিলেই হইবে না, সেইগুলিকে ভাল করিয়া পড়াইতে হইবে। এই শিক্ষা—যে কারণেই হোক—শিক্ষার্থীদের যে প্রায়ই হয় না, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য আশা করি কেহ অগ্রাহ্য করিবেন না। আমি এই পুস্তকে যতদূর

সম্ভব শিক্ষকের কাজ করিয়াছি। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সেই পাঠন-রীতিকেই মুখ্য করিয়া আমি এই পুস্তক রচনা করিয়াছি—ইহা কেবল একখানি সংকলন-গ্রন্থই নয়।" (মুখবন্ধ)।

৩. কাব্য-মঞ্জুষা। ছাত্রপাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৫৭।

৪. অভয়ের কথা (ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)। প্রথম প্রকাশ—পৌষ ১৩৫৪।

৫. দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। বিশেষ সংস্করণ ১৯৪৭।
কপালকুণ্ডলা („)।

৭. কাব্য-চয়নিকা (দেবেন্দ্রনাথ সেন)। প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন ১৩৬৬।

৮. কাব্য-চয়নিকা (অক্ষয়কুমার বড়াল)। প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন ১৩৬৬।

শেষোক্ত দুখানি গ্রন্থের কবিতা নির্বাচন করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। তবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'কাব্য-চয়নিকা'র পরিশিষ্টের কবিতা এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কাব্য-চয়নিকা'র তারকাচিহ্নিত কবিতা শ্যামসুন্দর মাইতি কর্তৃক সংযোজিত।

৬. গ্রন্থাবলী :

মোহিতলাল-কাব্যসম্ভার। প্রথম প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৬৭।

"এতকাল তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি বিভিন্ন প্রকাশকদের ঘরে ছড়াইয়া থাকায় এবং তাহার মধ্যেও অনেকগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় পাঠকসাধারণের খুবই অসুবিধা হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু কবিতা অদ্যাপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয় নাই। একেবারে কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নাই এমন দু একটি কবিতাও তাঁহার খাতার বন্ধনে বদ্ধ ছিল।"...(প্রকাশকের নিবেদন)।

সূচী : স্বপন-পসারী ; বিস্মরণী ; স্মর-গরল ; হেমন্ত-গোধূলি। পরিশিষ্ট, দেবেন্দ্র-মঙ্গল (১-১৫ সনেট) ; প্রণয়-ভীরু ; বিবাহ-মঙ্গল ; দুর্গোৎসব (১-২) ; নট কবি শিশিরকুমার ; প্রেম ও কর্মফল ; কবির প্রেম ; স্মরণ ; মরণ ; মহানিদ্রা ; বন্ধু ; রোগ-শয্যার চিঠি ; চৌঠা আষাঢ়, মহাপ্রয়াণ ; বসন্ত-উৎসবে 'বাসন্তিকা' ; শেষ গান : দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব॥

চ. সম্পাদিত পত্রিকা :

১. বঙ্গদর্শন (তৃতীয় পর্যায়—মাসিক) শ্রাবণ ১৩৫৪—শারদীয় ১৩৫৬।

২. বঙ্গভারতী (মাসিক) ১৩৫৯ বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়।

ছ. পত্রগুচ্ছ :

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ। আজহারউদ্দীন খান্ ও ভবতোষ দত্ত সংকলিত ও সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৭৬, অক্টোবর ১৯৬৯। উৎসর্গ—অধ্যাপক তারাচরণ বসুর স্মৃতিতে।

"সমকাল এবং সমকালীন ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে মোহিতলালের খোলাখুলি ধারালো তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশে অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—এই আশঙ্কায় কাউকে বিব্রত করা কিংবা প্রকাশককে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত কবার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকায় কিছু চিঠি সম্পূর্ণ বাদ দিতে হয়েছে। কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ বর্জন, কোনো কোনো স্থানে নাম-ধাম-পরিচয় গোপন রেখে প্রকাশ করতে হয়েছে। তাই কোনো কোনো পত্রে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু আমি নিরুপায়।

"পত্রগুচ্ছকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে সাহিত্য-চিন্তা, দেশ ও সমাজ, শিক্ষা-দর্শন, ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন এবং বিবিধ। প্রত্যেক বিভাগের চিঠি যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। কয়েকটি চিঠির তারিখ নেই, আভ্যন্তরীণ ইঙ্গিতের সহায়তায় আনুমানিক নির্ভরযোগ্য তারিখ দিয়েছি। চিঠিগুলিতে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। পরিশিষ্টে প্রতিটি প্রসঙ্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।" (নিবেদন)।

সূচী : নিবেদন (আজহারউদ্দীন খান্); মোহিতলাল মজুমদার (ভবতোষ দত্ত), ভূমিকা (ভবতোষ দত্ত); সাহিত্য চিন্তা (পত্র সংখ্যা ৪৩)। দেশ ও সমাজ (পত্র সংখ্যা ১৮), শিক্ষা-দর্শন (পত্র সংখ্যা ৬), ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন (পত্র সংখ্যা ৫৫): বিবিধ (পত্র সংখ্যা ৭১); পরিশিষ্ট : তথ্যপঞ্জী (আজহারউদ্দীন খান্); পত্র প্রাপকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (আজহার-উদ্দীন খান্); মোট পত্র সংখ্যা ১৯৩॥

নির্ঘণ্ট

'অগ্নিবীণা' ২৩

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' ৪১, ৪৩, ১০১, ১১৫, ১৩১, ১৫৩, ২৫৪
'আমি' ১২, ২১, ২২
আরনল্ড, ম্যাথ্যু ১২১, ১৫৬
আহমদ, ফররুখ ১১৭
আহমদ, মুজফ্ফর ৯

'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়া, দি' ৮
ইসলাম, কাজী নজরুল ৯, ১৪-২৬, ৩৫, ৮৪, ১০৪, ২২১

'উপাসনা' ১৮
উলফ, ভার্জিনিআ ১১৮
'উত্তরা' ৩০, ৩৩

'ঋতুরঙ্গ' ৩৩

এলিঅট, টি এস ১২৯
এমার্সন, আর ডবলিউ ৮৩, ৮৯, ১৪৯

ওআইল্ড, অস্কার ১২৮, ২৭৩
ওআর্ডসওআর্থ, উইলিআম ৬, ১২৩
ওঝা, কৃত্তিবাস ৫
ওদুদ, কাজী আব্দুল ১৩১

'কল্লোল' ২৫, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৯৩
'কল্লোলযুগ' ১৪, ২১, ২৮, ৩০, ৮৪, ১৫৯
কিট্স্, জন ৮, ৯০, ৯১, ১১২
কেশবচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ ১৩৯
কোলরিজ, সামুএল টেলর ১১৫, ১৩৬
'কবিতা' ২৯
'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' ৩৯, ১৩৩, ২৬৯
'কালি-কলম' ৩১, ৩২, ৩৩, ২২৬
কারলাইল, টমাস ১২৯, ১৪৯
'কাব্যমঞ্জুষা' ২, ৪৬, ২০৬, ২৭৩, ২৭৪
'কাব্যচয়নিকা' ৬৬, ২৭৪

খৈআম, ওমর ১১, ৯৯

গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ৩২
গঙ্গোপাধ্যায়, তারকনাথ ১৪২, ১৬৩
গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশ ২:৩
গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল ১৪, ২৫১
'গাজী আব্বাস বিটকেল' ২৪
গান্ধী, মো ক ৫৭, ৫৯, ৬০, ১৬৬, ১৯৮, ২৬৩, ২৪৭
গুপ্ত, অতুলচন্দ্র ১৫০
গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ৩, ৮৬, ১৩০, ১৬০, ১৬১
'গীতগোবিন্দ' ৮৫
গ্যেটে, যোহান উলফগ্যাং ভন ৭৬, ১৩৭

'গোলাপী আলাপ' ৭৬

ঘোষ, কালীপ্রসন্ন ১৪৯

চৌধুরী, প্রমথ ১১৭, ১২০, ১২১, ১৩১, ১৩৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৮০, ১৯৩, ১৯৬
চৌধুরী, মুনীর ১০৭
চৌধুরী, নারায়ণ ১৫৭
চৌধুরী, নীরদ সি ৭, ৮, ৩৪
চক্রবর্তী, অজিতকুমার ১৪৯
চট্টোপাধ্যায়, অশোক ৮, ২৩, ২৫, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ২৩২, ২৩৩
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ৬০, ৮০, ৮৬, ১২৪, ১২৫, ১৩৬, ১৪১, ১৫১, ১৫২, ১৫৬
চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন ১৬
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ৩৭, ১৭৫
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ১৪, ২৮, ৩৪, ৪৩, ১২৪, ১২৫, ১৪১
চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন ১৮৪

'ছন্দ চতুর্দশী' ৪৩, ১০৯, ১১৩, ১২২-১২৭, ২৫৩

জোনস্, মনিঅর উইলিআম ১০৮
'জয়তু নেতাজী' ৫৮, ৫৯, ১৪০, ১৫৩, ১৬৮, ১৯৭, ২০১, ২০ , ২৬২
জনসন, স্যামুএল ১৭৮
,জাহ্নবী' ৬
'জীবন-জিজ্ঞাসা' ৫৬, ১৫৩ ২২১, ২৬৫, ২৬৬

টেনিসন, আলফ্রেড লর্ড ১১২

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ১৫৪
ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ১৮০
ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮০
ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ১৪৯
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১, ৫, ১০, ১১, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৫১, ৫৭, ৬০, ৬২, ৮০, ৮৭, ৮৯, ১০৫, ১১১, ১১৯, ১২১, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৬, ১৩৭, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫০, ১৫৪, ১৫৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৯৩, ১৯৫, ২১৭, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২৩৪

ডাওসন, আরনেস্ট ১০৯
ডানটন, থিওডোর ওআটস্ ১১৮

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর ১৪৯

দত্ত, অজিত ১১৭
দত্ত, ভবতোষ ২৫৪, ২৭৫
দত্ত, মধুসূদন ৫, ৭৪, ১১৭, ১১৮
দত্ত, রমেশচন্দ্র ৫
দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ১৪, ২৮, ১০৫, ১১১, ১১২, ১২৫, ১৪২

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ ১১৭, ১৩১, ২২৬
দাস, গোবিন্দচন্দ্র ৮৬, ৮৮, ৯১
দাস, কাশীরাম ৫
দাস, সত্যসুন্দর ১৪, ৮০, ১৩০, ১৫২
দাস, সজনীকান্ত ২৪, ২৫, ৩০-৩১, ৩৪, ৩৬, ৬০, ৬১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৫
দাশ, জীবনানন্দ ১০৩, ১৮০
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ ১৫০, ২১৯
দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী ৫, ১৮০
দে, বিষ্ণু ১১৭
দে, সুশীলকুমার ১১, ২৮, ৪২, ৪৯, ১১৭, ২২৬, ২৫১
দেব, নরেন্দ্র ৯৯
দেবী, হেমমালা ২
'দেবেন্দ্রমঙ্গল' ৯, ২৬, ১২৪, ২৫০
'দ্রোণগুরু' ১৭, ২৫

'নব্যভারত' ১৪, ৪৯, ১৫২
নেতাজী, সুভাষচন্দ্র বসু ৫৮, ৫৯, ১৪০, ১৫৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৯৭, ১৯৯
নিয়োগী, পৃথ্বীশ ৪৭

'পথের পাঁচালী' ১৬
পেত্রার্ক, ফ্রান্সিস্কো ৪৯, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩
পাল, বিপিনচন্দ্র ১৩৮, ১৪৯
'প্রগতি' ২৮, ২২৬
'প্রবাসী' ১৪, ১৮, ১৯, ২৮, ৩৩, ৩৪, ১৫২

ফ্রাঁস, আনাতোল ৩২, ৬৫

'বঙ্গদর্শন' ৫, ১২, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ১৩৮, ১৪০, ১৫৩, ২১০
'বঙ্গভারতী' ১২, ৬০, ৬১, ৬৫, ১৩৮, ১৪০, ১৫৩, ২১০
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ৫৭
'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' ৬৫, ৬৬
বনফুল ১৮৪, ২৩৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুপ্রকাশ ১১
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ ১৩৮
বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান ১৩, ১৪, ১৫, ১৩৯, ১৪১, ২৫১
বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন ১৩৮, ২১৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ ২৫৬
বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস ৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি ১৩৮, ১৪৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র ৭৯, ১৮৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ৬১, ৭৩, ৭৪, ৮৫, ১৪১
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ৮৫, ১৮০
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ১৬, ১৮০
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র ১৩৯, ২৫৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু ৬২
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ১৩১

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮০
বসু, অমৃতলাল ১৩৮
বসু, চন্দ্রনাথ ১৩০, ১৪৯
বসু, জগদীশচন্দ্র ১৪৯
বসু, বুদ্ধদেব ২৮, ৩৪, ৩৫, ৪৯, ৮৫, ৮৮, ১১১, ১৩১, ১৪৪
বসু, তারাচরণ ৪৬, ৬৫, ১০৯, ১৮৪, ২৭৫
বসু, নির্মলকুমার ৬০
বসু, পূর্ণচন্দ্র ১৩০
বসু, মনোজ ৭২
'বসুমতী' ৮, ৯, ৪৩
ব্র্যাডলে, এ সি ১৩৭
ব্রাউনিং, রবার্ট ১৩৭
ব্রুক, রুপার্ট ১২৪
বড়াল, অক্ষয় কুমার ৫, ১১, ৬৬, ১২১, ১৩৯, ২৭৪
'বাংলা কবিতার ছন্দ' ৪১, ২৫৯
'বাংলার নবযুগ' ৪১, ৫৮, ১৪০, ২৪৫, ২৪৮, ২৬০
'বাংলা ও বাঙালী' ৫৮, ১৪০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭২, ২৬৮
'বিচিত্র কথা' ৪৩, ২৫৭
'বিচিত্রা' ৩২
'বিবিধ কথা' ৪৩, ৫৮, ২৫৬
বিবেকানন্দ, স্বামী ৫৭, ৬৫, ১৩৯, ১৪৯, ২৭১
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ১৩৯
'বিদেশী কাব্য সঞ্চয়ন' ১২, ৪৩
'বিদ্রোহী' ২১, ২২, ২৩, ২৪
'বিস্মরণী' ৩, ১১, ১৩, ১৭, ২৮, ৪৮, ৮৬, ৮৮, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১১২, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৫১
বিশী, প্রমথনাথ ১১৭, ১৩১, ১৫০
'বিংশ শতাব্দী' ৬১
'বীরভূমি' ১২, ২৭, ৪২
বোদলেআর, শার্ল ১১২

ভদ্র, নলিনীকুমার ৮০
ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর ৭৮
ভট্টাচার্য, শৌরীন্দ্রনাথ ১৮৭
ভট্টাচার্য, সাধনকুমার ১৫৭
'ভারতী' ১৪, ২১, ২৭, ৩১, ১৩১, ১৪৩
ভিরেক, জর্জ সিলভেস্টার ১১২
ভাদুড়ী, শিশিরকুমার ১২৪, ১৮২

মজুমদার, অমিয়া ৫৬
মজুমদার, অরুণা ৫৬
মজুমদার, মোহিতলাল
মোহিতলালের জীবন কথা ১-৮১
কবি মোহিতলাল ৮২-১২৭, সমালোচক মোহিতলাল ১২৮-১৪৫, প্রাবন্ধিক মোহিতলাল ১৪৬-১৫৯, বাঙালী মোহিতলাল ১৬০-১৭৬, বাংলা পত্রসাহিত্যে মোহিতলাল ১৭৭-২১৯; বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ২২০-২৩০ -নিশ্চুপতার ষড়যন্ত্র ১-২; আত্ম-পরিচয় ২-৩; -পিতৃপুরুষ ৩-৪,

-শিক্ষা ৪-৬ ; -শিক্ষকতা ৬-৯ ; -পদ্মা ১০-১১ ; -করুণানিধান ১৩-১৪ ; ভারতী ১৪ ; -নজরুল ১৪-২৬ ; দেবেন্দ্রমঙ্গল ৯ ; স্বপন-পসারী ২৬-২৮ ; বিস্মরণী ২৮-২৯ ; কল্লোল ২৯-৩০ ; -সজনী-কান্ত ৩০-৩১ ; -কালিকলম ৩১-৩৩ ; শনিবারের চিঠি ৩৩-৪১ ; -রবীন্দ্রনাথ ৩৭-৪০ ; ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ৪১-৫৬, বুদ্ধদেব বসু ৪৯, নেতাজী ৫৮-৫৯ ; গান্ধী ৫৯-৬১ ; বঙ্গদর্শন ৬২-৬৬, -সংসার-সংগ্রাম ৬৬-৭০, তারাশঙ্কর ৭২-৭৩ ; -তরুণ সাহিত্যসেবী ৭৭-৭৯, যুগধর্ম ও মোহিতলাল ৮২-৮৪ ; ইন্দ্রিয়সম্ভোগের কবিতা ৮৫-১০২ : -কাব্যনাট্য ১০৫-১০৯ ; অনুবাদ ১০৯-১১২, কবি-মনের ক্রমবিকাশের ধারা ১১২-১১৪ ; ছন্দ চতুর্দশী ১১২-১২৭ ; -দেবেন্দ্র-মঙ্গল ১২৪

বাংলা সমালোচনায় মোহিতলাল ১২৯-১৩১ ; সাহিত্য সমালোচনা ১৩১-১৩৮ ; সম্পাদনা ১৩৮, পুনর্মূল্যায়ন ১৩৮-১৩৯ ; সমাজ-সমালোচনা ১৩৯-১৪০ ; সমা-লোচনার ত্রুটি ১৪০-১৪৫ ; বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসে মোহিতলাল ১৪৯-১৫৯ ; বেদরদী বিমুখতা ১৫৪-১৫৫ ; অপ্রীতিমূলক মনোভাব ১৫৫-১৫৬ ; বাংলা প্রবন্ধের উত্তরকাল ১৫৬-৫৭

দরদী বাঙালী ১৫৯-১৬২ ; উনিশ শতকের বাংলা ১৬২-১৬৩ ; বাংলা ও বাঙালী ১৬৪-১৬৯ ; দেশভাগ ১৬৯-১৭২ : স্বতন্ত্র বাংলা ১৭৩-১৭৬

পত্রে সাহিত্যচিন্তা ১৮২-১৯৬ ; পত্রে দেশ ও সমাজ ৯৭-২০২ ; পত্রে শিক্ষাদর্শন ২০২-২০৭ ; পত্রে ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন ২০৮-২১৫, পত্রসাহিত্যের ধারায় মোহিতলাল ২১৭-২১৯

রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল ২২০-২২৮ ; আধুনিকতা ও মোহিতলাল ২২৮-২৩০ ; 'আমি ও শনিবারের চিঠি' ২৩১-২৪৯

মজুমদার, মোহিতমোহন ৯

মপাসাঁ, গী দ্য ১২

'মডার্ণরিভিউ' ৮

'মানসী' ১১, ১২, ১৫২

মাইতি, শ্যামসুন্দর ৬৯, ৮০, ২১৪

মারে, মিডলটন ১৩৪

মালার্মে, স্তেফান ১১২, ১২৪

মিল্টন, জন ১২৩

মিত্র, দীনবন্ধু ১৪১

মিত্র, প্রেমেন্দ্র ৩১, ৩৫, ৮৫, ২৫৩

মিত্র, রাজেন্দ্রলাল ১৩০

'মোসলেম ভারত' ১৪, ১৫, ২১, ১৮৪

'মোহিতের মোহ' ৯

'মোহিতলালের স্মরগরল' ৪৬

মৈত্র, রবীন্দ্র ৩৪, ১৩৯

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার ১৪৯

মেআর, ডি. লা ১০৯

মল্লিক, কুমুদরঞ্জন ৭১, ১৩৯, ১৪১, ১৮৭

মল্লিক, কুলদাপ্রসাদ ১২

মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ৫

মুখোপাধ্যায়, বনবিহারী ১৩৮

মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ৭১, ৭৪, ২১৩, ২৭২

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব ১৩০, ১৪৯

মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস ১৩০

মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটীপ্রসাদ ১৩১, ১৫০

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ ৩২, ৩৫, ৮৪, ৮৫

'যমুনা' ১৪

যাযাবর ৭৯

রলাঁ, রোমা ১৭৩

'রবি-প্রদক্ষিণ' ১১, ৩৯, ২৬৪

'রবিবারের লাঠি' ৩৫

রসেটি, ক্রিশ্চিনা ১১২, ১২৪

রাস্কিন, জন ৪৯

রায়, অন্নদাশঙ্কর ১৩১, ১৫০

রায়, কালিদাস ৬২, ১০৯, ১৩১, ১৫০

রায়, জগদানন্দ ১৪৯

রায়, জীবনকালী ১৩, ২১, ৬৫, ৬৯, ৭৮, ২১২, ২১৩, ২৬৮

রায়, তরুলতা ৯

রায়, দিলীপকুমার ২০২

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল ৫, ১১, ১০৭, ১০৮, ১৪৩, ১৮০

রায়, গুণাকর ভারতচন্দ্র ৮, ৮৫,

রায়, হেমেন্দ্রকুমার ২১২

রুমি, জালালুদ্দিন ১১২

'রূপকথা' ৫৬, ১১৪, ২৫২

লক্ষ্মণ তর্পণ' ১৩

'ললিতচন্দ্র চন্দ্র' ৪৯

লরেন্স ডি এচ ৮৯

লিণ্ড, রবার্ট ১১৯

লি, সিড্‌নি ১১৯

শ, বার্নার্ড ৯৪

'শরৎ পরিচয়' ১৪

শলোকভ, মিখাইল ২১৭

'শনিবারের চিঠি' ৫, ৮, ১০, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৩ ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৬১, ১৪২, ১৫২, ১৫৯, ২১৪, ২৩১-২৪৯

শোপেনহাওআর, আর্থার ৩০, ৮৬, ৯৬, ২৭৩

শ্রীঅরবিন্দ ৬৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৩

'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' ১৭১, ১৩৭, ১৫৩, ২৬৬

'শ্রীমধুসূদন' ৪৮, ১৩৭, ২৬২, ২৬৩

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ ১৪৯

শেক্‌স্পিআর, উইলিআম ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১২৪

সরকার, অক্ষয়চন্দ্র ১৩৮, ১৪৯
সর্বাধিকারী, মুনীন্দ্রপ্রসাদ ৯
সান্যাল, বিনায়ক ১৫৭
'সাহিত্য-কথা' ৪১, ৪৩, ৪৫, ১৫৩, ১৮৪, ২৫৫
'সাহিত্য-বিতান' ৪১, ৯৬, ১৫৩, ২৫৭
'সুইনবার্ণের অনুসরণে' ১৭, ১০৯, ১১২
'স্বরগরল' ৩, ৪, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৬, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১১২, ১১৫, ২৫১
সেন, ক্ষিতিমোহন ৬২
সেন, রমেশচন্দ্র ১৮৪
সেন, পরমানন্দ কবিকর্ণপূর ৩
সেন, দেবেন্দ্রনাথ ২, ৩, ৫, ১৩, ৪৩, ৬৬, ৮৬, ৯১, ৯২, ১২০, ১২১, ১৩৯, ১৪১, ২৫৩
সেন, দীনেশচন্দ্র ১৪৯
সেন, শশাঙ্কমোহন ১৩০
সেন, শিবানন্দ ৩
সেন, সুরেন্দ্রনাথ ১৮০
সেন, নবীনচন্দ্র ৫
সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র ৩৪
সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার ১৪, ২১, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৮৫, ২১২
সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ ২৯, ৭১, ৮৫, ১৪১, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ২১৬, ২২১
সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ১৩১, ১৫০
সিংহ, বিমলচন্দ্র ৮৪
'স্বপন-পসারী' ৩, ১৭, ২৬-২৮, ৩০, ৪৮, ৮৮, ১০১, ১১২, ২৫০
স্ট্রেচি, লিটন ২২৭

হাইনে, হাইনরিখ ৩২, ১১২
হাডসন, ডবলিউ এইচ ১৩৭
হালদার, গোপাল ১৩১, ১৭৫
হিউগো, ভিক্টর ৪২, ১০৯, ১৩৩
হুইটম্যান, ওআল্ট ৮৫
'হেমন্তগোধূলি' ৩, ৩৫, ৪৩, ৫৭, ৮৭, ৯০, ৯৫, ১০৩, ১১০, ১১১, ১১৩, ২২২, ২৫১
হোমস, ওলিভার ওয়েন্ডেল ৭৭, ২৭৩
হ্যাজলিট, উইলিআম ১৩৩, ১৪৯

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৮	২৮	The Illustrated Weely of India	The Illustrated Weekly of India
১৫	২৪	বাদল প্রাতের শরাব : মোসলেম ভারত, ১৩২৭ আষাঢ়। পূবের হাওয়া	নিকটে : মোসলেম ভারত, ১৩২৭ আষাঢ় বাদল-প্রাতের শরাব ; পূবের হাওয়া।
১৬	২৪	'নবফুল'	'বনফুল' (১৩১৬)
২৭	১৮	কাব্যগুচ্ছ	কাব্যগ্রন্থ
২৭	১৯	কাব্যগুচ্ছের	কাব্যগ্রন্থের
৩২	২৯	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৪২	২৩	ডক্টর	ভিক্টর
৪৯	১৫	বহুভাষার	বঙ্গভাষার
৫৩	২	'বহিস্কৃত বা সমাজ'	বহিষ্কৃত বা সমাজ
৫৯	১৪	সুযশে নিশ্চেষ্ট আছি	সুযশ হারাইয়াও নিশ্চিন্ত আছি
১১২	১০	স্তোকান মার্লামে	স্তেফান মার্লামে
১১২	১২	জালালুদ্দিন রুকি	জালালুদ্দিন রুমি

৬০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি (ফাল্গুন ১৩৫৫ সংখ্যাই মোহিতলালের·· ·.........ততটা পারেনি) যুক্ত হবে ৬৭ পৃষ্ঠায় ২৯ পংক্তির যেখানে 'সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন' সেইস্থানে।